লালসন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ ১৮ই পৌষ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

পরিবেশক
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ
১২।১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
শাখা—দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীপূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য

ব্লক ও মুদ্রণ
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মুদ্রাকর
শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ
৯, এণ্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

মূল্য—৬৲ টাকা

কল্যাণীয় অরুণকুমার সেনগুপ্ত

ও

কল্যাণীয়া বিজয়া সেনগুপ্তাকে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

স্রোত ও আবর্ত
প্রবাহ
বেহাগ
বাঁধ
ফুল ডোরে

অভাবিত ঘটনাই বটে! অথচ কেউ বিস্মিত হ'ল না। এমনটি না ঘটলেই নাকি সকলে আশ্চর্য্য হতেন। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে ঘটনাটির আরম্ভ সে যে শুধু বিস্মিত হ'ল তাই নয়, কতকটা বিমূঢ় এবং বিহ্বল হয়ে পড়ল। স্বপ্ন সে বহু দেখেছে, কুমারী মনের সবখানি মাধুর্য্য এবং সুষমামণ্ডিত সে স্বপ্ন, যা তার রঙীন কল্পনার ভাঁজে ভাঁজে সযত্নে রক্ষিত আছে। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আজ সে প্রথম অনুভব করল যে, কত সীমাবদ্ধ ছিল তার চিন্তা করবার গণ্ডী। চোখ তার ঝলসে গেল। এত স্বাচ্ছন্দ্য তাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছে। প্রাচুর্য্যের এই যথেচ্ছাচারের মধ্যে সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। তার জীবনের সুরু থেকে আজকের দিনটির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোথাও এক বিন্দু সামঞ্জস্য নেই, শ্রীমতী আজ এই কথাটাই শুধু বারে বারে ভাবছে।

কেনই-বা সে একথা ভাববে না। খানিকটা শিক্ষা শ্রীমতী পেয়েছে, আর সেই সঙ্গে কিছুটা রূপও তার আছে। কিন্তু এমন মেয়ের আজকের দিনে অভাব কি? খোঁজ করলে অলিতে-গলিতে অগণিত পাওয়া যায়। অথচ কথাটা তার আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব কেউই আজ আর মানতে চায় না। যদিও তাদের এই মতামত এমন বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ করতে ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নি। অন্ততঃ শ্রীমতী কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না। তবুও শুনতে তার বেশ ভালই লাগছে। তাই সে নিঃশব্দে কান পেতে থাকে—ভাল ভাবে অবস্থাটা চিন্তা করে দেখতে সচেষ্ট হয়ে উঠে। স্বচ্ছদৃষ্টিতে অতনুর পানে চেয়ে থাকে। বলিষ্ঠ চেহারা, উজ্জ্বল গায়ের বর্ণ, ভাল মানুষটির মত চুপ করে বসে আছে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গাম্ভীর্য্য নিয়ে। শ্রীমতীর অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পথে এই শ্রেণীর লোকের সাক্ষাৎ কোন দিন পাওয়া যায় নি। তার

চেনা মহলের মধ্যে কোনক্রমেই একে ফেলা চলে না। তাদের মধ্যে অতনুর আবির্ভাবটা নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা যেন।

এ ছাড়া অন্য কোন কথা শ্রীমতীর মনে আসছে না। নইলে বিদ্যায়, যশে, অর্থে যার কোথাও অপ্রাচুর্য্য নেই—শুধু নামটাই যাঁর পরিচয়ের বিজ্ঞাপন বহন করে বেড়ায়, এমনি একজন লোকই কিনা শেষ পর্য্যন্ত তাকে সহধর্ম্মিণী করতে চাইছেন। আর তাও উপযাচক হয়ে।

শ্রীমতীর মা প্রায় কেঁদে ফেললেন, বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। দাদা দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি জানাল, যুক্তিজালে আচ্ছন্ন করে ফেলল সকলকে। মা চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখেমুখে স্পষ্ট ফুটে উঠল বিরক্তির ভাব। তিনি ধমক দিলেন, খোকা—

অরুণ মায়ের কথা গায়ে না মেখে বলল, তুমি মিথ্যে রাগ করছ মা। একটু ভেবে দেখলেই তুমিও বুঝবে যে, এমন অসম আত্মীয়তা কোনদিনই শেষ পর্য্যন্ত আনন্দের হয় না।

পুত্রকে থামিয়ে দিয়ে রাণী বললেন, শ্রীর ভালমন্দ নিয়ে যাঁর চিন্তা করবার তিনিই করবেন। তুমি দয়া করে চুপ করে থাকলেই আমি খুশী হব অরুণ।

অরুণ মায়ের কথায় হেসে জবাব দিল, আমি তোমাদের একবার মনে করিয়ে দিলাম মাত্র। তা ছাড়া কথাটা বাবাই সব সময় বলেন কিনা—

প্রণব অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছিলেন। অরুণের আজকের আপত্তিটা তাঁরই শিক্ষার সামান্যতম প্রকাশ। এর পরে রয়েছে শ্রীমতী, অথচ এদের গর্ভধারিণীর ভাবগতিক দেখে তিনি মুখ খুলতেই ভরসা পাচ্ছেন না। তবুও তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। মৃদুকণ্ঠে বললেন, ভাবতে হবে বৈকি অরুণ। এটা যে একটা ছেলেখেলা নয় তা আমরা জানি। একটি মূল্যবান জীবনের ভবিষ্যৎ কখনও এক কথায় নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। তা

ছাড়া, যার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে আমরা চিন্তা করছি তার মতামতটাও জানতে হবে অরুণ।

অরুণ খুশীমনে প্রস্থান করল। কিন্তু ঘটনাটির এখানেই শেষ হ'ল না। স্কুলমাষ্টার প্রণবের কোন যুক্তিই তাঁর স্ত্রীর কাছে টিঁকল না। স্বামীকে একান্তে পেয়ে তিনি অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করলেন। বললেন, তোমাদের মতলবটা কি শুনি?

প্রণব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, না না, মতলব আবার কি থাকতে পারে।

রাণী প্রশ্ন করেন, তা হলে দ্বিধা করছ কেন?

প্রণব হাসলেন। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, অতনু একটা প্রস্তাব করেছেন বলেই সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করা চলে না। ভেবে দেখবার অনেক কিছু আছে।

রাণী বললেন, কিন্তু তোমাদের এই দ্বিধাকে যদি সে অপমান-জনক মনে করে শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে যায়?

প্রণব গভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, তা হলে চিরদিন আক্ষেপ করব রাণী—

আর সেইসঙ্গে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেবে না? রাণীর কণ্ঠে বিদ্রূপ।

প্রণব এ বিদ্রূপ গায়ে মাখলেন না। শান্তকণ্ঠে বললেন, দরকার হলে তা দেব, তবুও কারুর কথায় চোখ বুজে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব নয়।

কথা কটি খুব শান্তকণ্ঠে বলা হলেও এর অন্তর্নিহিত দৃঢ়তায় রাণী ভিতরে ভিতরে বিচলিত হলেন এবং ক্ষণকাল নিঃশব্দে চিন্তা করে তাঁর তূণীর থেকে সবচেয়ে বিষাক্ত বাণটি তুলে নিয়ে নির্ম্মম আঘাত করলেন, তোমার ঐ আদর্শ আদর্শ করে আমার ইহকালটি ত অন্ধকার করে দিয়েছ, সুখ কাকে বলে তার মুখ দেখাও ভাগ্যে হ'ল না, কিন্তু তাই বলে তোমাদের ঐ ফাঁকা কথায় ভুলে আমার একমাত্র মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে তোমাকে আমি দেব না।

এই আকস্মিক আঘাতে প্রণব বিব্রত হলেন। ম্লানকণ্ঠে

বললেন, তুমি মিথ্যে রাগ করছ রাণী। এখন তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা বৃথা।

রাণী থামতে পারলেন না—আলোচনা করবার মুখ থাকলে ত করবে। ত্যাগ আর ত্যাগ। আজীবন নিজের মতে চলে পেলে কতটুকু? শুধু অভাব-অনটনের জ্বালা ছাড়া? স্কুল-মাষ্টারের স্ত্রী বলে কি বড় কিছু আশা করতেও নেই!

এ অভিযোগের কোন জবাব প্রণব দিলেন না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে প্রস্থান করলেন এবং নিজের ঘরে এসে এক বাণ্ডিল পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসলেন, কিন্তু খাতা দেখায় মন দিতে সক্ষম হলেন না। রাণীর অনুযোগগুলি তাঁর মাথার মধ্যে তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে। রাণী তাঁর সহধর্ম্মিণী, তাঁর সাধনার সম-অংশভাগিনী, এই কথাটাই তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসেছেন। আঘাতটা তাই বুকে বড় বেশী বেজেছে। কন্যাকে কেন্দ্র করে রাণীর মনের পুঞ্জীভূত অসন্তুষ্টি আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। প্রণব দুঃখ পেলেও কোনপ্রকার প্রতিবাদ করলেন না। তা ছাড়া সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে রাণীকে হয় ত দোষ দেওয়া উচিত হবে না।

প্রণবের চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। শ্রীমতী নিঃশব্দে পিতার পাশে এসে দাঁড়াল। খানিক তাঁর মুখের পানে চেয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলল, খাতা খুলে বসে আছ, কিন্তু একটি লাইনও দেখ নি যে বাবা? কি ভাবছিলে তুমি? কথাটা শেষ করে সে হাতের পেয়ালাটি টেবিলেব উপর রাখল। পিতার জন্যে সে চা নিয়ে এসেছে।

প্রণব সংগোপনে একটি নিঃশ্বাস মোচন করে বললেন, ভাবনার আর অন্ত কি মা! ঘরে বাইরে কোথাও কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার যো আছে?

শ্রীমতী একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, তুমি লুকাচ্ছ বাবা। এসব ত তোমার রোজকার ভাবনা, অভ্যস্ত হয়ে গেছ তুমি।

প্রণব ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, ঠিক তাই মা, কিন্তু এতদিন

ধরে জমিয়ে রেখে রেখে এখন দেখছি তা পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে, তাই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি। এতদিন শুধু নিজের আনন্দেই বিভোর ছিলাম, তাই কারুর কথাই আলাদা করে ভেবে দেখি নি, কিন্তু আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান মা—

শ্রীমতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কোন জবাব দিল না।

প্রণব থামতে পারেন না—মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি আদর্শ শিক্ষক হতে গিয়ে। যার জন্য পার্থিব অনেক-কিছু থেকেই তোমাদের বঞ্চিত হতে হয়েছে। কথাটা তোমাদের মা আজ আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কাজটা তিনি এত দেরীতে করেছেন যে, আজ আর কোন সহজ পথই আমার চোখে পড়ছে না। আমার আদর্শ আমাকে একেবারে গিলে ফেলেছে মা।

শ্রীমতী তার স্বল্পভাষী পিতার মুখে একসঙ্গে এত কথা শুনে বিস্মিত হ'ল। বলল, তুমি অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠছ বাবা।

প্রণব শান্তগলায় প্রতিবাদ জানালেন, চঞ্চল হই নি মা, ভয় পেয়েছি। মনে হচ্ছে, যে সামান্য পুঁজি নিয়ে আমি সংসার-সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলাম তা আমার এতদিনে তলিয়ে গেল, কি নিয়ে বাঁচব বলতে পার শ্রী ?

শ্রীমতী রাগ করে বলল, তোমার আজ কি হয়েছে বাবা তা আমি বুঝতে পেরেছি। একটা কাল্পনিক ভয় তোমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু এ কথাটা আমি কিছুতেই ভেবে পাই না যে, যাকে নিয়ে তোমাদের এত বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে তাকেই তোমরা সবচেয়ে বেশী উপেক্ষা করছ কেন বাবা! তার মতামতটা যেন কিছুই নয়।

প্রণব যেন একটু চমকে উঠলেন। শ্রীমতী একথা বলতে পারে। তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন, উপেক্ষা করব কেন মা। তোমরা সকলে মিলে যদি আমাকে দুর্ভাবনা থেকে রেহাই দিতে পার তা হলে ত বেঁচে যাই। ভাবতে শিখি নি বলেই না আজ এত দুর্ভাবনা।

প্রণব চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। শ্রীমতী খানিকটা অপ্রস্তুতের মত ঘর থেকে চলে গেল।

শেষ বিন্দু চাটুকু পান করে প্রণব পেয়ালাটি নামিয়ে রাখলেন। আর একবার নতুন করে খাতাপত্রে মনোযোগ দেবার বৃথা চেষ্টা করে কতকটা নিজেরই উপর রাগ করে সব তুলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন। মাথাটা তাঁর দপ দপ করছে। বাইরের মুক্ত বাতাসের প্রয়োজন বোধ করছেন তিনি।

মুক্ত প্রান্তরে এসে তাঁর মনটা অনেকটা প্রফুল্ল হ'ল। অনেকক্ষণ আবদ্ধ থেকে কেমন ঝিম ধরে গিয়েছিল। প্রণব অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে অপেক্ষাকৃত একটা নির্জ্জন স্থানে এসে পড়েছেন। এখনও সন্ধ্যা হয় নি। সম্মুখের পাহাড়ের ওপাশটায় আকাশে যেন আগুন ধরে গেছে। রেল-লাইনের পাশের পায়ে চলা পথ ধরে তিনি অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। অদূরে জনকয়েক স্ত্রীপুরুষ দেখা দিয়েছে। এই সময়টায় এ অঞ্চলে বহু চেঞ্জারের আবির্ভাব ঘটে। আরও খানিক অগ্রসর হতে খেরুয়া নদীর শীর্ণ জলরেখা চোখে পড়ল। আর নয় এবারে ফেরা যাক—প্রণব ভাবলেন। দূরের লোকগুলিও কাছে এসে পড়েছে।

প্রণব হাঁক দিলেন, কেও, প্রিন্সিপ্যাল নাকি? এলেন কবে?

এতক্ষণে ওঁরা কাছে এসে পড়েছেন। প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখেই প্রণব পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কতদিন থাকবেন এবারে?

প্রিন্সিপ্যাল সুবিনয় চৌধুরী সবগুলি প্রশ্নের একসঙ্গে উত্তর দিলেন, কাল সন্ধ্যায় এসেছি, এক মাসের ছুটিতে। একটু থেমে কতকটা কৈফিয়তের ভঙ্গীতে তিনি পুনশ্চ বললেন, দেখা হয়ে ভালই হ'ল, আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম। সুখবরটা আমরাও পেয়েছি, বড় আনন্দের কথা।

প্রণব যেন কতকটা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, কিসের কথা বলছেন আপনি?

সুবিমল হেসে বললেন, শ্রীমতীর কথা বলছিলাম, প্রণববাবু—

প্রণব চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন। ইচ্ছে করেই তিনি একটু পিছিয়ে পড়লেন। আর সকলে এগিয়ে গেল। প্রণব মৃদুকণ্ঠে বললেন, কিন্তু আপনাদের এই সুখবরটা আমার যে একটা প্রকাণ্ড দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে প্রিন্সিপ্যাল।

দুর্ভাবনা! সুবিমল বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এর মধ্যে দুর্ভাবনার কি থাকতে পারে? তবে যদি ।

সহসা তিনি থামলেন, একটু ইতস্ততঃ করে পুনরায় বললেন, অবশ্য শ্রীমতীর নিজস্ব কোন আপত্তি থাকলে সে আলাদা কথা।

প্রণব চঞ্চল হয়ে উঠলেন, না না প্রিন্সিপ্যাল, বাধা শ্রীমতীর তরফ থেকে আসে নি। আমি নিজের মনে সায় পাচ্ছি না, আমার আজীবনের চিন্তাধারার সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছি না।

সুবিমল একটু হেসে বললেন, আপনি বোধ হয় আর্থিক অসমতার কথাটা বড় করে ভাবছেন মাষ্টারমশাই?

প্রণব সায় দিলেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলেন, শ্রীমতী বলে কি?

প্রণব বললেন, শ্রীমতী এবং তার গর্ভধারিণীকে খুব আগ্রহশীল মনে হয়—

সুবিমল হেসে জবাব দিলেন, তা হলে ত চুকেই গেল।

প্রণব বার বার মাথা নাড়তে থাকেন, কিন্তু আমি নিজেকে কি বোঝাব বলতে পারেন। আমি এতদিন ধরে যা কিছু বলে এসেছি সবই যে মিথ্যে হয়ে যাবে প্রিন্সিপ্যাল, অরুণ ত স্পষ্টই একথা বলে গেল।

সুবিমল হেসে বলেন, কিন্তু আপনার সমস্যা ত অরুণকে নিয়ে নয় মাষ্টারমশাই। আপনি ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তা হয়ত যাবে।

প্রণব বাড়ী ফিরে এসে পুনরায় একই প্রশ্ন করতে শ্রীমতী গভীর

কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ বাবা। মুখে তুমি মাকে অনুযোগ দিচ্ছ অথচ ভিতরে ভিতরে তুমি নিজেও যথেষ্ট দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ।

প্রণব কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকেন।

শ্রীমতী বলে চলল, আজ তোমার সামনেও একটা পরীক্ষা দেখা দিয়েছে বাবা, তোমার শিক্ষার আর আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষা। তোমাদের সব কথা আমার কানে গেছে বলেই একথা আমাকে বলতে হচ্ছে, অযথা তুমি মন খাবাপ করো না।

প্রণব অভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কি তোমার মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করছ মা?

না বাবা। শ্রীমতী জোরের সঙ্গে জানাল, আমি আমার কথাই তোমাকে বলেছি, তুমি শুধু আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

প্রণব বাব বার মাথা নেড়ে বলেন, আশীর্ব্বাদ তোমাদেব সব সময়ই করি মা। তবে কি জান শ্রী, এক গাছেব ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে কি?

শ্রীমতী মৃদু কণ্ঠে বলল, গাছেব কথা জানিনে বাবা, কিন্তু মানুষের বেলায় সবই সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। একটু থেমে সে পুনবায় বলল, তুমি যা শিখিয়েছ আমবা তা শিখেছি, কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে পাছে ভুল করে বসি এই ভেবে তুমি কি পরীক্ষা দিতেও দেবে না?

প্রণব কন্যাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, সাধ করে কি আব তোকে মা বলে ডাকি! আমাব এত বড় একটা জটিল প্রশ্নেব সহজ সমাধান পাওয়া গেল।

প্রসন্ন হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই দিকে খানিক একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শ্রীমতী বলল, আর একটু চা খাবে বাবা? নিয়ে আসব—

চা···তা মন্দ বলিস নি মা, কিন্তু তোর মায়ের কোন অসুবিধা হবে না ত?

শ্রীমতী হাসল। কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল এবং অনতিকাল মধ্যেই ফিরে এসে বলল, চা এনেছি বাবা—

এরই মধ্যে নিয়ে এলি মা? প্রণব বললেন, হ্যাঁ, এখানে আমার পাশে বোস শ্রী।

শ্রীমতী বসতেই প্রণব পুনরায় বললেন, তুই ঠিক জানিস মা পরীক্ষায় তুই হেরে যাবিনে?

শ্রীমতী সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল।

তার মুখের পানে চোখ তুলেই এ পরিবর্ত্তনটুকু প্রণবের চোখে পড়ল, তিনি একটু হাসবার চেষ্টা করে মৃদুকণ্ঠে কথা কয়ে উঠলেন, এতদিনের বিশ্বাসটা কি একদিনেই মন থেকে মুছে ফেলা যায় শ্রী?

শ্রীমতী কথা কইল না।

প্রণব তেমনি বলে চললেন, আমি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি তাই মনঃস্থির করেও স্থির হতে পারছি না। অথচ এক অরুণ ছাড়া আর সকলেই এক কথা বলে। প্রিন্সিপ্যাল ত স্পষ্টই বললেন দিনকাল একেবারেই নাকি বদলে গেছে।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে জানাল, তিনি সত্য কথাই বলেছেন।

প্রণব কেমন একপ্রকার হেসে বললেন, আমাদের দুনিয়ার পরিধি বড় সীমাবদ্ধ তাই আজন্মের বিশ্বাসটা এত বড় হয়ে উঠেছে। নজরটা এক জায়গায় থেমে আছে। হয়ত তাই মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। এত বড় ধনীর আমার মেয়েকে হঠাৎ বিয়ে করতে চাওয়াকে একটা সাময়িক খেয়াল ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারছি না।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলল, কাকাবাবুকে তুমি এই সব কথা বললে বাবা?

প্রণব অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, বললাম, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল হেসে উঠে জবাব দিলেন, তাতেই বা এত চিন্তা করবার কি থাকতে পারে। আজকের খেয়াল কাল দেখবেন সত্য হয়ে

উঠেছে, স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া এত বড় সৌভাগ্যকে অবহেলা করলে নাকি তোর উপর ঘোরতর অন্যায় করা হবে।

এত বড় সৌভাগ্যকে অবহেলা করতে প্রণব শেষ পর্য্যন্ত পারেন নি। একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ, সামাজিক মর্য্যাদার বহুবর্ণ-রঞ্জিত বিভিন্ন ছবি তাঁর চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন তাঁর সহ-ধর্ম্মিণী, বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষীর দল। চতুর্দ্দিকের এই প্রবল কণ্ঠরোলের মাঝে প্রণব ও অরুণের দ্বিধা তলিয়ে গেল।

অতনুর হ'ল শ্রীমতী লাভ।

১

আজ শ্রীমতী চলে যাবে। এখান থেকে সোজা কলকাতা অতনুর সুবৃহৎ বুইক গাড়ীতে—ব্যবস্থাটা অতনুর। সর্ব্বত্রই একটা মাত্রাধিক চাঞ্চল্য, অন্ততঃ অরুণের তাই মনে হ'ল। প্রণব কেমন যেন থেমে গেছেন। অরুণ এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না যে, শ্রীমতী স্বেচ্ছায় অতনুর গলায় মালা দিয়েছে। যে অতনু বিরাট পয়সাওয়ালা লোক, যার প্রকাণ্ড বুইক গাড়ীটা তার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের জৌলুস আর নামের আভিজাত্য সগৌরবে প্রচার করছে। শ্রীমতী শেষ পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যের কাছে যথাসর্ব্বস্ব বিকিয়ে দিল! নইলে আজকের এই পরিণতিটাই যে আগাগোড়া মিথ্যা হয়ে যায়। আশ্চর্য্য মেয়েদের মন, এরা মুখে এক কথা বলে কাজের বেলা তার উল্টোটি করে। অন্ততঃ শ্রীমতীর বেলা একথা সত্য

একান্তে ডেকে অরুণ শ্রীমতীকে বলল, কেমন করে এই বিয়েতে তুই সায় দিলি ?

জবাব দিতে শ্রীমতী এক মুহূর্ত্তও দেরী করল না। বলল, বড় স্বার্থের জন্যে ছোট স্বার্থের কথা ভুলতে হয়েছে দাদা।

অরুণ মুখিয়ে উঠল, ও-সব বড় বড় কথা তুই রাখ শ্রী—

শ্রীমতী অম্লান কণ্ঠে জবাব দিল, এ তোমার অন্যায় অভিযোগ দাদা।

অরুণ বিস্মিতকণ্ঠে উত্তর দিল, মাকে বরং বুঝতে পারি, কিন্তু তোকে আমি সত্যিই ঠিক বুঝতে পারছি না।

শ্রীমতী হাসিমুখে বলল, এর মধ্যে বুঝবার কি আছে দাদা আমি বুঝিনে, আমি ভেবেছিলাম বিয়ের পরে বুঝি তোমাদের মনের সব সংশয় দূর হবে—কিন্তু এখন দেখছি 'মরেও না মরে অরি'। আচ্ছা দাদা আমাকে নিয়ে তোমরা কি খুব বেশী বাড়াবাড়ি করছ না ?

অরুণ দুঃখিত হয়ে বলল, তুই এড়িয়ে যেতে চাইছিস বলেই ত সব মুছে যেতে পারে না বোন।

শ্রীমতী বলল, এড়িয়ে যাব কেন দাদা। আর তাতেই কি আমার বর্ত্তমানটা মুছে যাবে।

অরুণ সহসা ধৈর্য্য হারাল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, বর্ত্তমানের কথা জানি না শ্রী, কিন্তু অতীতকে দিব্বি ভুলতে পেরেছিস। বিয়ের নাম করে ঐশ্বর্য্যের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিস।

অরুণের শেষ কথায় শ্রীমতীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করে শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, বিয়ের নাম করে নয় দাদা, বিয়ে করে বল। আর আত্মবিক্রয় কথাটার সত্যিই কোন মানে হয় না। তুমি অত্যন্ত রেগে আছ, তাই কি বলছ তা তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না। আর ঐশ্বর্য্যের কথা যদি বল তা হলে আমার বলবার কিছু নেই, কারণ অর্থ আর প্রতিপত্তির মোহ মানুষ মাত্রেরই আছে।

অরুণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। সে উষ্ণ কণ্ঠে বলল, আমাদের বাবার কথাটাও কি একবার তোর মনে হ'ল না শ্রী ?

শ্রীমতী রাগ করল না। বলল, বাবার কথা তুমি ছেড়ে দাও দাদা। তিনি সংসারের মধ্যে থেকেও সংসারী নন। নির্লোভ

পুরুষ তিনি। কিন্তু যে লোক তাঁর স্তরে উঠতে পারে না অথবা তাঁর মত করে ভাবতে জানে না, তাকে তুমি অনুযোগ দিতে চাইছ কোন্ যুক্তিতে?

আহত কণ্ঠে অরুণ বলল, যুক্তি দিয়ে বিচার কবতে গেলে অনেক কিছুরই অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না শ্রীমতী, কিন্তু মানুষের জীবনটা ত শুধু যুক্তি আর বিচাববুদ্ধিব সমষ্টি নয় শ্রী! তোর মন বলেও কি কোন বস্তু নেই?

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে জবাব দিল, এ যে আবাব নতুন কথা শোনাতে সুরু কবলে দাদা। মন ছাড়া মানুষ হয় নাকি?

অরুণ রাগ করে বলল, কোন কথাকেই তুই আমল দিতে চাস না শ্রী। কিন্তু সূর্য্যদাব কথাটা কি একবাবও ভেবে দেখেছিস?

খানিকক্ষণ বিস্মিত-বিহ্বল দৃষ্টিতে অরুণেব মুখেব পানে চেয়ে থেকে ধীরে ধীবে শ্রীমতী বলল, প্রশ্নটা যে এদিক থেকে উঠতে পারে একথা কোনদিন আমাব মনে আসে নি দাদা। তিনি সেবাধর্ম্মেব পথ বেছে নিয়েছেন--আমাব স্বপ্ন সংসারধর্ম্মকে কেন্দ্র করে। আমাদেব দুজনার পথ সম্পূর্ণ আলাদা অথচ—

অরুণ একটু ইতস্ততঃ কবে পুনবায় বলল, এতদিন এত কাছে থেকেও লোকটিকে তুই চিনতে পাবিস নি?

শ্রীমতী শান্ত গলায বলল, এতদিন এত কাছে থেকেও যদি না চিনে থাকি তা হলে আজ আব নতুন কবে চেনার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমাব মনে হয় না। কিন্তু তোমার আজ কি হয়েছে দাদা—

একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবে অরুণ জবাব দিল, হয় নি কিছুই, কিন্তু ভাবছিলাম যে, এই সময়েই সূর্য্যদাব হঠাৎ শহবে এমন কি কাজ পড়ল—

আলোচনা ক্রমেই একটা বিশেষ বিন্দুতে এসে পাক খেতে সুরু কবেছে। শ্রীমতী অস্বস্তি বোধ করছিল।

অরুণ পুনবায বলল, আমি তোব শুধু দাদা নই শ্রী। তোর

খেলার সাথী, তোর বন্ধু তাই এত কথা বললাম। কিন্তু সংশয় আমার ঘুচল না, আরও জট পাকিয়ে গেল। কোন তরফ থেকেই আলোর সন্ধান পেলাম না।

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর সহসা উষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, অকারণে অনেক জল ঘোলা করেছ দাদা এবার থাম। সকল প্রশ্নের এত স্পষ্ট উত্তর পেয়েও কেন যে সন্তুষ্ট হতে পারছ না আমি বুঝি না। তোমাদের শ্রীমতী কি এতই ছেলেমানুষ যে, সে কিছুই বোঝে না?

অরুণ মৃদুকণ্ঠে বলল, সেইখানেই ত বড় বিস্ময় লুকিয়ে আছে শ্রী। আমার বারবারই মনে হচ্ছে তুই আদর্শচ্যুত হয়েছিস।

শ্রীমতী দুঃখিত হ'ল। আহত কণ্ঠে বলল, আমি তোমাদের কেমন করে বুঝাব যে তোমরা ভুল করছ।

অরুণ বলল, শেষ পর্য্যন্ত এই দাঁড়াল যে, এতক্ষণ ধরে আমি শুধু বাজে বকে মরেছি? তা হলে সত্যি কথাটা কি শুনি?

শ্রীমতী হেসে উঠল, বলল, আমি একটা কথাও মিথ্যে বলি নি দাদা। তুমি একে সত্য বলে যদি না ভাবতে পার সেটা কি আমার দোষ। তুমি সূর্য্যদাকে নিয়ে বহু চিন্তা করেছ, তোমার কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তও করে ফেলেছ, অথচ এই সিদ্ধান্তগুলি যে অকাট্য তার কোন প্রমাণ তুমি পাও নি। সব ব্যাপারেই দুটো দিক আছে যার একটা দিক তোমার চোখে পড়েছে অপরটা পড়েনি। সূর্য্যদাকে আমিও কিছুটা জানি বলে বিশ্বাস করি, আর তার চেয়েও বেশী জানি আমাদের বাবাকে, যাঁকে শুধু জানলেই সব কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যায় না কিন্তু সূর্য্যদা সম্বন্ধে তেমন কোন দায়িত্ব আমাদের আছে বলে আমি মনে করি না।

অরুণ পুনরায় বলল, সূর্য্যদা সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কি তুই ভাবতে পারিস না শ্রী?

শ্রীমতী হেসে উঠল। বলল, ভাবতে আর পারলাম কোথায় দাদা। তুমিই যা আজ জোর করে ভাবাতে চাইছ। অথচ যাঁর বিষয় তোমার সর্ব্বাগ্রে ভাবার কথা সেদিকে তুমি অন্ধ।

অরুণ বলল, তুই মার কথা বলছিস শ্রী? তাঁকে আমরা শান্ত করতে পারতাম।

শ্রীমতী বলল, আপাততঃ থামিয়ে রাখতে পারতে, কিন্তু তারপর?

অরুণ প্রত্যুত্তর করল, তারপর আবার কি। দিন কয়েক রাগ করে থাকতেন—শেষ পর্য্যন্ত সবই ঠিক হয়ে যেত।

শ্রীমতী পুনরায় হেসে উঠল। বলল, আবার ঘুরে-ফিরে সেই এক জায়গায় ফিরে এসেছ দাদা। মা বাইরে শান্ত হলেও ভিতরে জ্বলতেন—যার উত্তাপে বাবা একেবারে ঝলসে যেতেন। আমাদের মাকে কি চেন না? আজ কেন যে সব ছেড়ে এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আমরা পড়ে আছি সে কি তোমার অজানা দাদাভাই। তা ছাড়া বিয়ে একদিন আমাকে করতেই হ'ত—

একটু থেমে খানিক দুষ্টামির হাসি হেসে শ্রীমতী পুনরায় বলল, তোমার ত বরং খুশী হয়ে ওঠার কথা। এমন নিখরচায় বোন পার হয়ে গেল। দৈবাৎ গলগ্রহ হয়ে পড়তেও ত পারতাম।

অরুণ শ্রীমতীর এই লঘু পরিহাসে যোগ দিতে পারল না, গম্ভীর হয়ে উঠল। সেই দিকে খানিক চেয়ে থেকে শ্রীমতী পুনশ্চ বলল, তুমি রাগ করে চুপ করে থাকলেও সত্য কখনও মিথ্যে হয়ে উঠবে না, একদিন আমার একথাটা তুমি বুঝবে দাদাভাই।

অরুণ একটুখানি হেসে বলল, তুই আমাকে কি মনে করিস শ্রী? কিছু বুঝি না আমি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীমতী বলল, বিলক্ষণ! তা কখনও ভাবতে পারি? তবুও দেখ সব জেনে-শুনেও তুমি শুধু প্রশ্নই করছ—

অরুণ মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, একটা অনুমানের উপর নির্ভর না করে তোর মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম।

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল। সে মৃদুকণ্ঠে বলল, অনুমান করা ভাল—ওতে ঝঞ্ঝাট কম। তা ছাড়া জেনেই বা তুমি করতে

কি? কারণ বিয়েটা আমার এবং তা আমার পরিপূর্ণ সম্মতি নিয়েই হয়েছে। এখানে কোন ফাঁক এবং ফাঁকি নেই একথাটা সব সময় মনে রেখ। তা ছাড়া একটা কথা ভেবে আমি সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি দাদা।

অরুণ মুখ তুলে তাকাল।

শ্রীমতী বলতে থাকে, যদি তোমার অনুমানটাও অভ্রান্ত হ'ত তা হলেই বা তোমার এ আলোচনায় যুক্তি কোথায়।

একটা জবাব দেবার জন্যই হয়ত অরুণ মুখ তুলেছিল, সহসা মাকে এই দিকে আসতে দেখে শ্রীমতী তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে এল, প্রিন্সিপ্যাল কাকা আমায় কি উপহার দিয়েছেন জান দাদা? একটা তীরধনুক।

রাণী ততক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি অনুযোগ দিয়ে অরুণকে বললেন, তোরা এখানে আর জামাই একলা ওঘরে বসে আছে। সেখানে গিয়ে একটু গল্পগাছা করলেও ত পারিস?

অরুণ জবাব দিল, তোমার বড়লোক জামাইকে দেখবার লোকের অভাব কি মা, আমি আবার কি বলতে কি বলে বসব।

শ্রীমতী বলল, বড়লোক হওয়াটাই একটা অপরাধ নয় দাদা।

রাণী বললেন, ওকে ভাল করে বল শ্রী। গুণের মধ্যে শুধু তর্ক করাটাই শিখেছে। চল শ্রী আমার সঙ্গে, ওর বাজে কথা শুনে কাজ নেই।

শ্রীমতী মুখখানাকে করুণ করে বলল, আজকেই চলে যাচ্ছি মা, দাদার সঙ্গে একটু ঝগড়া করতে দাও।

রাণী আপন মনে বকতে বকতে চলে গেলেন।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, মা তোমাকে বিশ্বাস করেন না, ভয় পান। আমিও পাই দাদা।

অরুণ চমকে উঠল।

শ্রীমতী বলতে থাকে, যেভাবে সেই থেকে তুমি আমার মন ভাঙাবার চেষ্টা করছ তাতে ভয় হওয়াই স্বাভাবিক দাদা।

অরুণ বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল। বলল, তাড়াবার নয় শ্রীমতী বুঝবার চেষ্টা করছিলাম।

শ্রীমতী শান্তকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করল, এই বোঝার ইচ্ছেটা ত শুভ ইচ্ছে নয় দাদা—বিশেষ করে আজকের দিনে। শ্রীমতীকে তুমি এতদিন ধরে কি ভেবে এসেছ আমি জানি না। কিন্তু একথা আমি জানি সে পরিপূর্ণ একটি মেয়ে, যার সঙ্গে আর দশজনার বিশেষ কোন প্রভেদ আছে বলে আমার মনে হয় না। সংসারকে সে ভালবাসে—তার সুখদুঃখ কোনটাকেই অবহেলা করে না।

একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ম্লানকণ্ঠে অরুণ বলল, তোর এই সাংসারিক যুক্তিকে খণ্ডন করবার সাধ্য আমার নেই বোন। অনেক বাজে কথা বলেছি—বুঝেও বলেছি, না বুঝেও বলেছি। মন আমার তোলপাড় করছে নইলে সত্যই ত এখন এসব কথা নিয়ে আলোচনা করা শুধু বৃথা নয়—অন্যায়। আমাকেও তুই জানিস তোকেও আমি জানি। তোর চলে যাবার আগে আর দেখা হবে না তাই যাবার আগে একটা কথা বলে যাই--প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলিস না--

অরুণকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীমতী একটু হেসে জবাব দিল, একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি দাদা, সূর্য্যদা আমার বিয়েতে একটা আংটি উপহার পাঠিয়েছেন, নীলরঙের পাথর বসান।

শ্রীমতী আর একবার হাসল।

৩

শ্রীমতী তার স্বামীর গৃহে এসেছে। সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ। তার অতীত দিনগুলির সঙ্গে কোথাও একবিন্দু মিল নেই। তথাপি একটা নতুন উন্মাদনায় তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শ্রীমতীকে উপলক্ষ্য করেই যে উৎসবেব এই বিপুল আয়োজন একটা এ বাড়ীতে উপস্থিত প্রত্যেকটি লোকের কথাবার্ত্তায় এবং কাজে

প্রকট হয়ে উঠেছে। তাকে একটা বিশেষ উচ্চস্থানে বসিয়ে অনাবশ্যক এত বেশী গুঞ্জন চলেছে যে, ভাল লাগার মাধুর্য্যও যেন ফিকে হয়ে গেছে।

অতনুকে কাছে পেয়ে শ্রীমতী স্মিতহাস্যে বলল, বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে। এত স্তব-স্তুতিতে মাথা ঠিক রাখতে পারব না যে।

চলে যেতে যেতে অতনু হেসে জবাব দিল, এ বাড়ীর এইটেই রেওয়াজ। ভয় পেয়ো না, অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

শ্রীমতী পুনশ্চ তাকে আহ্বান জানাতে অতনু ফিরে দাঁড়াল, আর কিছু বলবে নাকি?

শ্রীমতী জবাব দিল, হ্যাঁ, বলছিলাম যে এটা ভয় নয়, অস্বস্তি।

অতনু তেমনি হেসেই জবাব দিল, ও একই কথা।

শ্রীমতী সহসা অন্য প্রসঙ্গে এল, এমনি উৎসব আর কতদিন চলতে থাকবে?

অতনু বলল, তোমার ভাল না লাগলে আজ থেকেই বন্ধ করে দিতে পারি। যদিও উপস্থিত কারুরই তা ভাল লাগবে না।

শ্রীমতী কুণ্ঠিত হেসে জবাব দিল, তা হলে ওদের যতদিন ভাল লাগে—

তার কথার মাঝে প্রবল বেগে হেসে উঠল অতনু। পরমুহূর্ত্তেই কেমন একটা অবজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে বলল, ওদের তাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় নইলে ওরা বোঝে না, বুঝতে চায়ও না।

শ্রীমতী কতকটা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ওরা তোমার আত্মীয়, না?

অতনু জবাব দিল, ওরা তাই বলতে চায়।

শ্রীমতী তেমনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে পুনরায় বলল, বলতে চাইলেই কি তা হতে পারে?

অতনু হেসে জবাব দিল, সেইজন্যই ওরা তোমাকে উপলক্ষ্য করে আমাকে খুশী করতে চাইছে। কিন্তু তোমার যখন ভাল লাগছে না তখন আমাকে খুশী করবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বাড়াবাড়ি—অথচ শুনতে ভালই লাগছে, বিশেষ করে আজকের দিনে। শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, তুমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ দেখছি।

অতনু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল, বিলক্ষণ। কিছুটা যোগ আছে বৈকি, নইলে এই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করা সম্ভব হ'ত না।

শ্রীমতী বলল, মিথ্যা অর্থের এত বড় অপব্যয়—

তাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে অতনু বলল, স্থান, কাল এবং পাত্রভেদে ও শব্দটির ভিন্ন অর্থ দাঁড়ায় শ্রীমতী।

অতনুর উত্তর দেবার এই ভঙ্গিটির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল। শ্রীমতী অন্তরে চমকিত হ'ল মুখে সে ভাব প্রকাশ পেল না। বরং পরিহাসের ছলে সে বলল, কথাটা সত্যিই আমার অনেক আগে বোঝা উচিত ছিল এবং মনের অস্বস্তিকে বাইরের হাসি দিয়ে ঢেকে রাখলেই ভাল হ'ত, কিন্তু এ সব আলোচনা থাক, তার চেয়ে এ বাড়ীর যেটা প্রচলিত প্রথা সেইটে তুমি আমাকে জানিয়ে দাও।

অতনু হেসে উঠল, তুমি শুধু ভাল শিকারী নও, সুন্দর কথা বলতেও জান দেখছি।

একটু থেমে পুনরায় সে বলল, এ বাড়ীতে প্রচলিত প্রথা হচ্ছে অনিয়ম—এ বাড়ীতে তোমাকে নিয়েই সর্ব্বপ্রথম গৃহপ্রতিষ্ঠা হ'ল, সুতরাং ওটা তোমাকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোন বাঁধাধরা রাস্তায় চলতে আমি অভ্যস্ত নই। অপরের স্বাধীন চলার পথে অনধিকার প্রবেশ করাটাও আমি পছন্দ করি না। আমার ঠাকুরদা কথাটা মানতেন না বলেই আমাদের সংসারে—ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ অতনু থামল। বলল, না, আজ থাক। সময়ে সবই জানবে, আজ এসব কথা থাক। সে অন্যমনস্ক ভাবে শিস্ দিতে দিতে প্রস্থান করল।

অতনু চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে বাড়ীর প্রধান ভৃত্য কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত হ'ল। সে নিঃশব্দে এসে শ্রীমতীর সম্মুখে দাঁড়াল।

শ্রীমতী হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, আমাকে কিছু বলবে কেষ্ট ?

একটু ইতস্ততঃ করে কেষ্ট বলল, দাদাবাবুর মেজাজটা কি আজ ভাল নেই ? অমন করে চলে গেলেন কেন ?

তার কথার ধরনে শ্রীমতী বিস্মিত হলেও সে ভাবটা গোপন করে বলল, কোন কারণ ত দেখছিনে কেষ্ট। আর যদি হয়েই থাকে তাতেই বা ভাবনার কি আছে ?

কেষ্ট শঙ্কিত ভাবে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, অনেকদিন ধরে দেখছি কিনা, তাই বৌদিরাণী। দাদাবাবুকে শিস্ দিতে দেখলেই আমি বুঝতে পারি। তবে এখন আপনি এসেছেন—

কথাটা শেষ না করে কেষ্ট অন্যত্র প্রস্থান করল।

শ্রীমতীর বড় অদ্ভুত লাগছে এ বাড়ীর প্রত্যেকটি লোককে – বড় বেশী কৃত্রিম, এমন কি অতনুও। ব্যবহারে আন্তরিকতার স্পর্শ থাকলেও কোথায় যেন একটা মস্তবড় ফাঁক আছে। কথাটা কেউ বলে না দিলেও সে যেন তার আপন সংস্কার বশেই টের পাচ্ছে, ছোটবড় নানা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ইতিপূর্ব্বে সে যেমনটি দেখেছে, যে ভাবে ভেবেছে, স্বপ্ন দেখেছে তার সঙ্গে বর্ত্তমানের মস্তবড় প্রভেদ আছে। ফলে শ্রীমতী অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে। সতর্ক পায়ে তাকে এগোতে হবে। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে সে নারাজ। তার নিজের জন্যও বটে, বাপের জন্যও বটে। তা ছাড়া আরও কত গোপন ইচ্ছা বাসা বেঁধে রয়েছে তার সুকুমার মনের অলিগলিতে। যার বাস্তবরূপ দেখতে হলে অতনুকে তার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মনে তার যত কল্পনাই থাক না কেন এরই মধ্যে সে হাঁফিয়ে উঠেছে। বার বার তার বাবার শান্ত সৌম্য মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠছে—মনে পড়ে মায়ের কথা, দাদার কথা। সূর্য্যদাও এসে দাদার পাশে দাঁড়ায়। শুধুই কি তাই, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে খেরুয়া নদীর বিশীর্ণ জলধারা। তার উপর প্রতিফলিত হয়েছে অস্তপথযাত্রী সূর্য্যের রক্তিম আলো।

মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে অসংখ্য বুনো হাঁস। অনুভব করছে শালবনে পাগলা হাওয়ার মাতামাতি। শ্রীমতী আত্মভোলা হয়ে বসে থাকত। ক্ষিরিয়া তাকে কতদিন ধমকে ফিরিয়ে এনেছে। ফিরে আসতে আসতে কত গল্প শুনিয়েছে সে। কি ছিল আর কি হয়েছে তারই কাহিনী। মানুষের ভয়ে ওবাও সাবধান হয়ে গেছে। নইলে কতদিন যে ক্ষিরিয়া এমনি সময়ে এই পথে চলতে ফিরতে শালমহুয়াব ফিসফিসানি শুনেছে তাব কি হিসেব আছে।

শ্রীমতী তাকে ঠাট্টা করে বলেছে, গাছে গাছে কানাকানি! তুমি পাগল ক্ষিবিয়া।

ক্ষিবিয়া বাগ করে বলত, হ্যাঁ লো হ্যাঁ, আমি নিজেব কানে শুনেছি। শুনবাব কান থাকা চাই, মনেব বিশ্বাস চাই।

শ্রীমতী গম্ভীব হয়ে বলত, একদিন শোনাবে ক্ষিবিয়া?

ক্ষিবিয়া মোটেই না দমে জবাব দিয়েছে, তা আব কেমন করে সম্ভব হবে দিদি, তোমাদেব যা অবিশ্বাসী মন। ওঁরা হলেন গিয়ে দেবতা—

রহস্য করে শ্রীমতী জবাব দিত, মানুষের ভয়ে দেবতা পালায় এ আবার কেমন কথা?

ক্ষিরিয়া অন্যমনস্ক হয়ে যেত, ভয় নয় দিদি পাপে—

ক্ষিরিয়ার অন্যমনস্কতা ও ভাবপূর্ণ মুখেব পানে চেয়ে থাকতে থাকতে শ্রীমতী কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ত। ফিসফিস করে তাকে জিজ্ঞেস করেছে, চোখে না দেখে কেমন করে বিশ্বাস করি ক্ষিরিয়া। তাবপরেই অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে তার একখানা হাত চেপে ধরে আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করেছে, এখন কি আর তা শোনা যায় না ক্ষিরিয়া?

ক্ষিবিয়া খুশী হয়ে জবাব দিয়েছে, শুধু শুনবে কেন দেখতেও পার কিন্তু ওখানে তুমি যাবে কেমন করে—

শ্রীমতী উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। সে জবাব দিয়েছে, তুমি যেমন করে যাও—তখন কত আব বয়স, মাত্র বছর দশ। কয়েক

মাস পূর্ব্বে ওখানে স্থায়ীভাবে একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছেন তার বাবা। সঙ্গী বলতে সখী বলতে একমাত্র ক্ষিরিয়াই তাকে অষ্টপ্রহর ঘিরে রয়েছে। তার বয়স বছর কুড়ি কিংবা কিছু বেশী। আঁটসাট দেহের গড়নে কিছু বুঝবার জো ছিল না। দিনের বেলা তাদের বাড়ীর যাবতীয় কাজ করে দিয়ে রাত্রে ফিরে যেত ছোটকি সরিয়ার ওধারে কোন এক পল্লীপ্রান্তে।

ক্ষিরিয়া জবাব দিয়েছিল, কিন্তু শুনলে মাষ্টার বাবু গোঁসা হবেন।

শ্রীমতী জবাব দিয়েছিল, দোষ না করলে বাবা রাগ করেন না, না হয় বাবাকে জিজ্ঞেস করে নেব।

কিন্তু ক্ষিরিয়া শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয় নি, বলেছে, তুমি খুব ছোট দিদি। আর একটু বড় হলে নিয়ে যাব।

শ্রীমতী ক্ষিরিয়ার উপর রাগ করেছে, মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছে। আর কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলবে না এমন ভয়ও দেখিয়েছে। কিন্তু ক্ষিরিয়া শুধুই হেসেছে, জবাব দেয় নি।

তখন না বুঝলেও আজ সে বোঝে যে, ক্ষিরিয়া তাকে মিথ্যে বলে নি।

বুকে অদম্য সাহস আর দৃষ্টির স্বচ্ছতা না থাকলে ও বস্তু দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না।

সেই দিনের সেই ঘটনার পর থেকে ক্ষিরিয়া তাকে নিয়ে নতুন ভাবে মেতে উঠেছিল। তার বাবা হাসতেন, কিন্তু মা রাগ করে বলতেন, মেয়েটার ইহকাল-পরকাল তুমিই ঝরঝরে করে দেবে। মেয়েকে বিয়ে-থা দিতে হবে না? না এমনি তীর-ধনুক নিয়ে বনেজঙ্গলে ধেই ধেই করে নেচে বেড়ালে চলে যাবে?

বাবা কিন্তু শান্তভাবেই মাকে বুঝিয়ে দিতেন যে, তিনি অকারণে ব্যস্ত হচ্ছেন। তিনি বলতেন, বুদ্ধি হলে আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে। যে ক'টা দিন হেসে-খেলে নিতে পারে নিক।

মা রাগ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, চিরদিন শুধু একই রকম দেখে এলাম, যা ভাল মনে করবেন সেইটেই ঠিক। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে কি সব সময় অভ্যাসকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? আমার এ কথাটার জবাব দাও।

জবাব বাবা মাকে দেন নি বটে, কিন্তু সুযোগমত মেয়েকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, শ্রী, তুমি এখন বড় হয়ে উঠেছ। খেলাধুলো ভাল মা, তাই বলে পড়াশুনায় অবহেলা করো না। তা ছাড়া তোমার মাকেও তোমার সাধ্যমত সাহায্য করা উচিত।

বয়সটা তখন ওর আরও বছরতিনেক এগিয়ে গেছে। বাবাকে ব্যথা দিতে কোনদিনই শ্রীমতী চায় নি। নিজের চলাফেরাকে যথাসম্ভব গণ্ডীবদ্ধ করবার চেষ্টাও সে করেছে যদিও পুরোপুরি পারে নি। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতায় মন তার উদাস হয়ে উঠত। বাবা তখন স্কুলে আর মা দিবানিদ্রায় অচেতন। অদূরে শালমহুয়ার ঘন বন—একটানা মৃদুকণ্ঠে তাকে ডাক দিত। শ্রীমতী আত্মভোলার মত বেরিয়ে পড়ত তার তীর-ধনুক হাতে করে। ক্ষিরিয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে, বনানীর অস্ফুট ভাষা সে তখন বুঝতে শিখেছে। জন্তু জানোয়ারের সন্তর্পণ গতিবিধির খবর ওদের কাছে পাওয়া যায়। কত অগণিত দ্বিপ্রহর তার বনে বনে কেটেছে। কখনও একলা কখনও ক্ষিরিয়ার সঙ্গে। তারপর এই জনবিরল স্থানটিতে মানুষের বসবাস বৃদ্ধি পেতে লাগল, শাল-মহুয়ার বন দূর থেকে দূরান্তরে সরে যেতে লাগল, পল্লীতে বইতে সুরু হ'ল শহুরে হাওয়া, উঠল স্বাস্থ্যনিবাস। বছরের একটা সময় চতুর্দ্দিকের শান্ত গাম্ভীর্য্য টুটে যেত, শ্রীমতী চঞ্চল হয়ে উঠত ক্ষিরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গভীর অরণ্যে যাবার জন্য। যারা স্বাস্থ্যের সন্ধানে আসে তাদের শ্রীমতী বরদাস্ত করতে পারত না। ওদের কৃত্রিম জীবনযাত্রা আর অকারণ জাঁকজমক আর মাতামাতি তার কাছে অসহ্য ঠেকত। তাঁরা একবারও কি ভেবে দেখেন

নি যে, কেমন করে ওখানকার সরল, নির্লোভ লোকগুলির মধ্যে তাঁরা কি বস্তু ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

চতুর্দ্দিকেব এত কোলাহল আব প্রাচুর্য্যের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাই বাবে বাবেই তার অতীতেব কথাগুলি মনে পড়ছে। এত স্তবস্তুতি আব হট্টগোলের মধ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে দু'দণ্ড যদি কোন নির্জ্জন স্থানে চুপ কবে বসে থাকতে পারত তা হলে খুশী হ'ত শ্রীমতী। জীবনেব এদিকটাব সঙ্গে তাব পবিচয় নেই বলেই এই পথে সে চিন্তা কবতে সুরু কবেছে।

শ্রীমতী ধীরে ধীবে এগিয়ে গিয়ে জানালার গবাদ ধবে দাঁড়াল। জানালাব ঠিক নীচেই চমৎকার ফুলেব বাগান, নানা জাতের অজস্র ফুল ফুটে আছে। ইচ্ছে হয ওখানে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে। দিনবাত বসে থেকে থেকে তাব হাতে-পায়ে বাত ধরে গেছে, কিন্তু সে জানে না এ বাড়ীর বীতিনীতি। তার জন্য বরাদ্দ হযেছে খানকযেক পাথবে আবৃত ঘব, এব বাইবে সে এক পা এগোতে চায় না। না জেনে হযত অপরাধই কবে বসবে। এখানে চলে আসবার দিনে মা বহু উপদেশ দিযেছেন—কথাগুলি তাব মনে আছে। তা ছাড়া এ বাড়ীর বউ হযেই যখন সে এসেছে তখন এদেব মত করেই নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তুচ্ছ সুবিধা অসুবিধাব কথা নিযে মাথা ঘামাতে সে চায় না। সূর্য্যদার মত বন্ধনহীন জীবনকে সে যখন মেনে নিতে পারে নি তখন সংসারেব মধ্যে থেকেই সে তাব স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে। শ্রীমতী জানালাব কাছ থেকে সরে এসে একখানি বই নিয়ে বসল।

অতনুর বাড়ীখানি বেশ বড। সম্মুখভাগে ফুলেব বাগান। বাগানটিকে ঘিবে রযেছে পাথরকুঁচি বিছানো সরু পথ। পশ্চাতে খেলার স্থান, চাকব-বাকবদের কোয়ার্টার, ধোপা ও মালির ঘর। এ ছাড়া আছে উদ্বৃত্ত আসবাবপত্র রাখার গুদাম। উগ্র বিদেশীয়ানার দেশীয় অনুকরণ।

অতনুর নিজের জন্য রয়েছে বসবার ঘর, সাজসজ্জার ঘর, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দেবার ঘব, সাহেব কিংবা মান্য অতিথিদের জন্য পৃথক্ অংশ।

একনজরে দেখতে গেলে মনে হয়, একের জন্য বহুর পয়োজন—প্রয়োজনেব জন্যে নয়। মোটকথা বিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ধূলিকণায প্রকাশমান। এতদিন তার একলাব জন্যই এত আয়োজন ছিল, আজ শ্রীমতী একটি অংশীদাব বাড়ল।

স্বামী আব স্ত্রী—সংসাবেব প্রধান, কিন্তু পুষ্যি অনেক। দাসদাসী বয় খানসামা ছাড়াও বহু বাড়তি আছে।

অতনু বলে, ওরা আব ক দিন! দু'দিনেব জন্যে এসেছে দু'দিন পবেই চলে যাবে।

ওবা বলে অন্য কথা—শ্রীমতীব শুভাগমনেব ফলেই নাকি এই নতুন ব্যবস্থা। কৌতূহল মনে জাগে, কিন্তু প্রকাশ পায় না। বরং অন্তবঙ্গ হয়ে উঠে। একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে যত্নবান হয়। তাবা পবস্পব মুখ চাওয়াচাওযি কবে, চোখে চোখে কি কথা হয়। শ্রীমতী ঠিক বুঝতে না পাবলেও অনুভব কবে যেন ওবা ভয় পেয়ে আরও বেশী দূবে সবে যাচ্ছে। শ্রীমতী এব কাবণ খুঁজে পায় না, তাই অতনুকে একান্তে পেয়ে নিজেব অভিজ্ঞতাব কথা জানায়।

অতনু হেসে বলে, কিছু অসঙ্গত কাজ কবে নি ওবা। তোমাব সঙ্গে ওদেব ব্যবধানটাব কথা স্মবণ কবেই এ কাজ কবেছে, ওবা অনুগ্রহপুষ্ট।

শ্রীমতী যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারে নি এমনিভাবে বলল, তাতে কি হয়েছে?

অতনু তাব বক্তব্যটা আব একটু পবিষ্কাব কবে বলল, পবের অনুগ্রহের উপব যাদের বেঁচে থাকতে হয় তাবা সব ভুললেও নিজেদের অবস্থাব কথা ভুলতে পাবে না শ্রী। ওদেব নিয়ে তুমি অকাবণ মাথা ঘামিও না।

এর পরে আর কথা বলা চলে না, কিন্তু শ্রীমতীকে যে বাঁচতে হবে একথাটা সে ভুলবে কেমন করে। সকলের কাছ থেকে নির্ব্বাসন দিয়ে একক জীবনযাপনের কথা ভাবতেও তার ভয় লাগে। তাই মাথা ঘামাতে নিষেধ করলেও সে প্রশ্ন না করে পারল না। বলল, কিন্তু ওদের সে কথা ভাববার অবকাশ যদি আমি না দিই ?

অতনু হো হো করে হেসে উঠল। বলল, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ওদের তুমি জান না বলেই একথা তোমার মনে এসেছে। ওদেব দয়া দেখালেই দাবি জানাবে। সহসা কথার মাঝে থেমে অতনু শ্রীমতীর অত্যন্ত সন্নিকটে এগিয়ে এল। তাব চোখে চোখ রেখে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, আমাদের বিয়ে অল্প ক'দিন আগে হয়েছে। অথচ এরই মধ্যে তুমি আমাকে বাদ দিয়ে ··। অতনু থামল, তার মুখে একটুখানি অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল।

শ্রীমতী আরক্ত হয়ে উঠল। আপত্তি জানিয়ে জবাব দিল, তুমি বেশ লোক যা হোক। তোমাকে বাদ দিলে আমি দাঁড়াব কোথায় ?

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলে, রাতের সুরুতেই একদিনও সকাল হতে দেখলাম না। নাওয়া-খাওয়াটাও ঘড়ির কাঁটাব সঙ্গেই হচ্ছে।

শ্রীমতীর বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল, অর্থাৎ ··

অতনু বলল, অর্থাৎ এতটুকু চাঞ্চল্য কোথাও চোখে পড়ে না। অবশ্য একথা তুমি বলতে পার যে, আমাব কি সে বয়স আছে যে—

শ্রীমতী সহসা খিলখিল করে হেসে উঠল, তুমি ত কম অসভ্য নও।

অতনু গম্ভীর কণ্ঠে বলল, কথাটা ত মিথ্যে নয়—

শ্রীমতী দুষ্টুমিভরা কণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু পিছন ফিরে না তাকিয়েও থাকতে পারছ না ত, যতই বয়সেব দোহাই দিচ্ছ ?

অতনু হেসে বলল, ওটা মানুষের ধর্ম্ম। দোষ আর গুণ সবটা মিলিয়েই একটা গোটা মানুষ।

শ্রীমতী সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, একথা তোমার কাছে আমি শুনতে চাইছি না।

অতনু বলল, কিন্তু আমি শুনতে চাই আব আগেই শুনিয়ে রাখতে চাই, কারণ এ এমনই একটা প্রশ্ন যা আমাদেব প্রতিদিনেব জীবনযাত্রার পথে প্রতিনিয়তই নিঃশব্দে আত্মগোপন কবে আছে।

শ্রীমতী বলল, এমন কত প্রশ্নই ত চোখেব আড়ালে মনেব মধ্যে আত্মগোপন কবে থাকে, কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। যার আত্মপ্রকাশ ঘটল না ওটা একটা প্রশ্নও নয়।

অতনু শ্রীমতীব মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে পুনবায় বলল, তোমার একথার অর্থ?

খুব সহজ। শ্রীমতী বলল, যেটা আমি জানি না—জীবনেব যে অংশের সঙ্গে আমাব পবিচয ঘটল না তা নিয়ে মাথা ঘামালে মাথার উপব অবিচার কবা হয।

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলল, কিন্তু মানুষেব আগ্রহ যে ঐখানেই বেশী।

শ্রীমতী তেমনি হাসিমুখে বলল, অপবেব কথা জানি না, আমি আমার কথা বলছি।

কথাটা বলে ফেলেই অতনু একবাব নতুন কবে পিছন ফিবে তাকাল—বড বেসুবো লাগল নিজের বলা কথা ক'টা তাব নিজেবই কানে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে হাসল, কোন জবাব দিল না শ্রীমতীব কথায়।

শ্রীমতী একটু বিস্মিত হ'ল তার হাসিব ধবনে। বলল, তুমি হাসছ?

অতনু ছদ্ম গাম্ভীর্য্যেব সঙ্গে জবাব দিল, তবুও দেখ আমি প্রকাশ্যেই হেসেছি।

শ্রীমতীও হেসে ফেলল, তুমি লোকটি খুব সুবিধেব নও।

অতনু তার মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল, অথচ আজ এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমি কোন দুর্ব্যবহার করি নি শ্রীমতী।

দুজনেই একসঙ্গে হাসতে থাকে।

মহাশয় বেশ কথা বলতে পারেন কিন্তু। হাসি থামিয়ে শ্রীমতী বলে।

অতনু সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয়, আব মহাশয়া খুব ভাল শর ক্ষেপণ কবতে পারেন। মহাশয়েব কথায় ধার নেই, কিন্তু মহাশয়ার শরে ধারের সঙ্গে গতি আছে যা প্রাণসংহার করে।

শ্রীমতী মনে মনে একটু চাঞ্চল্য বোধ কবলেও প্রকাশ্যে গম্ভীব কণ্ঠে কথা কয়ে উঠল, রক্ষার জন্যেই সংহাবেব প্রয়োজন, মহাশয়ের একথাটা জানা উচিত ছিল—

সহসা কথা থামিয়ে শ্রীমতী অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, কে আসছে।

হাতে একরাশ ফুল নিয়ে কেষ্ট এসে ততক্ষণে কাছে দাঁড়িয়েছে। সেই দিকে দৃষ্টি ফিবিয়ে অতনু বলল, আমাব কেষ্টচন্দ্র কখনও কাজে গাফিলতি কবে না। কেষ্ট একথাব কোন জবাব না দিয়ে ফুলগুলি নিয়ে পাশের ঘবে প্রবেশ করল।

শ্রীমতী জিজ্ঞেস করল, কেষ্ট তোমাদেব বহুদিনেব পুবানো চাকব বুঝি?

অতনু মুহূর্ত্তের জন্য হয়ত একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল পরমুহূর্ত্তেই জবাব দিল, তা পুবানো বলা চলে। তবে ওকে চাকর না বলে আমার মনিব বলাই উচিত। আজ পর্য্যন্ত আমাব কোন গুণই ওর চোখে পড়ে নি, সব সময় শুধু ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে।

শ্রীমতী হাসল।

অতনু বলতে থাকে, হাসিব কথা নয়। একমাত্র আমার বিয়ে করাটা কেষ্টচন্দ্র সুনজরে দেখেছে।

শ্রীমতী বলল, বরাৎ আমার ভাল বলতে হবে।

অতনু বলল, অবশ্যই স্বীকাব করতে হবে। বছবের পব বছর

ওর হুকুম তামিল করেও যা পাই নি, তুমি দু'দিন হয় এ বাড়ীতে এসেই তার চেয়ে বেশী পেয়ে গেছ। ব্যাটা কম শয়তান মনে করেছ ?

কেষ্ট চলে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়াল, একবার শ্রীমতীর একবার অতনুর মুখের পানে চেয়ে দেখে মুচকি হেসে চলে গেল।

অতনু বলল, বাবুর হাসিখানা দেখেছ শ্রী—

শ্রীমতী নিরীহগোছের মুখভঙ্গী করে বলল, দেখবার মত হাসি বুঝি ?

অতনু জানাল, অর্থপূর্ণ হাসি।

শ্রীমতী বলল, অর্থটা কি শুনি—

অতনু শ্রীমতীর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেল।

শ্রীমতী দু'হাতে অতনুর মুখটা ঠেলে দিল। ফিসফিস করে বলল, বয়স হয়েছে না তোমার। উঁহু—এখন নয়। ছিঃ, বাড়ী ভরতি লোকজন—তোমার কি কোন জ্ঞান—এই জন্যেই বুঝি ওর হাসিটা—না না না। শ্রীমতী আরক্তিম হয়ে ওঠে। চঞ্চল পদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে।

দুজনের মধ্যে সমান ব্যবধান রেখে অতনুও তার অনুসরণ করে।

লজ্জায়, আবেগে আর হাসিতে মাখামাখি হয়ে উঠেছে শ্রীমতীর মুখখানা, বিহ্বল কণ্ঠে বলে, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—

যাকে কথাটা বলা হ'ল সে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলল, ও বস্তুটি আমার চিরদিনই একটু কম, ওতে সব সময়ই লোকসান হয়।

শ্রীমতী অতনুর একখানা হাত নিয়ে খেলা করতে করতে লজ্জা জড়ান কণ্ঠে বলল, তুমি বড্ড লোভী কিন্তু, এত লোভ থাকা ভাল না।

অতনু জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট দু'খানা বারকয়েক লেহন করে বলল, আকাঙ্ক্ষা থাকলেই না পাওয়ার প্রশ্ন দেখা দেবে। জান শ্রীমতী, আমার মধ্যে ছিল দুর্জ্জয় লোভ, তাই আমার চাওয়া কোনদিন ব্যর্থ হয় নি, জীবনের সকল স্তরে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে শ্রীমতী অতনুর মুখের পানে চেয়ে থেকে বলল, কিন্তু লোভটা বড় খারাপ, ওর শেষ নেই।

অতনু শ্রীমতীকে একপ্রকার মেনে নিয়ে বলল, কথাটা ঠিক। সবকিছুই যদি পাওয়া হয়ে গেল তা হলে আর এখানে কেন, বানপ্রস্থে গেলেই হয়। এ সব হচ্ছে শাস্ত্রের কথা, আমার কাছে আমার শাস্ত্র আর ধর্ম্ম হ'ল নিজের মনের নির্দ্দেশ। একেই আমি সবচেয়ে বড় মর্য্যাদা দিয়ে এসেছি। আমার জীবনদর্শন ঘটেছে ঘোরা পথে—যে পথ সহজ এবং স্বাভাবিক নয়। কথাটা প্রথম বুঝলাম যখন নিজেকে চিনতে সুরু করেছি। ভাবতাম এ কি শিক্ষা ঠাকুরদা আমাকে দিচ্ছেন। প্রতিবাদ করতে পারি নি নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে। কত আর বয়স তখন আমার, তা ছাড়া প্রতিবাদ করে যেখানে নিজের একমাত্র পুত্র

বলতে গিয়েও অতনু কথাটা শেষ করল না। মুহূর্ত্তের জন্য তার মধ্যে একটা সাময়িক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল মাত্র। সুরুতেই নিজেকে সামলে নিল। বলল, এ সব কথা আজ থাক শ্রীমতী। এমন মুখর সন্ধ্যাটাকে আমি মাটি করতে চাই না, বরং চল বাগানে গিয়ে একটু গল্প করি।

শ্রীমতী খুশী হয়ে উঠে দাঁড়াল, অতনু ততক্ষণে চলতে সুরু করেছে।

৪

অতনু আর শ্রীমতী বাগানে এসে উপস্থিত হ'ল। সুন্দর বাগানটি, সবুজের সমারোহ। একটি লতাকুঞ্জের কাছে এসে শ্রীমতী প্রথমে বসে পড়ল, তারপরে শুয়ে পড়ল। অতনু নিঃশব্দে তার পাশে উপবেশন করতেই শ্রীমতী তার কোলের উপর নিজের একখানি হাত রেখে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তারপর—

অতনু কথাটা কি তা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, কিসের তারপর শ্রী?

শ্রীমতী তার অপর হাতে অতনুর কোমর বেষ্টন করে কতকটা আবদারের ভঙ্গিতে বলল, তুমি রাগ করো না—আমি তোমার মা-বাবার আর ঠাকুরদার কথা শুনতে চাইছিলাম।

অতনু একটুখানি হাসল। কিছুক্ষণ চুপ করে কি চিন্তা করে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল, যাদের কথা তুমি শুনতে চাইছ শ্রী তাদের কতটুকু আমি জানি? মাকে আমার চোখে দেখারও সুযোগ হয়নি, আর বাবাকে চোখে দেখলেও তাকে দেখা বলে না—

শ্রীমতী বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তোমার একথার মানে?

অতনু একটু দুঃখের হাসি হাসল। বলল, মানে খুবই সোজা, আমার জন্মাবার অল্প কিছুদিনের ব্যবধানেই মা মারা যান।

আর তোমার বাবা? শ্রীমতী প্রশ্ন করে।

অতনু অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয়, সেইটেই আজও আমার কাছে একটা রহস্য, শুনেছি আমার দু'বছর বয়সের সময় বাবা গৃহত্যাগ করেন।

শ্রীমতী বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তোমার ঠাকুরদা যেতে দিলেন? বাধা দিতে পারলেন না তিনি?

অতনু ম্লান হেসে জবাব দিল, শুধুই কি দিলেন, তাঁকে চলে যেতে বাধ্য করলেন।

কিছুক্ষণ দু'জনার কারুর মুখেই কোন কথা জোগাল না, নীরবতা ভঙ্গ করে শ্রীমতীই প্রথমে কথা কইল, তোমার বাবা তোমাকে দাবি করলেন না?

অতনু একটু হেসে বলল, করেছিলেন—দাবি নয় আবেদন। কিন্তু ঠাকুরদা তাঁকে আদালতে যাবার উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন। ঠাকুরদার সন্তান হলেও তাঁর শিক্ষিত ভদ্র মন অতটা এগোতে পারে নি।

অতনু থামল। তার মন আবার অতীত স্মৃতির সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে সুরু করেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় শ্রীমতী জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবার অপরাধ ?

অপরাধের কথা ঠিক জানি না। অতনু বলল, ঠাকুরদার মতে বাবা তাঁকে নাকি দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটু থেমে সে আবার বলল, বাবার কথা আমি জানি না, তবে এটুকু জানি যে, ভরাডুবি যদি কেউ করে থাকেন ত সে আমাব বাবা নন—ঠাকুবদা।

শ্রীমতী সহসা উঠে বসল, ভাবি অদ্ভুত লাগছিল অতনুর কথাগুলি। অতনু থামতেই তার মুখ থেকে নিজের অজ্ঞাতে বেবিয়ে এল, তাবপব ?

অতনু ধীরে ধীবে বলে, এ সব কথা আজ থাক শ্রী। এ সব চিন্তা আমাকে বর্ত্তমান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, আমি ভয় পাই।

শ্রীমতী সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, বেশ ত থাক না। কিন্তু এতে ভয় পাবার কি কাবণ থাকতে পাবে আমি বুঝি না।

শ্রীমতী আরও একটু ঘন হয়ে বসে গভীর কণ্ঠে আবাব বলল, বলতে যদি তুমি ব্যথা পাও তা হলে কোনদিন বলো না। আমাব জিজ্ঞাসা শুধু কৌতূহল। অতনুব একখানি হাত পুনবায় নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে একটু চাপ দিল সে।

অতনু যেন নিজেব মনেই বলে উঠল, ব্যথা ! বড় বিশ্রীভাবে সে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে শ্রীমতী চমকে উঠল। অতনু স্পষ্ট অনুভব কবল সে চমক। নিজেব হাসিব শব্দটা তাব কানেও বড় বেসুরো ঠেকেছে। মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে পুনরায় মৃদুকণ্ঠে আবম্ভ করল, তোমাকে মিথ্যে বলছি না শ্রী। ব্যথার চেয়েও সত্যিই আমি ভয় পাই সেদিনের কথা ভাবতে গেলে। তবুও তোমাকে আমি বলছি—

বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, না থাক সে সব কথা। ও আমি শুনতে চাই না। তুমি ঠিকই বলেছিলে, আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যাটা ভারাক্রান্ত করে তুলবার কোন অধিকার আমার নেই।

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলল, আমি বড্ড লোভী, কিন্তু আমার লোভের জাত আলাদা শ্রী, এখানে আমি ঠাকুরদার মন্ত্রশিষ্য। সহজলভ্যে মন ওঠে না, বরং বিপথগামী হয়।

শ্রীমতী উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। অতনু বলে চলে, এ বাড়ীর কুলবধূ হয়ে যখন এসেছ তখন আজই হোক কালই হোক সব কথাই তুমি জানবে। আমি বললেও জানবে, আমি না বললেও জানবে। কাজেই আমার কাছ থেকে জেনে নেওয়াটাই ভাল নয় কি? তা ছাড়া

একটু থেমে সে পুনরায় সুরু করল, আমার হাসির শব্দে একটু আগে তুমি চমকে উঠেছিলে। স্বাভাবিক কথা, কারণ সব কথা ঠিক তোমার বুঝবার মত করে আমি গুছিয়ে বলি নি। ঘটনাগুলি আমার মনে এত বেশী আনাগোনা করেছে যে, আরম্ভ এবং শেষ সব একাকার হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ শুনলে দুর্ব্বোধ্য ঠেকে। আমি ভুলে যাই যে, কাহিনীটা আমি নিজেকে শোনাচ্ছি না শুনছে অপরে। অতনু থামল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাদের আশেপাশে প্রচুর চাঁদের আলো ছড়িয়ে ছিল, হঠাৎ একখণ্ড কালো মেঘ ভেসে এসে তাকে আড়াল করল।

অতনু পুনরায় আরম্ভ করল, তাই আমি গোড়া থেকেই তোমাকে শোনাচ্ছি—আমার ধারণা ঠাকুরদার খামখেয়ালী আর অবিবেচনার জন্যই তাঁর বিশাল সম্পত্তি একেবারে ডুবে গেল। কিন্তু এ ঘটনা হ'ল ঠাকুরদার জীবনের শেষপর্ব্ব। যে পর্ব্ব আমার জীবনে একটা নতুন দিকের সন্ধান দিল। এই নতুন দিকের কথা বলতে গেলে আমাকে আবার পুরাতন দিনে ফিরে যেতে হবে, নইলে বলাটা আমার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শ্রীমতী আগ্রহভরে শুনছে—একাগ্র ও তন্ময় হয়ে শুনছে অতনুর পূর্ব্ববর্ত্তীদের অজ্ঞাত কাহিনী।

অতনু বলতে থাকে, আমি শুনেছি যে, বাবা চলে যাবার পর দাদু নাকি দিনকয়েক খুব লাফালাফি করেছেন। বাবাকে

উপলব্ধি করে তিনি নিজেকেই বহু অশ্রাব্য-কুশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ করেছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেখানে উপস্থিত থাকে না সেখানে এর পরমায়ু নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। আমার ঠাকুরদার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। তিনি একেবারে থেমে গেলেন। বাবার সম্বন্ধে তাঁর মুখে ভাল-মন্দ কোন কথাই আর কোনদিন কেউ শোনে নি। কিন্তু নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি আমাকে নিয়ে মেতে উঠলেন। ঠাকুরদার নির্দ্দেশে তার দু'বছরের নাতি অতনুর শিক্ষা সুরু হ'ল। সব কথা তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না—আমার নিজের কাছেও কেমন ধোঁয়াটে লাগে আজ। তবুও মাঝে মাঝে আত্মবিশ্লেষণ করতে বসে মনে হয় ঠাকুরদা একটা জিদের বশে কত বড় অন্যায় করে গেছেন। আর একটু ধৈর্য্য, আর একটু উদারতা যদি তাঁর থাকত তা হলে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতে পারত। অতনুর এত পয়সা আর নামডাক হয়ত হ'ত না, কিন্তু পলে পলে আত্মবিশ্লেষণের হাত থেকে অব্যাহতি পেত।

শ্রীমতী অকস্মাৎ তাকে বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু এ নিয়ে তুমি দুঃখ পাচ্ছ কিসের জন্য। যে নিজের দোষত্রুটি বিশ্লেষণ করতে পারে সে অনেক শক্ত পথই ডিঙিয়ে যেতে সক্ষম।

অতনুর চোখেমুখে খানিকটা অর্থপূর্ণ হাসি দেখা দিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, চুপ করে রইলে যে? মিথ্যে বলেছি আমি?

সত্যি-মিথ্যে জানি না শ্রী। অতনু বলল, কিন্তু আমি মানুষ হয়েছি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। আমার কাছে বেঁচে থাকার অর্থ আলাদা রকমের। তোমরা তাকে কোনদিন স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারবে না।

শ্রীমতী একটু হেসে বলল, বড্ড বড় বড় কথা বলছ তুমি।

অতনু জবাব দিল, হঠাৎ শুনলে তাই মনে হয় শ্রী, তবে তোমাকে আমি আমার মনের কথাই বলেছি। একদিন হয়ত কোন কথাই

তোমার কাছে অবাস্তব মনে হবে না। তখন ভয় পেয়ো না—পিছিয়ে যেয়ো না। তোমার সাহস আছে, মনের জোরও আছে। চেহারার গৌরব তুমি করতে পার—কারণ তুমি রূপসী। কিন্তু আমি তোমার রূপ চাই নি—ওটা আমার কাছে সহজলভ্য —

সহসা শ্রীমতীর মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই সে চুপ করল।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল তুমি বড্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছ, আমাকে তোমার কাহিনীর মধ্যে এনে ফেলেছ কিসের জন্য ?

অতনু অকস্মাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। খানিক একাগ্র দৃষ্টিতে শ্রীমতীর মুখের পানে চেয়ে থেকে কিছু সন্ধান করে নিয়ে পরমুহূর্তেই অনেকটা সতর্ক হয়ে উঠল।

অতনু অকারণে বহুক্ষণ ধরে হো-হো করে হাসল, তারপরে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল, জান শ্রী, টাকা উপায় করা আর কথা বলা এ দুটো আলাদা জিনিস, দুইয়ে অনেক প্রভেদ। তেমন গুছিয়ে কথা বলতে আমি জানি না, কিন্তু আমার কাহিনীর মধ্যে তোমার আবির্ভাবটা মিথ্যে নয়, বরং এইটেই সবার সেরা সত্য। ডাক্তার বলেন, আমার জীবনে শ্রীমতী লাভটাই সুন্দর আর সত্য, তাকে আঁকড়ে থাকলেই নাকি অতনুর মোক্ষলাভ হবে।

অতনু পুনরায় হেসে উঠে বলল, ডাক্তারবাবু একটি পাগল কি বল ?

শ্রীমতীর বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল, ডাক্তারবাবু! কে তিনি ? তাঁর কথা এর আগে কোনদিন শুনি নি ত ?

অতনু বলল, আমাদের গৃহ-চিকিৎসক। অকারণে তাঁর সাক্ষাৎ মেলে না। আমাদের বিয়েটা একরকম তাঁর পরামর্শেই হয়েছে।

শ্রীমতী একটু হেসে বলল, তুমি কারুর পরামর্শমত কাজ কর ?

অতনু হাসিমুখে জবাব দিল, মনের মত পরামর্শ দিলে করি। ঠাট্টা নয় শ্রীমতী, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ডাক্তারবাবু সত্যিই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তাঁর কথা আজ থাক, ঠিক সময় তুমি তাঁর দেখা পাবে।

অতনু আবার তার পূর্ব্বকথায় ফিরে এল, হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। ঠাকুরদার যদি আর একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকত তা হলে তাঁর পারিবারিক ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হ'ত।

একটু থেমে একটি নিঃশ্বাস মোচন করে অতনু পুনরায় বলতে লাগল, কিন্তু যা হয় নি তা নিয়ে আর কথা বলে লাভ কি। অথচ এমনই আশ্চর্য্য যে, এই ভাবনার হাত থেকে আমি আজও রেহাই পাই না। তুমিই বল শ্রী, এ কি কখনও ভোলা যায়? একটা অবোধ শিশুর অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে তার উপর চলল ঠাকুরদার পরীক্ষা। জমিদারের ছেলে হয়ে বাবা মানুষের স্বভাবধর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন—তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে সুরু করল দু'বছরের অতনু অজ্ঞান শিশু আমি, আমার পৃথিবী দাদু—তাঁকে প্রদক্ষিণ করে আমি পৃথিবী দেখতাম। দাদুর হাতে আমার শিক্ষা সুরু হ'ল—যে পথ ধরে তিনি আমায় নিয়ে এগিয়ে চললেন তাকে তোমরা স্বাভাবিক বলে কোনদিন ভাবতে পারবে না। আমার অভিধানে মায়া, দয়া কিংবা ক্ষমাকে বলা হ'ত দুর্ব্বলতা। দাদু আমাকে এই দুর্ব্বলতা সব সময় পরিহার করে চলতে শিখিয়েছেন। তিনি বলতেন, এই দুর্ব্বলতা হ'ল মানুষের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। আর এই অন্তরায়কে যে কাটিয়ে উঠতে পারে না, হয় তার সংসার করা উচিত নয়, নয় ত তাকে চিরকাল অভাব আর অনটনের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে জীবন পাত করতে হবে। বাবার সঙ্গে ঠাকুরদার মতবিরোধ এই পথেই প্রথম দেখা দিয়েছিল বলে আমি শুনেছি। সম্ভবতঃ সেইজন্যই ঠাকুরদা সযত্নে আমার মধ্যের এই সুকুমার বৃত্তিগুলিকে গলা টিপে মারতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এই কারণে তোমার বাবাকে তিনি ত্যাগ করলেন?

অতনু জবাব দিল, তাই শুনেছি, তবে ঠাকুরদার কাছে নয়। আশ্চর্য্য কঠিন তাঁর প্রাণ ছিল! বাবা চলে যাবার পর তাঁর

দৈনন্দিন জীবনে এতটুকু পরিবর্ত্তন কেউ কোনদিন দেখে নি। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত না। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে দাদুকে বড় দুর্ব্বল আর অসহায় মনে হ'ত। মনে হ'ত একটা বড় বেদনা থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়েই তিনি নিজেকে আরও বেশী করে নিপীড়ন করে গেছেন।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, তোমার কথাগুলি পরস্পর-বিরোধী হয়ে যাচ্ছে, এই বলছ কঠোর প্রাণ আবার বলছ দুর্ব্বল অসহায়, আত্মনিপীড়ন—

তাকে বাধা দিয়ে অতনু বলল, চুলচেরা হিসেব করলে কি দাঁড়াবে তা আমি জানি না শ্রী, কিন্তু আমার অতীত এবং বর্ত্তমান জীবনটা পর্য্যটন করে যে কথাটা মনে এসেছে তাই তোমাকে জানিয়েছি, তার বেশী নয়।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল তোমার বাবা আর একদিনের জন্যও দেখা দিলেন না?

অতনু মাথা নেড়ে জবাব দিল, না—তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না। আমার সামনে যদি তিনি এসে আজ দাঁড়ান তা হলেও তাঁকে আমি চিনব না। বাবার একখানা ছবি পর্য্যন্ত ঠাকুরদা রেখে যান নি। কিন্তু এত করেও ঠাকুরদা ভরাডুবি ঠেকাতে পারেন নি। যে ফুটো নৌকায় তিনি পার হতে চেয়েছিলেন তাতে জোড়া-তাপ্পি দিতে কাউকে দিলেন না, তাই ডুবল যখন একেবারেই তলিয়ে গেল। তখন আমার বয়স কত জান? মাত্র বাইশ বছর।

অতনু একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগল, কেমন করে যে এটা সম্ভব হ'ল তা একদিনের জন্যও বুঝবার অবকাশ পেলাম না। বাবা হয়ত বুঝেছিলেন তাই জোড়া-তাপ্পি দিয়ে রং পালিশের কথা তুলেছিলেন কিন্তু দাদু ভুল বুঝলেন।

শ্রীমতী বলল, তোমার বাবা তাঁকে বুঝিয়ে দিলে ত এত বড় অঘটন ঘটত না।

অতনু বলল, বাবা চেষ্টা করেও অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন কিনা সে খবর আমার জানা নেই শ্রী। শুধু শুনেছি পুত্র চেয়েছিলেন প্রজাদের মানুষের মত বাঁচিয়ে নিজেরা বেঁচে থাকতে। আর দাদু চেয়েছিলেন তাঁদের সাবেকী আমলের ঠাট বজায় রেখে তোগলকি শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখতে। মতান্তর এখানেই চরমে উঠল, বাবা মহলে মহলে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে উদ্যোগী হলেন, ঠাকুরদা দিলেন বাধা। বললেন, এসব ভাব বিলাসিতা—লোকচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। বাবা বললেন, অশিক্ষা আর কুশিক্ষার ছিদ্রপথ ধরেই যত রাজ্যের গোলমাল দেখা দেয়। ঠাকুরদার মতে ঠিক তার উল্টো। এ দের মধ্যে কার কথা সত্য এ নিয়ে আজকের দিনে একটা থিসিস লেখা যায়। কিন্তু ঠেকে ঠেকে আর দেখে দেখে আজ কিন্তু আমার মনেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ঠাকুরদার মতটাও একেবারে মিথ্যে বলে ভাবতে পারছি না।

শ্রীমতী বিহ্বলকণ্ঠে বলল, তুমিও তোমার ঠাকুরদাকে সমর্থন কর ?

তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনটা অতনু লক্ষ্য করল। সে আপন মনে একটু হেসে নিয়ে প্রকাশ্যে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবেই বলল, ঠাকুরদার কাছেই আমি শিক্ষা পেয়েছি এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেন শ্রী, এর প্রভাব কি সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়।

শ্রীমতী সহসা সোজা হয়ে উঠে বসল। অতনুর মুখের পানে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবিচলিত কণ্ঠে বলল, বোধ হয় এইটেই স্বাভাবিক। তোমার মধ্যে তোমার বাবার রক্ত আর ঠাকুরদার শিক্ষার সংঘাত চলেছে।

মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে অতনু বলল, আশ্চর্য ডাক্তার-বাবুও ঠিক এই কথাটাই মাঝে মাঝে বলেন। তোমাদের চিন্তাধারার একটা অদ্ভুত মিল আছে দেখছি। তবুও আমার মনে হয় তোমাদের এ যুক্তি সত্য নয়, ডাক্তারকেও আমি বলেছি। কিন্তু আজ আর

নয় শ্রী, অনেক রাত হয়েছে। তা ছাড়া আমাকে আবার একবার বাইরের মহলে যেতে হবে—আমার খাস কামরায়। এতক্ষণ হয়ত আমার এক সাহেববন্ধু এসে বসে আছেন।

শ্রীমতী বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়াল এবং কোন কথা না বলে অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে চলল। অতনুর কথাগুলো তার মাথার মধ্যে তখনও পাক খাচ্ছে।

শ্রীমতীকে অন্দরমহলে পৌঁছে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে শিস্ দিতে দিতে বাইরের পথে পা বাড়াতেই শ্রীমতী তাকে পিছু ডাকল, তোমার সাহেব মক্কেলের কাছে বুঝি খুব বেশী দরকার?

অতনু ফিরে দাঁড়াল, দরকার একটু আছে বৈকি, কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

বেশ যা হোক। শ্রীমতী একটু হাসল, কারণ ছাড়া বুঝি কোন কথা জিজ্ঞেস করতে নেই?

তার কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানি না, কিন্তু অতনুকে শ্রীমতীর অতি সন্নিকটে ফিরে আসতে হ'ল। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বলল, ডাক্তার বলেন সোনার শিকল—কথাটা দেখছি মিথ্যে বলেন নি। তখন যদিও তার মুখের উপর খুব হেসেছিলাম। থাকগে আমার সাহেব মক্কেল, ওরা আমার রোজ দিনের সঙ্গী। অতীতেও ছিল—ভবিষ্যতেও থাকবে। মাঝের ক'টা দিন বৈ ত নয়

শ্রীমতী অতনুর কথা বলার ধরনে হেসে ফেলল, এ ক'টা দিন তা হলে অপব্যয় করছ কেন?

অপব্যয়? অতনু আরও একটু এগিয়ে এসে প্রায় শ্রীমতীর কানের কাছে মুখ এনে বলল, অতনু অপব্যয় করাটা সব সময়ই অপছন্দ করে শ্রীমতী। অঙ্কশাস্ত্রটা সে খুব ভাল বোঝে।

শ্রীমতী জবাব দিল, তোমার দেখছি খুব অহঙ্কার—

অতনু বলল, তা একটু আছে, ওটা থাকা ভাল।

শ্রীমতী বলল, ঠিক বুঝলাম না।

অতনু জবাব দেয়, ছু'দিনেই কি একটা লোকের সব কথা বোঝা যায়? সময় লাগে। তাব চেয়ে চল তোমাব ঘবেই যাই।

৫

ছু'দিনেই একটা লোকেব সব কথা বোঝা সম্ভব নয—। বিশেষ কবে অতনুব মত লোকেব। যাব ব্যক্তিগত জীবনের আবও বহুদিক দিবালোকে কারুব চোখে পডে না। কথা প্রসঙ্গে আজ যে কাহিনী সে শ্রীমতীকে শুনিযেছে এব মধ্যে সত্য অনেকখানি থাকলেও একে আমবা অতীতেব একটা ভগ্নাংশ বলেই জানি। সুতরাং অতনু তাব কাহিনীব উপর যবনিকা পাত করতে চাইলেও আমবা এখানে থামতে পারি না। আমাদেব ফিরে যেতে হবে এই কাহিনীব আবম্ভে। ওদের পারিবাবিক বিপর্য্যয়ের গুটিকয়েক প্রধান অধ্যাযে। যে অধ্যাযেব সঙ্গে অতনুর জীবনের রযেছে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

অতনুব ঠাকুবদা কেদাব মুন্সী ডাকসাইটে বডলোক ছিলেন। তাব বাবা হাবান মুন্সী যখন মাবা যান তখন তাঁদেব জমিদাবী পতনোন্মুখ। হাবান মুন্সীব সদাশযতাব সুযোগ নিয়ে তাঁব আশেপাশেব ভাগ্যান্বেষীব দল তাঁকে প্রায শেষ কবে এনেছিল। কেদাব সব খবব জানতেন, কিন্তু বাপকে যথাসময় সতর্ক কবে দিয়েও কৃতকার্য্য হন নি। তিনি হেসে বলতেন, ওদের বড্ড অভাব কেদাব, নইলে লোক ওবা খাবাপ নয। আমি যে ক'টা দিন বেঁচে আছি সে ক'টা দিন আমাব মত করেই চলতে দে—

তারপরে বেশীদিন হাবান মুন্সী বাঁচেন নি, কিন্তু যে ক'টা দিন ছিলেন তারই মধ্যে অনেক কিছু তলিয়ে যেত যদি না কেদার মুন্সীব সতর্ক-দৃষ্টি আরও সজাগ হয়ে না উঠত। পিতার মৃত্যুর পরে কোনপ্রকার সাবধান হবাব অবকাশ না দিয়ে তিনি শক্ত হাতে তাদের টুঁটি টিপে ধবলেন যারা তাঁদেব ধনভাণ্ডারে সিঁদ

কেটে সর্ব্বস্বান্ত করতে চলেছিল। তাঁর দৃঢ় মুষ্টির প্রচণ্ড চাপে ওরা চূর্ণ হ'ল। এই কেদার মুন্সীর নাতি অতনু মুন্সী।

কেদারের হাতে যখন ক্ষমতা এল কল্যাণ তখন মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র। ঠাকুরদার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সেই যে তিনি দেশে এলেন আর তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে দেওয়া হ'ল না। কল্যাণের পড়াশুনার সেইখানেই হ'ল ইতি। কল্যাণ আপত্তি করেছিলেন। কেদার চোখ রাঙিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, এক কথা আমি দু'বার বলা পছন্দ করি না কল্যাণ। ডাক্তারী করে তোমার পয়সা উপায় করতে হবে না।

কল্যাণ মৃদুকণ্ঠে বললেন, টাকা উপার্জ্জনের জন্যই কি পড়াশুনা বাবা—

কেদার হুঙ্কার দিলেন, তবে কিসের জন্য শুনি?

কল্যাণ মৃদুকণ্ঠে জানালেন, জ্ঞান অর্জ্জন—যা মনের প্রসারতা নিয়ে আসে। বিকাশ--

তাঁকে বাধা দিয়ে কেদার বললেন, বলি পড়াশুনা করতে কে তোমাকে নিষেধ করছে বাপু? বিকাশ করাতে চাও ঘরে বসে করাও আর সেই সঙ্গে জমিদারীর কাজটাও শিখে নাও। আখেরে কাজে লাগবে। বাড়ীতে লাইব্রেরী আছে, দরকার মনে কর ত আরও বই আনিয়ে নাও। কিন্তু কাজকর্ম্ম তোমাকে এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে। নিজে আমি অনেক ঠকেছি তোমাকে আর ঠকতে দিতে চাই না।

এত কথার পরেও কল্যাণ বলেছিলেন, আর গোটা দুই বছর কি কোন রকমে—

বাধা দিয়ে পুনরায় কেদার জবাব দিয়েছিলেন, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না কল্যাণচন্দ্র। আমাকে তোমার ঠাকুরদা পাও নি।

কথার মাঝেই কল্যাণ উঠে গেলেন। পুত্রের এই ব্যবহার কেদার সহজ মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। এই প্রকার নিঃশব্দে

চলে যাওয়ার মধ্যে তিনি একটা চাপা বিদ্রোহের সন্ধান পেয়ে আরও ঢের বেশী সতর্ক হয়ে উঠলেন এবং সে যুগের লোকেরা যে দাওয়াইকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করতেন তারই প্রয়োগ করা হ'ল। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই কল্যাণকে বিবাহ করতে হ'ল।

কেদার আশ্বস্ত হলেন। কল্যাণ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে জমিদারীর প্রত্যেকটি বিভাগের কাজকর্ম্ম দেখে বেড়াতে লাগলেন। কেদার সকলের অলক্ষ্যে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। পুত্রবধূর দেওয়া পান মুখে পুরে গড়গড়ায় মৃদু টান দিয়ে আপন মনে কথা কয়ে ওঠেন, যা ব্যাটা এবারে শহরে, তোর মনের বিকাশ ঘটাতে—হুঃ

পুত্রবধূ পাশেই অপেক্ষা করছিল, সে খুক্ খুক্ করে হেসে উঠল। জিজ্ঞেস করল, আপনি কার কথা বলছেন বাবা?

কেদার পুত্রবধূর পানে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেন, বলছিলাম ঐ ব্যাটা কল্যাণ মুন্সীর কথা। বলে কিনা শহরে গিয়ে পড়াশুনা না করলে মহারাজার মনের বিকাশ ঘটবে না। দিয়েছি তেমনি এক চালে মাৎ করে। আর কথাটি নেই মুখে।

পুত্রবধূ মাথা নত করল। সেইদিকে খানিক সস্নেহে চেয়ে থেকে তিনি পুনরায় বলেন, সাপের বাচ্চা সব সময় সাপই হয়, তাই সময় থাকতে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এর পরে যার জিনিস তিনিই ব্যবস্থা করবেন। আমি সময় মত দু'খিলি পান আর একটু তামাক পেলেই তুষ্ট।

বলেই তিনি আর একদফা হো-হো করে হেসে উঠলেন এবং পুনরায় গড়গড়ায় বারকয়েক সুখ-টান দিয়ে বলে ওঠেন, তাই বলে নিশ্চিন্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না মা। সুযোগ পেলেই ব্যাটা ছোবল দিতে পারে। পাকা হাতে শ্রীমানের বিষ দাঁতটি ভেঙ্গে দেওয়া চাই।

পুত্রবধূ একটু যেন শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, তার জন্যে ত আপনিই আছেন বাবা।

নলটি মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে কেদার পুত্রবধূর মুখের পানে একদৃষ্টে খানিক চেয়ে থেকে তেমনি হাসিমুখেই পুনরায় জবাব দিলেন, বোকা মেয়ে, সব কাজ কি সকলের দ্বারা হয় না। পাছে হেরে যাই তাইত তোমার স্মরণাপন্ন হয়েছি।

পুত্রবধূ সলজ্জ হাসল। কেদারের তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, এটা হাসির কথা নয়, সত্য কথা। শাসনের বয়েস কল্যাণের পার হয়ে গিয়েছে। তাই চতুর্দ্দিকে একটা মায়ার ব্যূহ রচনা করে রাখতে হবে। ওর বিভিন্নমুখী চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। যেন একটি পথ ছাড়া অন্য কোন রাস্তাই ওর চোখে না পড়ে। বন্ধনের শত পাকে ওকে জড়িয়ে ধরা চাই মা।

পুত্রবধূ ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল। মাত্র বছরখানেক তার বিয়ে হলেও এত অল্প সময়ের মধ্যে স্বামীর চরিত্রের যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে শ্বশুরের উপদেশগুলিকে সহজমনে গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু খোলাখুলি কিছু বলা উচিত হবে না এ কথাটাও সে অনুভব করে। তাই মুখে খানিকটা হাসি ফুটিয়ে তুলে নতকণ্ঠে বলল, বড্ড শক্ত কাজ বাবা।

কেদার পুত্রবধূকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, শক্ত মনে করলেই শক্ত—নইলে কিছুই নয়।

পুত্রবধূ এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। তার শান্ত ভাবলেশহীন মুখের পানে খানিক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে কেদার পুনরায় বললেন, তুমি বুঝি ভাবছ, কাজটা যদি সোজাই হবে তা হলে আমার দ্বারা তা হ'ল না কেন? কিন্তু ভুলে যেও না চন্দ্রা মা, আমি তার বাপ আর তুমি তার স্ত্রী। যে কথা তোমার কাছে গোপন থাকবে না আমি হয়ত আজীবন সন্ধান করেও তার কোন সন্ধান পাব না।

পুত্রবধূ চন্দ্রা স্মিতকণ্ঠে বলল, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন বাবা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে কেদার উৎসাহিত

বললেন, আমার আশীর্ব্বাদ তোমরা সব সময়ই পাবে। তাই বলে কোনদিন ভুল করেও ভুলে যেও না যে, শুধু আশীর্ব্বাদে এ-যুগে কোন কাজ হয় না মা।

একটু থেমে তিনি পুনশ্চ বলতে থাকেন, মানুষের মধ্যে মায়া, দয়া এবং অন্যান্য সৎগুণ থাক—এ সকলেই চায়, কিন্তু তাই বলে নিজের স্বার্থের নষ্ট করে যারা নাম কিনতে চায় আমি সে দলের নই।

চন্দ্রা একটু ইতস্ততঃ করে মৃদু কণ্ঠে বলল, কিন্তু কালের প্রভাবকে কি এত সহজে অস্বীকার করা সম্ভব ? তা ছাড়া

কেদার সহসা সোজা হয়ে বসলেন। তিনি খানিকটা গম্ভীর হয়ে উঠলেন। এবং চেষ্টা করে সহজ কণ্ঠে বললেন, এ সব ত ভাল কথা নয় চন্দ্রা মা। আমি বেশ বুঝতে পারছি, হতভাগা তোমার কাছেও বড় বড় কথা বলতে সুরু করেছে। তিনি থামলেন।

অসাবধানে যে কথা চন্দ্রার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে তার জন্য সে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। অস্বীকার করতে পারলেই ভাল হ'ত, কিন্তু পাছে শ্বশুরের মনে অন্যপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এই ভয়ে সে নতমস্তকে বসে রইল।

কেদার মুন্সী পাকা খেলোয়াড়—কথার গতি থেকে ব্যাপারটা তিনি এক নিমেষে বুঝে নিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তার বাহ্যিক গাম্ভীর্য্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে সেখানে দেখা দিল প্রসন্ন হাসি। তিনি মধুর কণ্ঠে বললেন, তোমার লজ্জিত হবার কোন কারণ আমি দেখছি না চন্দ্রা মা, বরং কথাটা আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়ে ভাল কাজই করেছ। এবার থেকে এই বুড়োর বুদ্ধি আর তোমার শক্তি একসঙ্গে কাজ করবে। বুঝলে মা চন্দ্রা, এইখানেই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ যে, কল্যাণচন্দ্র এখনও নিজের ভাল বুঝতে শিখল না। না হয় স্বীকার করে নিচ্ছি যে, তোর সব কথাই সত্য এবং এই সত্যধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে যে নিজেকে

ভিখারীর তুল্য করে তুলবি এ কথাটা একবার ভেবে দেখ। তা ছাড়া তুই এখন আর একলা নস। বিয়ে করেছিস—আর সামান্য ক'টা মাসের ব্যবধানে বাপ হতে চলেছিস। তোর কিনা ·

চন্দ্রা লাল হয়ে উঠল। কেদার সস্নেহে পুত্রবধূর লজ্জারুণ মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে পুনশ্চ বলতে সুরু করলেন, এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে তোমায় বুঝাতে চেষ্টা করছিলাম মা। এখন থেকেই বুঝে-শুঝে শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধর, নইলে তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎকে তোমরা নিজেরাই অন্ধকার করে তুলবে। কথাটা সব সময় মনে রেখ—আমি আর ক'দিন।

কেদার থামলেন। ডিবে থেকে গোটাদুই পান তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন এবং চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে সুরু করলেন, তোমাকে এত কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল যে, আজ আমার অথবা কল্যাণচন্দ্রের স্বার্থের চেয়ে তোমার নিজের স্বার্থ ঢের বড় হয়ে উঠেছে।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বলতে সুরু করলেন, তবে যুগধর্মের কথাটা যে বলছিলে ওটা সত্যিই অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু তাকেই বা হতভাগা মেনে চলেছে কোথায়? কে নিষেধ করেছে তাকে বড় বড় বক্তৃতা করতে? কিন্তু কাজের সময় তার উল্টো কাজটি করলে ত আমার বলবার কিছু থাকে না। আমিও এই কথাটা হাজার বার ওকে বোঝাতে চেয়েছি। ওরে বাপু, সংসারটাই হচ্ছে সবার সেরা রাজনীতি-ক্ষেত্র। শুধু ফাঁকা কথার প্যাঁচ লাগাও আর নিজের কাজটি হাসিল করে পাঁকাল মাছের মত পিছলে বেরিয়ে এস।

কেদার হস্তধৃত গড়গড়ার নলটি পুনরায় মুখে তুললেন, গোটা কয়েক জোরে জোরে টান দিয়ে হাঁক দিলেন, ওরে কে আছিস, কলকেটা পালটে দিয়ে যা।

ভৃত্য কলকেটি পালটে দিয়ে যেতেই তিনি পুনরায় গোটাকয়েক টান দিয়ে একরাশ ধূম উদ্গীরণ করে পুনশ্চ বলতে সুরু করলেন,

কিন্তু আমার কল্যোণ ধরলেন ভিন্ন পথ। তেমনি আমিও কেদার মুন্সী· · · · একেবারে চতুর্দ্দিক থেকে বেঁধে রাখার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে তবে ক্ষান্ত হয়েছি, বুঝলে মা চন্দ্রা। তাই বলে একেবারে চুপ করে থাকলেও আমাদের চলবে না, তার নোটিশ একটু আগেই তোমার কাছ থেকে পেয়ে গেছি। আমায় সতর্ক করে দিয়ে তুমি খুবই ভাল করেছ। তবে এখানেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেব না। ওর ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করে তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎটি মাটি করে দিও না যেন। বুড়োর এ আর্জ্জিটা তোমার কাছে পেশ করা রইল মা চন্দ্রা।

কেদার মুন্সীর এতগুলি সদুপদেশের কোন জবাবই আর চন্দ্রা দিল না। তার বিবাহিত জীবনের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সে তার স্বামীকে জানবার বহু সুযোগ যেমন পেয়েছে, শ্বশুর সম্বন্ধেও তেমনি নানা তথ্য তার জানা আছে। এ-বাড়ীতে পদার্পণ করেই তার কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে, শ্বশুরকে তার ভয় ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে একটা সম্মানজনক ব্যবধান রেখেই চলতে হবে। তাই সে কোনদিন একান্ত কাছে এগিয়ে যেতে পারে নি। কিন্তু স্বামীকে যে তার শ্রদ্ধা করতে হবে, কিংবা ভয় করতে হবে এ-কথাটা মুহূর্ত্তের জন্যও তার মনে দেখা দেয় নি। ভিতরের তাগিদে সমর্পণের মধ্যেই প্রাপ্তির আনন্দ তাকে মাতাল করে রেখেছে। চোখ তার নেশায় জড়ান। সে চোখে চন্দ্রা শুধু একটি বস্তুই দেখতে পায়। পরিপূর্ণ বিশ্বাস। তাই শ্বশুরের কথায় নিজের জন্য ত নয়ই, তার ভবিষ্যৎ-সন্তানের জন্যও একবিন্দু দুশ্চিন্তা তার মনে ঠাঁই পেল না। কিন্তু এটা তার মনের কথা। মুখে কিন্তু সে উল্টা সুরে কথা কয়ে উঠল, আপনার উপদেশ আমার সব সময় মনে থাকবে বাবা।

কেদার মুন্সী খুশী হয়ে উঠলেন। সস্নেহে বললেন, আমায় তুমি নিশ্চিন্ত করলে মা।

কিন্তু ভগবান বোধ হয় কেদার মুন্সীকে নিশ্চিন্ত থাকতে

দেবেন না। নইলে এই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করে চন্দ্রাকে ইহধাম ত্যাগ করতে হবে কেন?

কেদার মুন্সী থমকে দাঁড়ালেন। আবার নতুন পথে তাঁকে চিন্তা সুরু করতে হবে। কিন্তু কল্যাণ স্ত্রীর মৃত্যুতে একবার মাত্র ফিরে তাকালেন। দীর্ঘ দু'টি বছর সাহচর্য্য দিয়ে, সেবা ও ভালবাসা দিয়ে যে মেয়েটি তাঁর জীবনের একটা মস্তবড় অভাবকে পূর্ণ করে রেখেছিল তাকে আর কোনদিন কাছে পাবেন না। ছোট একটি নিঃশ্বাস সন্তর্পণে চেপে গেলেন তিনি, কিন্তু মুখে একটি শোকবাক্যও উচ্চারণ করলেন না। শুধু ভিতরের জ্বালা তাঁকে আরও বেশী কর্ম্মব্যস্ত করে তুলল। মনের মধ্যে একটা নতুন চিন্তার আলোড়ন উঠল। সে আলোড়নে তাঁর কল্পনা পেল নতুন রূপ। যে রূপ দর্শনে কেদার মুন্সী প্রমাদ গুণলেন। পুত্রকে ডেকে সংসার সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। কল্যাণ নতমস্তকে তাঁর যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু তাঁর চলার পথের কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

দিন চলে যায়। কেদার অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন। কল্যাণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। চতুর্দ্দিকে জনরব—তিনি নাকি গ্রামের মধ্যে হাই স্কুল আর প্রসূতি হাসপাতাল গড়ে তুলবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। সরকারের কাছ থেকে মোটা টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে সুরু করেছেন। নায়েব-গোমস্তারা প্রতিদিনই অভিযোগ জানিয়ে যাচ্ছে কেদার মুন্সীর কাছে। যারা স্কুল এবং হাসপাতাল গড়ে তোলায় সাহায্য দেবে, গ্রামের উন্নতি করতে ব্যয় করবে কল্যাণ তাদের উসুল রসিদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আগুনে ঘি পড়ল, কেদার মুন্সী জ্বলে উঠলেন। তাতে শুকনো কাঠ জোগাল আমলা-কর্ম্মচারিরা। কিন্তু অন্তরের এই প্রচণ্ড দাবানল চেপে রেখে তিনি বাইরে অবিশ্বাস্য রকম শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করলেন। পুত্রকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, প্রায়

দু'বছর হ'ল চন্দ্রা মা চলে গেছেন। মানুষ চিরদিন বেঁচে থাকে না কল্যাণ।

কল্যাণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমাকে কি করতে বলেন বাবা?

অত্যন্ত স্পষ্ট কথা, তথাপি কেদার ঘোরা পথের আশ্রয় নিলেন। বললেন, এটা তোমার কেমন কথা হ'ল কল্যাণ?

কল্যাণ নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিলেন, আপনার নতুন কোন আদেশ আছে কিনা তাই জানতে চাইছি বাবা।

কেদার ধীর কণ্ঠে বললেন, সংসারে যখন একবার মাথা গলিয়েছ তখন তার সুখ-দুঃখ কোনটা থেকেই রেহাই পাবে না। তাই বলে দুঃখের কাছে হার মানতে হবে কেন? দুঃখটাকে ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াও। আমি তোমার আবার বিয়ে দিতে চাই

কল্যাণ একটু হাসলেন। একবার পিতার মুখের পানে চোখ তুলে তাকিয়ে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে বাবা?

কেদার মুন্সী ধমক দিলেন, তোমার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে।

কল্যাণ মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, সে প্রয়োজন ত আপনার মিটে গেছে বাবা। আপনার পৌত্র—

তাঁকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে কেদার পুনরায় বললেন, এক পৌত্র পৌত্রই নয়।

কল্যাণ পুনশ্চ একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, কিন্তু আমাদের বংশের ইতিহাস অন্য কথা বলে বাবা। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমার দ্বারা আপনার এ আদেশ পালন করা সম্ভব হবে না।

কেদার মুন্সীর এতক্ষণে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি তিক্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, তা হলে কি সম্ভব হবে শুনি? মহলে মহলে

সফর করে বাপের বিরুদ্ধে প্রজা-ক্ষেপান বুঝি? আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি কল্যাণ—

কল্যাণ পিতার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আপনি নিশ্চয় ভুল শুনেছেন।

কেদার সহসা নিজেকে সংযত করে নিলেন। অপেক্ষাকৃত ধীর কণ্ঠে বললেন, তা হলে খাজনাপত্তর আদায় হচ্ছে না কেন শুনি? প্রজারা আমার নায়েব-গোমস্তাদের অপমান করে বিদায় করে দেবার দুঃসাহস পায় কোথা থেকে?

কল্যাণ নিরুত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, ওটা আপনার নায়েব-গোমস্তারাই তাদের শিখিয়েছে। আপনি অন্যায় রাগ না করে একটু ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখলেই আমার কথাটা বুঝবেন বাবা।

কেদার মুন্সী উষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, ধৃষ্টতার একটা সীমা থাকা উচিত কল্যাণ। আমার নায়েব-গোমস্তারা বহুদিনের পুরানো এবং বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, এ কথাটা ভুলে যেও না।

কিন্তু তারা আপনার ছেলের চেয়ে আপন হতে পারে না, কল্যাণ বললেন।

পুত্রের এই শান্ত প্রতিবাদে কেদার মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। তারপরে দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, অবস্থাদৃষ্টে তাই আমার মনে হয়। তুমি স্থির জেনো যে, আগুনে হাত ঠেকালে অবুঝও অব্যাহতি পায় না।

কল্যাণ মৃদুকণ্ঠে বললেন, সকলের বেলাই কথাটা প্রযোজ্য অপরাধ নেবেন না, একটা কথা বলছি দিন বদলে যাচ্ছে। নিজেদের কথা অল্পবিস্তর সকলেই আজকাল ভাবতে সুরু করেছে।

কেদার অসহিষ্ণু কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, তোমার কাছে আমাকে পাঠ নিতে হবে, না? দিন বদলে যাচ্ছে বদলে বদলে সব যে রসাতলে যাচ্ছে সেটুকু বুঝবার ক্ষমতাও তোমাদের নেই। তোমরা সব এগিয়ে যাচ্ছ বক্তৃতায়—কাজে নয়। কিন্তু জীবনটা নিছক বক্তৃতা নয় হে কল্যাণ মুন্সী।

এত বড় অনুযোগেও কল্যাণ থামতে পারলেন না। মৃদু সংযত কণ্ঠে জবাব দিলেন, কোন কথাই যদি আপনি না শুনতে চান তবে আমি আর কি করতে পারি। শুধু আমলা-কর্ম্মচারীর চোখ দিয়েই সব দেখতে চান—আপনার প্রজাদের মধ্যে কোনদিন গিয়ে দাঁড়ালেন না। তাদের কথা শুনলেন না—তাদের সুখ-দুঃখের অংশ নিলেন না……

কেদার ধমক দিলেন, ওসব সস্তা বক্তৃতা আমি ঢের শুনেছি, তোমার কাছ থেকে নতুন করে না শুনলেও আমার চলবে। মোদ্দা আমার পয়সায় তোমার পরোপকার করবার ইচ্ছেটা ত্যাগ করতে হবে। মুখে বড় বড় কথা বলতে পার, আর না বলে পরের পয়সা আত্মসাৎ করতে তোমাদের সুরুচি আর সুনীতিতে বাধে না?

কল্যাণ আহত কণ্ঠে বললেন, আত্মসাৎ কোন পয়সাই কেউ করে নি, তবে আপনার হয়ে আমি ওদের কিছুটা অভাব মোচন করবার চেষ্টা করেছি। সে অধিকারটুকু আপনার পুত্র হয়েও যদি আমার না থাকে তা হলে স্পষ্ট আমাকে জানিয়ে দেবেন। আমি আর আপনার কোন ব্যাপারেই থাকব না।

কেদার মুন্সী পুনরায় উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, কথাটা তোমাকে বহুবার জানান হয়েছে, কিন্তু তোমার পরোপকার প্রবৃত্তিটা এতই উগ্র যে, অধমের কথাটা কানেই পৌঁছায় নি।

কল্যাণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার বুঝবার ভুল হয়েছিল বাবা, আমাকে ক্ষমা করবেন। বলেই কেদার মুন্সীকে আর দ্বিতীয় কথার অবকাশ না দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। তখনকার মত চলে গেলেও এইখানেই যে সবকিছুর শেষ হয়ে গেল না একথাটাও তিনি ভাল করে বুঝে গেলেন।

কল্যাণের এইভাবে নিঃশব্দে চলে যাওয়াটা কেদার মুন্সীর খুব ভাল ঠেকল না। তিনি বহুক্ষণ যাবৎ ঘরময় পায়চারী করে একসময় ভৃত্যকে আহ্বান করে নায়েব মশাইকে তলব করবার

কথা জানালেন এবং তিনি উপস্থিত হতেই তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের খোকাবাবু ত আমাকেই আপনাদের অভিযোগের তদন্ত করবার কথা জানিয়ে গেলেন।

নায়েব মশাই কথাটা লুফে নিয়ে বিনীত হেসে বললেন, এর চেয়ে আর ভাল কথা কি হতে পারে? আপনি নিজেই তা হলে সত্যি-মিথ্যার

কথা শেষ না করে তিনি অন্য প্রসঙ্গে এলেন, তবে আমি বলছিলাম কি যে, যা হবার তা হয়েই যখন গেছে তখন ও নিয়ে আর জল ঘোলা করে কি হবে। যতই অন্যায় করুন না কেন তিনি আপনার ছেলে, তা ছাড়া যখন তাঁরই প্রজাদের মঙ্গলের জন্য —মানে আসল কথাটা হচ্ছে স্ত্রীবিয়োগের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠবার জন্যই তিনি একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আপনার সবই যখন একসময় তাঁর হবে তখন এ নিয়ে—

এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে নায়েব মশাইয়ের কথাগুলি শুনছিলেন, কিন্তু এই শেষ কথাটায় সহসা কেদার জ্বলে উঠলেন, আপনাকেও দেখছি বক্তৃতায় পেয়েছে নায়েব মশাই।

নায়েব মশাই অধিকতর বিনয়ে একেবারে অবনত হয়ে পড়লেন, বললেন, আজ্ঞে এটা আপনি কি বলছেন? আপনার কাছে বক্তৃতা দেব আমি! প্রশ্নটা দাদাবাবুকে নিয়ে, তাই এত কথা বলবার সাহস পাচ্ছি। তিনি অন্যায় অবশ্যই করেছেন, আপনার অনুমতি আর আশীর্ব্বাদ নিয়ে এ-কাজে নামলেই ভাল করতেন।

কেদার মুন্সী এ কথার কোন জবাব দিলেন না।

নায়েব মশাই একবার আড়চোখে তাঁর মুখভাব লক্ষ্য করে পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বললেন, আপনাকেও আমরা জানি, আর দাদাবাবুর সদিচ্ছা সম্বন্ধেও আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

হুঁ · সদিচ্ছা সদিচ্ছাই বটে! কেদার মুন্সী বললেন, আপনিও দেখছি রাতারাতি সুর পালটে ফেলেছেন। সদিচ্ছা থাকা খুবই ভাল কথা, কিন্তু তা মনে মনে। আয়-ব্যয়ের হিসেব না রেখে

যারা কাজে নামে তারা কাজের চেয়ে অকাজই বেশী করে। স্কুল, হাসপাতাল মানে শুধু দু'খানা বাড়ী নয়, কথাটা আপনি কল্যাণ-চন্দ্রকে বুঝিয়ে দেবেন। আর ··

কেদার মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্ততঃ কবে পুনরায় বললেন, আর কালই সর্ব্বত্র ঢোল দিয়ে জানিয়ে দেবেন যে, আমাব নিজের শীলমোহর রসিদে না থাকলে সে রসিদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কথাটা আমার আমলা-কর্ম্মচারী সকলেই স্মরণ রাখবেন।

নায়েব মশাইয়েব চোখেমুখে যেন খানিকটা চিন্তাব ভাব ফুটে উঠল, তিনি সসঙ্কোচে বললেন, আজ্ঞে এতটা কি ভাল হবে? এতে সকলেই ক্ষুণ্ণ হবে—

কেদাব মুন্সীব মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল, তিনি নীরস কণ্ঠে বললেন, হিতোপদেশ অনেক শুনেছি, নতুন করে আর কি শোনাবেন। কেদাব মুন্সীব চুল এমনি সাদা হয় নি, কথাটা সব সময় আপনারা মনে রাখলে আমি খুশী হব।

কিছু বলবাব জন্য নায়েব মশাই মুখ তুলতেই কেদার গর্জ্জন করে উঠলেন, কেদাব মুন্সী হুকুম দু'বাব দেয় না—আপনি এখন যেতে পারেন।

নায়েবমশাই আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে মন্থর পদে প্রস্থান করলেন। আর কেদাব চিন্তান্বিত গম্ভীর মুখে আপন শয়নকক্ষে পায়চাবি করতে লাগলেন। তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না যে, তিনি এই হুকুমজারী করে নিজেকেও কত বড় প্রতারণা করলেন।

এই ঘটনাব ঠিক দু'দিন পরে।

তখনও সন্ধ্যা হয় নি, কেদার তার দু'বছরেব নাতির সঙ্গে বসে দাবা খেলছেন—খেলা মানে খেলার অভিনয় করা। কল্যাণ নিঃশব্দে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। কোনপ্রকার ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলেন, ঢোল দিয়ে যে হুকুমজারী কবা হয়েছে, তা কি আপনাব ইচ্ছায় হয়েছে বাবা?

যেন কিছুই হয় নি এমনি সহজ ভাবে কেদার জবাব দিলেন, কথাটা কি তোমার বিশ্বাস হয় নি কল্যাণ? তিনি পুনরায় খেলায় মন দিলেন।

কল্যাণ একটু হাসল। মনে মনে একটা কিছু সিদ্ধান্ত করে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু এসব কথা থাক, আমি আজই এখান থেকে চলে যাব। অতনুও আমার সঙ্গে যাবে।

কেদার সহসা চমকে উঠলেন। তাঁর হাতের ধাক্কায় মন্ত্রীটা কাত হয়ে পড়ল। অতনুও তার দাদুর ভাবান্তরে ভয় পেয়ে কিছু না বুঝে কেদারকে জড়িয়ে ধরে ডাকল, দাদু আমার মন্ত্রী—

কেদার সামলে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। নাতিকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় কল্যাণকে বললেন, তোমার সিদ্ধান্তটা কি একেবারে পাকা? এর অন্যথা হবার নয়?

কল্যাণ মাথা নেড়ে জানালেন, আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি।

কেদার পুনরায় সতেজে বললেন, তুমি কি আমায় ভয় দেখাতে চাইছ?

কল্যাণ একটু হাসলেন, কোন জবাব দিলেন না।

কেদার খানিকক্ষণ পুত্রের ভাবলেশহীন মুখের পানে চেয়ে দেখে ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, অতি উত্তম কথা কল্যাণবাবু, কিন্তু যেতে হয় তুমি একলা যেতে পার। অতনুকে তুমি পাবে না।

কল্যাণ তেমনি শান্তভাবে বলল, অতনু আমার ছেলে—

কেদার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বল—থামলে কেন? বল, অতনু যখন তোমার ছেলে তখন জোর করেই তাকে তুমি নিয়ে যেতে পার। তাই নিও হে কল্যাণচন্দ্র, আদালত করে তোমার ছেলেকে নিয়ে যেও—তার আগে নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার এতক্ষণে নেমে এসেছে। কল্যাণ একবার খোলা জানালা-পথে বাইরে দৃষ্টি ফেরালেন। একবার একটু ইতস্ততঃ করলেন। একবার চোখ বুজে আপন অন্তরে ডুব দিলেন।

একবার ছু'পা এগিয়ে গেলেন, আবার পিছিয়ে এলেন। ছেলেটা কি ভেবে দাছুর গলা ছু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। কল্যাণ আর ফিরে তাকালেন না। নিঃশব্দে নতমুখে ঘর থেকে বাইরে এবং সেখান থেকে রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

অতনুকে প্রাণপণে বুকের মধ্যে চেপে ধরে কেদার বিহ্বল দৃষ্টিতে পুত্রের গমন পথের পানে চেয়ে রইলেন, এবং সর্ব্বপ্রথম অনুভব করলেন যে, এতটা রূঢ় না হলেই বোধ হয় তিনি ভাল করতেন।

৬

কল্যাণ চলে যাবার পর পাঁচটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আরও বহু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেদার মুন্সীর চরিত্রেও একটা লক্ষ্যণীয় ওলটপালট হয়েছে। নায়েব গোমস্তা কারুর উপরই তাঁর আস্থা নেই, অথচ নিজেও চতুর্দ্দিকে নজর রাখতে পারেন না। শুধু মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠতে গিয়ে নির্দ্দোষ লোকের উপর অত্যাচার করেন। বিচারের নামে চলে প্রহসন। অতনু তার দাছুর প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ভালমন্দ সবকিছুর সঙ্গেই। এই একটি স্থানে কেদার শিশুর চেয়েও ছুর্ব্বল।

মাঝে মাঝে পুত্রের কথা মনে পড়ে। একটা অব্যক্ত বেদনায় ভিতরটা তাঁর মোচড় দিয়ে ওঠে। মুখে কোন প্রকাশ নেই বটে, কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারে তিনি অবিশ্বাস্য রকম রুক্ষ হয়ে ওঠেন। শিশু অতনুর উপর নতুন করে সুরু হয় পরীক্ষা। ওর মধ্যের কোমল বৃত্তিগুলিকে অঙ্কুরেই তিনি বিনষ্ট করে দিতে চান।

কেদার ভিন্নমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। অতনুর সম্মুখেই তিনি নায়েব থেকে সুরু করে ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীদের ডেকে ডেকে তিরস্কার করেন তাদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য। তারা প্রথম প্রথম আতঙ্কিত হলেও ইদানীং তাদের গা-সহা হয়ে গেছে। কেদার

মুন্সীর এই কাঠিন্যের অন্তরালে যে আর একটি অসহায় ক্ষতবিক্ষত আত্মা প্রতিনিয়ত কেঁদে কেঁদে ফিরছে এ-কথাটা আব তাদেব কাছে গোপন নেই—তাই মুখ বন্ধ করে তারা ভবিষ্যতেব পানে দৃষ্টি দেয়। প্রজারা জমিদাবের পায়ে এসে কেঁদে পড়ে। কেদার পা টেনে নিয়ে বেত হাতে ধরেন। বিচারের নাম করে শাস্তিবিধান কবেন। দশ বছরেব নাতিকে বলেন, কেমন বিচাব করেছি দেখেছিস দাহু? ভাল করে শিখে রাখ, নইলে সব লাটে উঠে যাবে ভাই। বেটাদের থাকলেও কাঁদে, না থাকলেও কাঁদে। শয়তান—এক নম্বরেব শয়তান ওবা।

অতনু নিতান্তই ছেলেমানুষ, অত বোঝে না। প্রশ্ন করে, ওদের বুঝি টাকা নেই দাহু?

কেদাব মাথা নেড়ে জবাব দেন, কথাটা ঠিক হ'ল না দাহুভাই। ওবা সব সময়েই নেই বলে, শক্তের ওরা ভক্ত। কিন্তু এসব কথা এখন থাক, তাব চেয়ে চল হু'বাজি খেলা যাক। হতভাগাবা আমাদেব অনেকখানি সময় নষ্ট কবে দিয়ে গেল দাহু।

খেলতে বসেও কিন্তু খেলাটা ঠিক জমছিল না। তাঁব চোখেব সম্মুখে বাবে বাবেই বেত্রাহত অসহায় লোকটির করুণ মুখখানি ভেসে উঠছিল। আর অতনু চুপ কবে হিসেব করে দেখছিল যে এত মারধোর কবে দাহুর তহবিলে ক'টা পয়সা এল।

কেদার বললেন, খেলাটা তেমন জমছে না ভাই—

অতনু জবাব দিল, তোমাব যে খেলায় মোটেই মন নেই দাহু—

কেদাব বললেন, বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম।

অতনু বলল, তা হলে খেলা এখন থাক। আমার আবার মাষ্টারমশাই আসবেন একটু পরেই।

কেদাব হেসে বললেন, তা হলে তুলে রাখ ভাই। তোমার আসবেন মাষ্টাব—আমি হচ্ছি অন্যমনস্ক। কিন্তু জানিস অনুভাই, তোর দাহু এমনি আগে ছিল না। একটা দুষ্টু লোক তার মাথাটা

খারাপ করে দিয়েছে—মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দিয়েছে। সোজা হয়ে কিছু কি আর করবার উপায় আছে, সঙ্গে সঙ্গেই টনটন করে ওঠে, দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হয় ভাই।

কেদারের চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে অতনু ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, কে সে দুষ্ট লোকটা, তুমি আমাকে একবার দেখিয়ে দাও ত দাদু, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব—

কেদার অতনুকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যান কিছুক্ষণের জন্য। তাঁর বিগত দিনের একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে মনোমুকুরে। কল্যাণ তখন মাত্র বার বছরের বালক। সদ্য-মাতৃহারা বালককে এমনি করেই বুকে জড়িয়ে ধরে নির্ব্বাক হয়ে বসেছিলেন কেদার মুন্সী। তারপর কতদিন, কত মাস, কত বছর অতীত হয়ে গেছে। বালক হ'ল কিশোর, কিশোর হ'ল যুবা। তিনি শিক্ষা দিলেন—দিলেন সংসার। কল্যাণকে ঘিরে কত তাঁর কল্পনা। আজ ভেঙেচুরে সব একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? এই প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি নিজেই কি বড় কম বিস্মিত হন। নিজের মনটাকেও কি তিনি চিনতে পেরেছিলেন? নইলে এত বড় একটা কুৎসিত নির্ম্মম বিচ্ছেদ কেমন করে ঘটতে পারল পিতাপুত্রের মধ্যে?

অতনু কেদার মুন্সীর অন্যমনস্ক মুখের পানে খানিক অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করল, তুমি কি ভাবছ দাদু? সেই দুষ্টু লোকটার কথা? আমাকে একবার দেখিয়ে দাও ত—

কেদার একটি নিঃশ্বাস মোচন করে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, শাস্তি দিতে পারবি সেই দুষ্টু লোকটাকে দাদুভাই?

অতনু জবাব দিল, একবার বলেই দেখ না তুমি—

কেদার মুখখানা খুব গম্ভীর করে বলেন, সে দুষ্টু লোকটা আর কেউ না ভাই, তোমার এই দাদুটি। এবারে দাও কি শাস্তি দেবে।

কিন্তু তাঁর এমনি মনোভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, বরং মনের

এই আলোড়ন ভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের কোমল রেখাগুলি কর্কশ হয়ে ওঠে। রুদ্ধ রোষে তাঁর অন্তর ফুলে ফুলে ওঠে।

ভয় পেয়ে অতনু বিহ্বল কণ্ঠে ডাকে, দাদু, তুমি অমন করছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

কেদার অল্পেই সামলে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে জবাব দেন, কিছু নয় ভাই—ও কিছু নয়। তার পরে কতকটা আত্মগত ভাবেই বলতে থাকেন, তোর দাদুর অনেক দুঃখ ভাই! কেউ তা জানে না--কেউ তা বোঝে না।

অতনু এতক্ষণে কিছুটা সহজ হয়ে উঠেছে। উৎসাহিত কণ্ঠে সে বলল, আমি বড় হয়ে তোমার কোন দুঃখ রাখব না দাদু। তুমি যেমন করে দুষ্টু লোকগুলোকে গাছে বেঁধে চাবুক লাগাও, আমিও ঠিক তেমনি করে সেই দুষ্টু লোকগুলোকে শাস্তি দেব—যারা তোমাকে দুঃখ দেয়।

কেদার মুন্সীর বুক ভরে ওঠে। তর্ক বিচার করে তিনি দেখতে চান না। ওতে আজ আর মন ভরে ওঠে না। এতখানি বয়স হ'ল তাঁর—দেখেছেনও বহু, হিসেব করে চলেও দেখেছেন, কিন্তু পেলেন তাতে কতখানি। যোগ করবার নির্ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করে এসে আজ যখন লাভ-লোকসানের হিসেব করতে বসেছেন তখন বারে বারেই তাঁর মন বলছে যে, তিনি একেবারেই দেউলিয়া হয়ে গেছেন।

অতনু পুনরায় কথা কয়ে উঠল, আবার ভাবছ কেন দাদু—

কেদার চমকে ওঠেন। বড় অসাবধান হয়ে পড়ছেন আজকাল তিনি। ঐ একরত্তি ছেলেটাকেও আব ফাঁকি দিতে পারছেন না।

একটু হেসে অতনুব পিঠেব উপব একখানি হাত রেখে মৃদু-কণ্ঠে বললেন, ভাবছিলাম আমার দাদুভাই আমাকে কত ভালবাসে সেই কথা। কিন্তু কি জানিস ভাই, তোর বয়সে সবাই অমন বলে। তারপরে সময়মত ভুলে যায়।

অতনু জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, আমি ভুলব না, তুমি দেখে নিও দাদু।

কিন্তু দেখে নেবার পরিপূর্ণ সুযোগ পাবার আগেই তাঁকে ইহধাম ত্যাগ করতে হ'ল। অতনুর বয়স তখন কুড়ি বছর। অতনু দু'হাতে বারকয়েক তার চোখ রগড়ে আশেপাশে তাকাল। সে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করল তার দাদুর উপদেশগুলি। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং আমলা-কর্ম্মচারীদের মর্ম্মভেদী হাহাকারের অন্তরালে সে অন্য কিছুর সন্ধান পেল। অতনু সতর্ক হয়ে উঠল। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি বিস্ময়কর ভাবে সজাগ হয়ে উঠেছে। তার মন তাকে জানিয়ে দিল যে, সে একা। যথার্থ দরদ দিয়ে তার কথা ভেবে সহযোগিতার হাত কেউ বাড়িয়ে দিতে আসবে না। তার দাদুকেও শেষ জীবনে বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। অতনু দেখছে তার চতুর্দ্দিকে রয়েছে সূক্ষ্ম জাল বিছান। শেষের দিকে দাদু কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি একটা কথা বলতেন, দুনিয়াটা দেখছি দিন দিনই বদলে যাচ্ছে দাদুভাই। তাই ত মলাট-সৌন্দর্য্যের এত কদর। ভিতরের সব পচাগলা। দুর্গন্ধ ছড়ায়।

অতনু হেসে বলত, বুড়ো বয়সে তোমাকে এ আবার কি রোগে ধরল দাদু?

কেদার বলতেন, রোগ নয় ভাই--সত্যদর্শন। কিন্তু বড় দেরীতে ঘটেছে, সামলান যাবে না।

অতনু বিস্মিত হয়, দাদুর মুখে নতুন কথা শুনে।

কেদার হেসে বলতেন, যেমন কাজ করেছি তার ফলভোগ করতেই হবে। এই পুরুষেই হোক কিংবা দু'পুরুষ পরেই হোক। তবে তোমাকে ঘাবড়াতে হবে না ভাই, শুধু একটু হিসেব করে চলো।

এই ঘটনার পর থেকেই কেদার মুন্সীর চালচলন কথাবার্ত্তা কেমন রহস্যাবৃত হয়ে উঠল এবং এই রহস্যের যবনিকাপাত ঘটল

তাঁর মৃত্যুর মাস তিনেক পরে—কেদার মুন্সীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক বলে জলধর বিশ্বাস যখন আইনসঙ্গত ঘোষণা করলেন।

আশেপাশের সকলেই বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে পড়ল। আর অতনুকে বহু উপদেশ দিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। শুধু দু'চারজন অতি হিতৈষী তখনও ঠিক অবস্থাটা বিশ্বাস করে উঠতে পারল না। তাই অতনুকে তালিম দিয়ে নতুন কোন রহস্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়ে উঠল। অতনু তাদের মহাজনদের পথে চলতে নির্দ্দেশ দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। ছোঁড়াটা এই বয়সেই বুড়োকেও টেক্কা দিয়েছে —তারা বলাবলি করে।

অতনু তার নিজের অবস্থাটা ধীরভাবে চিন্তা করে দেখতে চায়। চতুর্দ্দিকের এই কলগুঞ্জনের মধ্যে নিজের চিন্তার সূত্রকে হারিয়ে ফেলতে সে চায় না। একটা পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্ভাবনা ধীরে ধীরে তার মাথার উপর চেপে বসেছে। পায়ের তলার মাটিও যেন সরে গেছে। অথচ দুনিয়ার কাউকে সে এই মুহূর্ত্তে বিশ্বাস করতে না পারলেও তার ঠাকুরদাকে সে অবিশ্বাস করতে পারবে না। তাই থেকে থেকে তার একটা কথাই আজ মনে চচ্ছে, কিসের জন্য দাদু তাকে হিসেব করে চলবার কথাটা উপদেশের ছলে বলে গেছেন। কিন্তু হিসেব করবে সে কি নিয়ে, তার সন্ধান তিনি দেন নি।

অতনু ভাবছিল—আর মাত্র একটি সপ্তাহ তার হাতে আছে। তারপরে চিরদিনের জন্য তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, হয়ত নগণ্য একটা ভিখারীর মত। অতনু ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক ছবি এঁকে নিয়েছে তার মনে। তার জীবনের বিগত দিনগুলি ঠাকুরদার কাছ থেকে পাঠ নিতেই কেটে গেছে, কিন্তু তার ভিতরের পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে যে এমন একটি অধ্যায় এসে দেখা দিতে পারে তার কোন আভাসই সে পূর্ব্বে পায় নি। শুধু আরাম-বিলাস এবং স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনে অভ্যস্ত অতনু, তাই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু ভেঙে পড়ল না। তাকে বাঁচতে হবে এবং তা মানুষের মত। ঠাকুরদার শিক্ষা তাকে শুধু

একটা পথের সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। আজকের এই কলুষিত পৃথিবীতে বাঁচতে হলে যে মূলমন্ত্রের আবশ্যক সেটাও তাকে সযত্নে কণ্ঠস্থ করিয়ে গেছেন। এতদিন যেটা ছিল নিছক কাল্পনিক আজ সেটা বাস্তব রূপ নিয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে অতনু। পায়ের তলায় এই সর্ব্বপ্রথম অনুভব করল একটি কঠিন বস্তু। জীবনের প্রারম্ভের প্রথম সোপান, কঠিন, নির্ম্মম আর পিচ্ছিল।

অতনু সাবধানে পা বাড়াল—সবখানি একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত করে। মাটি তার পায়ের তলা থেকে সরে গিয়ে তাকে যে বস্তুর উপর এনে দাঁড় করিয়েছে তা যতই কঠিন আর পিচ্ছিল হোক না কেন শেষ পর্য্যন্ত অতনুকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয় নি, বরং তার পায়ের চাপে সেখানে আবির্ভাব ঘটল দানব আলাদিনের। তার পরের কথা না বললেও চলে, তার বিস্ময়কর উপস্থিতি অতনুর ভবিষ্যৎটাকে আরও বিস্ময়কর ভাবে ওলটপালট করে দিয়ে গেল।

অতনু নিজেই কি কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছিল যে, সম্পুর্ণ নিঃসহায় অবস্থায় রাতের অন্ধকারে যে যুবক একদিন গ্রাম ত্যাগ করে শহরের এই বিরাট জনসমুদ্রের মাঝে একলা এসে দাঁড়িয়েছিল সেই যুবকই একদিন এত বিপুল অর্থের অধিকারী হতে পারবে? সম্মান আর প্রতিপত্তি এমন সহজে তার করায়ত্তে আসবে? অধ্যবসায় আর ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তিই অতনুকে এখানে নিয়ে এসেছে। অবশ্য শুধুমাত্র অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিকতাই একমাত্র কারণ বলা হলে ভুল করা হবে। বরং এই কথা বললেই উচিত হবে যে, তার দানবীয় হৃদয়হীনতা, অর্থের প্রতি সুগভীর ভালবাসাই ছিল তার সাধনার প্রধান উপকরণ। সিদ্ধিলাভও তাই সহজ পথে ঘটেনি।

কতকটা অনন্যোপায় হয়ে এবং কতকটা ঝোঁকের বশে সেদিনে শহরে চলে এসে সর্ব্বপ্রথমেই অতনুর মনে হ'ল তাদের এটর্নীর কথা। ঠাকুরদার কথাগুলি নিরর্থক হতে পারে না। তাদের অত

বড় জমিদারী বিশ্বাসদের হাতে এমনি চলে যায় নি। একথা কেউ বলে না দিলেও অতনু অনুমান করে নিয়েছে এবং তার অনুমান যে মিথ্যে নয় এটর্নীর কাছে সে খবরও সে পেল। যে টাকা ঠাকুরদা তার জন্য গচ্ছিত রেখেছেন তার অঙ্কটা অত্যন্ত লোভনীয় হলেও সর্ত্তগুলি তা নয়। সহস্র রকমের বিধিনিষেধ জট পাকিয়ে রেখেছে।

অতনু রাগ করে প্রস্থানোদ্যত হতেই বৃদ্ধ এটর্নী নলিনীবাবু তাকে ডেকে বসিয়ে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন, তুমি রাগ বা দুঃখিত হয়ো না বাবাজী। আমাদেব অনেক বয়স হয়েছে, আমি বলছি, কেদার কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি। তিনি তোমার যেমন ঠাকুরদা আমার তেমনি বাল্যবন্ধু। তোমাব মঙ্গলের জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতনুর কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলল, আমার ভালোর জন্যই আমাকে অবিশ্বাস করা হয়েছে—চমৎকার যুক্তি আপনার।

নলিনীবাবু হাসিমুখে বললেন, তোমার এ প্রশ্নের জবাব কেদারই দিতে পারতেন। আমি আজ্ঞাবহ মাত্র। তবে এই কাজ করেই এতখানি বয়স হয়েছে অতনুবাবু, তাই বলছিলাম ব্যবস্থাটা তিনি বুদ্ধিমানেব মতই করে গেছেন।

অতনু উচ্চকণ্ঠে জবাব দিল, আজ্ঞাবহ না বলে বলুন আপনার বুদ্ধিতেই এই ব্যবস্থা হয়েছে।

নলিনীবাবু এ অভিযোগ হাসিমুখে উপেক্ষা করে শান্তকণ্ঠে বললেন, তুমি বড্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছ অতনুবাবু।

অতনু জবাব দিল, হলেই বা করবার আছে কি?

নলিনীবাবু তেমনি সহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, তুমি রাগ করে কথাটা বুঝতে চাইছ না, কিন্তু একদিন সব বুঝবে।

অতনুর মুখে খানিকটা বাঁকা হাসি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, কোন জবাব দিল না।

নলিনীবাবু খানিক তার মুখের পানে চেয়ে থেকে একসময়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, মনে হচ্ছে জলধর বিশ্বাসের নোটিশ পেয়ে আর দেরী কর নি।

অতনু সায় দিল।

এখন আছ কোথায়? নলিনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

অতনু ইতিমধ্যেই আত্মসম্বরণ করতে সক্ষম হয়েছে। শান্তকণ্ঠে সে জবাব দিল, একটা সস্তা বোর্ডিং হাউসে।

নলিনীবাবু বললেন, ওটা কাজের কথা নয়। কেদার মুন্সীর নাতি তুমি। কথাটা তুমি ভুললেও আমরা ভুলতে পারি না। এ ব্যবস্থাটা আমার ফার্ম্মকেই করতে দিও অতনুবাবু। দিনকতক আর অন্য কোন চিন্তা নয়, একেবারে বিশ্রাম। আর চিন্তা যদি করতেই হয় তবে ভাবতে চেষ্টা কর যে, তোমার ঠাকুরদা আজও বেঁচে আছেন।

একটু থেমে তিনি পুনশ্চ বলতে সুরু করলেন, তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ, এই বয়সেই মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার উপর এতগুলি নগদ টাকা। না অতনুবাবু, কেদার মোটেই ভুল করেন নি—একবিন্দু অন্যায় করেন নি। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমার সত্যিকার প্রয়োজনের দিনে বিমুখ হবে না।

অতনু উঠে দাঁড়াল। মৃদুকণ্ঠে বলল, আপনার কথা আমার সর্ব্বদা মনে থাকবে। তবে আপনিও ভুলে যাবেন না যে, ঠাকুরদার কাছেই আমার যা কিছু শিক্ষা—

নলিনীবাবু বললেন, কথাটা ঠিক, কিন্তু তোমার ঠাকুরদা তাঁর শেষ বয়সে মত বদলেছিলেন। যে শিক্ষা তিনি তোমায় দিয়েছিলেন তার উপর তাঁর নিজেরই কোন আস্থা ছিল না অতনু।

অতনু একটু হাসবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল, আপনার একথার মানে?

নলিনীবাবু বললেন, অত্যন্ত সোজা। নিজের উপর বিশ্বাস হারালে যা হয় ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু এগুলি তুচ্ছ কারণ।

আমি আবার বলছি, তুমি মাথা খারাপ করো না। বরং ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে তোমার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করে ফেল। ঠাকুরদা কি করে গেছেন তাব চুলচেরা হিসেব করতে না বসে তুমি কি করতে পার তাই আমাকে জানিও।

অতনু বলল, আপনাকে জানিয়ে লাভ ?

নলিনীবাবু হেসে বললেন, লোকসান যে নেই এ কথাটা ত স্বীকার কর অতনুবাবু ? ভাল কথা—তোমাব সঙ্গে আমার একজন লোক গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে আসবে। তোমারও যেমন আমাকে দরকার আমাবও তেমনি তোমাকে দরকাব।

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলল, তাব কোন দবকার হবে না, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

নলিনীবাবু হেসে বললেন, তোমার পা এখনও শক্তি অর্জ্জন করে নি অতনুবাবু, তোমার সাহায্যেব দবকার। আজ তা হলে তুমি এসো।

৭

এর পবে আর বাদানুবাদ কবা চলে না। অতনুকে চলে আসতে হ'ল। কিন্তু নলিনীবাবু মুখে তাকে যতই ভরসা দিক না কেন তার খুব বেশী মূল্য অতনু দিল না। উইলখানি সে আগাগোড়া পড়েছে। বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়েছে। তবে এইটুকুই আশার কথা যে, তাকে আজই ভিক্ষাপাত্র হাতে করে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। তার বর্ত্তমানেব প্রয়োজন নলিনীবাবুই মেটাবেন। কিন্তু বসে খেলে তার অংশের টাকাটা কতদিন চলতে পারে। কথাটা আজ তাকে ভাবতে হচ্ছে। কারণ শিশুকাল থেকে যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে তার প্রভাব থেকে এককথায় মুক্ত হতে পারা সহজ নয়। ভবিষ্যতে পারবে বলেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অতীতকে মন থেকে

মুছে ফেলতে পারছে না বলেই আগামী দিনের জন্য সে এত ব্যগ্রভাবে চিন্তা করতে সুরু করেছে। নিজের ভবিষ্যৎকে সে নিজেই গড়ে তুলবে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, ঠাকুরদার ব্যবস্থায় সেখানেও নলিনীবাবু এসে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা এবং যুক্তিই সেখানে প্রবল। অর্থাৎ তার নিজের টাকাও অগাধ জলে।

অতনুর ইচ্ছা হচ্ছিল লোকটিকে উচিতমত শিক্ষা দিয়ে আসে। কিন্তু মনের এই সদিচ্ছাটা সে বাইরে প্রকাশ করল না। হাসিমুখেই নলিনীবাবুর ওখান থেকে চলে এল। ঠাকুরদা প্রায়ই বলতেন, বিদ্রোহ করবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিলেও যে লোক আত্মসম্বরণ করতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে সে হেরে গেছে মনে হলেও আসলে সেই লোকই শেষ পর্য্যন্ত জিতে যায়। অথচ তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল এই বস্তুটির একান্ত অভাব। দাদু বলতেন, সেইজন্যেই তিনি নাকি উপদেশ দিতে ভরসা পাচ্ছেন।

অতনু হেসে বলত, এটা কেমন কথা হ'ল দাদুভাই ?

কেদার বলতেন, এটা নিছক কথা নয় ভাই। এ আমার অভিজ্ঞতা। নিজের জীবনে ঠেকে ঠেকে আর ঠকে ঠকে যে শিক্ষা পেলাম সে পথের বিপদ কোথায় তা যদি সময় থাকতে তোকে না জানিয়ে যাই তবে যে নিজের কাছেও আর কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারব না দাদু। উপদেশটা দাদু অনেক বিলম্বে দিলেও এর প্রয়োজনীয়তায় অতনুর প্রচণ্ড বিশ্বাস।

কিন্তু নলিনীবাবু সম্বন্ধে অতনু মনে মনে বিরূপ হলেও এই পরিবারের উপর তাঁর সত্যিই একটা আন্তরিক ভালবাসা ছিল। যে ভালবাসা নিম্নগামী নয়। কথাটা সামান্য কয়েকটা বছরের ব্যবধানেই অতনু বুঝতে পারল। নইলে তার ভাগ্যগগনে আবার নতুন করে সূর্য্যোদয় ঘটত না।

নলিনীবাবুর সদিচ্ছা আর আন্তরিকতার পুরো সুযোগ অতনু গ্রহণ করল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি। সময়মত নলিনীবাবু হলেন মুক্তহস্ত। আর অতনু ফেঁপে ফুলে উঠতে লাগল অবিশ্বাস্য

ভাবে। অর্থাগমের অলিগলির সন্ধান পেয়ে অতনু দানবীয় শক্তিতে এগিয়ে চলল। বেয়াল্লিশের মন্বন্তরে লাখ লাখ মৃতের অস্থিপঞ্জরের উপর গড়ে উঠল তার ধনভাণ্ডারের আকাশচুম্বী পিরামিড।

যুদ্ধ থেমে গেল, কিন্তু অতনু থামতে পারল না। শুধু চলার গতি ভিন্ন পথ নিল। অন্ধকার থেকে সে আত্মপ্রকাশ করল আলোর জগতে। জমিদাব কেদার মুন্সীর নাতি হ'ল শিল্পপতি। আলো আর অন্ধকারেব মধ্যে একটা চমৎকার সামঞ্জস্য রেখে সে জেঁকে বসল। অভিজ্ঞতা আর দুঃসাহস তার অফুরন্ত। সেই সঙ্গে কাজ করে চলল তার নির্ভুল হিসাব-পদ্ধতি।

অতনু অবাক্ হয়ে গেল। হবার কথাও। আলোর জগতে চলাটা যে কত সোজা কথাটা অন্ধকার জগতে থাকতে সে কল্পনাও করতে পারে নি। তাব ভয়-ভাবনা ঘুচে গেল। এ জগতে যা কিছু তা সকলের চোখেব সম্মুখেই ঘটে থাকে। খেলার আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়। পাওয়া যায় সম্মান, পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠা। অথচ কালির দাগ গায় লাগে না। শুধু সব সময় চোখ মেলে চলতে জানলেই চুকে গেল। জীবনের এই নব-পর্য্যায়ে অতনু নতুন খেলায় মেতে উঠল। সাধাবণ চোখে দেখতে গেলে সে অনেক কিছু খুইয়েছে কিন্তু অতনু বলে, ওটা দুর্ব্বলের খেদোক্তি। যার কোন অর্থ হয় না। তার মতে ওটা হ'ল জীবনধারণের একটা প্রধান অঙ্গ। প্রয়োজনীয়ও বটে। সুতরাং প্রয়োজন মেটাবার নামকে যদি কোন দুষ্ট লোক অন্যায় আর খারাপ বলে অভিহিত করতে চায় করুক তাতে প্রয়োজনের মূল্য হ্রাস পায় না। তবে হ্যাঁ, সবকিছুর মধ্যে একটা রাজসিক ঝোঁক থাকা চাই, নইলে সৌন্দর্য্য আর রুচিবোধে আঘাত লাগতে পারে।

অতনু জানে আজকের দিনের ব্যবসার নবপদ্ধতি। জানতে তাকে হয়েছে, নইলে তার স্বপ্ন সফল হয় না। আঁকা, বাঁকা, সরু আর অন্ধকার কোন পথই তার অজানা নয়। মহাজনেরা এই

পথেই আনাগোনা করে থাকেন। অতনু সন্ধান পেয়ে তাদের দলভুক্ত হয়েছে মাত্র।

সেই অতনুর আজ কোন দিক থেকে কোন অভাব নেই। অর্থ, প্রতিষ্ঠা, সুনাম, দুর্নাম কোনটাই তাকে আজ আর বিচলিত করতে পারে না। অথচ সেই কিনা শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করল শ্রীমতীকে।

বন্য মেয়ে শ্রীমতী তাকে মুগ্ধ করেছিল সত্য, কিন্তু এমন কত মেয়েই ত তার জীবনপথে এসেছে, চলে গিয়েছে। কিন্তু তারা কোনদিন তার দেহকে ছাড়িয়ে মনের মধ্যে প্রবেশ কবতে পারে নি। তাদের যা কিছু উত্তাপ তা জ্বলে উঠবার পূর্ব্বেই গলে জল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শ্রীমতীর মধ্যে সে সর্ব্বপ্রথম খুঁজে পেল এর ব্যতিক্রম। অতনু তাব মনেব কথাটা ডাক্তাবকে জানালেন। এর পরে অতনুব নিজেব ইচ্ছে বলে কিছু ছিল না। তিনি কাছে না এলেও দূবে বসে অতনুকে দিয়ে সব কাজ কবিয়ে নিলেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে অতনুব ইচ্ছেটাও প্রবল ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেও এমনি বহু ব্যাপারে সে এই প্রৌঢ় ডাক্তারটিকে যেন কতকটা বেশী সম্মান দেখিয়ে ফেলেছে। অবজ্ঞা করা কিংবা পাশ কাটিয়ে চলার কথাটা কোনদিন ভুলেও তার মনে উদয় হয় নি। বরং একটা অজ্ঞাত দুর্ব্বলতা যেন বারে বারেই তার উদ্দাম প্রকৃতিকে রাশ টেনে ধরেছে। অতনু চেষ্টা করেও তাঁব প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পুর্ণ মুক্ত রাখতে পাবে নি। অতনু নিজেকে এ নিয়ে বহু প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে বিস্মিত হয়েছে নিজেকে আবিষ্কার করে। তাব অতৃপ্ত মন এই ডাক্তারটির অনুশাসনের মধ্যে কি যেন খুঁজে পেয়ে বেশ খানিকটা খুশীই হয়েছে বলে মনে হয়। তাই ডাক্তারের কথাগুলি বারে বারে উচ্চারণ করে। অপরকে শোনাবার ছলে নিজেও নতুন করে শোনে। তাই ত শ্রীমতীব মুখে ডাক্তারেব কথার প্রতিধ্বনি শুনে অতনুর চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। উপেক্ষাভরে সব কিছু উড়িয়ে দিতে

গিয়েও বাইরের মহলকে অবহেলা করে ভিতর মহলে স্ত্রীর পিছু পিছু এসে উপস্থিত হ'ল।

ঘরে পা দিয়ে শ্রীমতীই প্রথমে কথা বলল, আমি তোমাকে বুঝতে চাই নি, তোমার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম।

ওটা একই কথা হ'ল শ্রী। অতনু বলল, যে কথাটা মুখ থেকে বেরোয় সেইটেই মানুষের কানে যায়। মানুষ মূল্য দেয় শুধু সেইটুকুরই।

শ্রীমতী হেসে উত্তর করল, আর তাদের ব্যবহার এবং চালচলন পড়ে চোখে। অনুভব করা যায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, তাই নয় কি?

অতনু বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর মুখের পানে তাকাল। এই মেয়েটিকে সে যতটা সহজ এবং সাধারণ মনে করেছিল সে যে তা নয় কথাটা তার চালচলন এবং কথাবার্ত্তায় ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে এ মেয়ে যে খালি স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারিণী হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে বুদ্ধির চর্চ্চাও যে রীতিমত করেছে তা অতনুকে স্বীকার করতেই হবে।

অতনুর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, কিছু ভুল বলেছি নাকি?

অতনু সামলে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, আমার মনেও ঐ একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শ্রীমতী।

শ্রীমতী হেসে উঠল, ভারী আশ্চর্য্য ত! আমাদের চিন্তা করবার পথটাও যে এক হয়ে যাচ্ছে।

অতনু সহসা অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, বলল, তুমি লেখাপড়া কতদূর পর্য্যন্ত করেছ শ্রীমতী?

শ্রীমতী হেসে ফেলে জবাব দিল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

অতনু বলল, একটা কৌতূহল মাত্র—

শ্রীমতী রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে বলল, কৌতূহল থাকা ভাল। মিটে গেলেই সব ফুরিয়ে যায়। তাছাড়া বিয়ের আগে যে কথাটা জানতে চাও নি—

কথাটা শেষ না করেই শ্রীমতী পুনরায় হেসে উঠল।

অতনু অকারণে খানিকটা অপ্রস্তুত হ'ল। সে বলল, তুমি কি কোন কথাই সোজাভাবে বলতে পাব না শ্রী?

শ্রীমতীর চোখ দুটো কৌতুকে নেচে উঠল। সে বলল, না, পারি না। কিন্তু সোজা নিশানা করে তীব ছুড়তে পারি।

অতনু বলল, তা পার—নইলে সেদিনে বুনো শূয়োরেব হাতেই প্রাণটা যেত।

শ্রীমতী পবিহাস তরল কণ্ঠে বলল, তাই তোমার উচিত ছিল। তা হলে এই অপকর্ম্মটি তোমাকে কবতে হ'ত না, আব আমিও জবাবদিহির হাত থেকে রেহাই পেতাম।

অতনু বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে বইল। শ্রীমতীব রহস্য করবার ধবনটা মৌলিক।

শ্রীমতী পুনবায় বলল, কিন্তু দু'জনে মিলেই যখন কাজটা কবে ফেলেছি তখন আব ভেবে কি করবে? তাছাড়া—কথার মাঝেই শ্রীমতীকে থামতে হ'ল ভৃত্যেব উপস্থিতিতে।

—হুজুর

অতনু অকারণে ভৃত্যেব উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। কি খবব? ডানকান আর আগরওয়ালা এসেছে, এই ত?

—জি হুজুর।

—তাদেব বলে দাও, বাবুর তবিয়ৎ ভাল নেই। আজ আর দেখা কবা সম্ভব হবে না। অতনু বলল।

ভৃত্য চলে যেতেই শ্রীমতী জিজ্ঞেস করল, শবীরটা কি সত্যিই তোমার ভাল নেই?

অতনু সজীব কণ্ঠে বলল, শরীব ভাল থাকবে না কেন? ওদের সঙ্গে দেখা কবতে চাই না আজ।

শ্রীমতী বলল, কিন্তু সেকথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলে না কেন?

অতনু একথার কোন জবাব দিল না।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, তোমার এই সাহেব ছুটি রোজের অতিথি বুঝি ?

ঠিক এমনি এক প্রশ্নের সম্মুখীন হবার জন্য অতনু প্রস্তুত না থাকলেও সে সহজ ভাবেই জবাব দিল, কতকটা তাই।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, অতিথি নারায়ণ। ফেরাতে নেই। ওকে ডাক।

অতনু স্থির দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বলল, ডাকতে হয় ডাক, কিন্তু অতিথি সৎকারের ভার তা হলে তোমাকেই নিতে হবে। ডানকান সাহেব হয়ত এক গ্লাস মদ পেলেই খুশী হবে, কিন্তু আগরওয়ালা সাহেবের শুধু মদে মন ওঠে না। চালচলনে তিনি সাবেক দিনের জমিদারদের অনুকরণ করতে পছন্দ করেন—

অতনু আর একবার হেসে উঠল।

শ্রীমতী উষ্ণ হয়ে উঠল, থাম। আমি তোমার স্ত্রী, কথাটা সব সময় স্মরণ রেখ।

বিলক্ষণ—অতনু জবাব দিল, কথাটা মনে আছে বলেই ত ওদের ফিরিয়ে দিলাম। অতনু হো হো করে হেসে উঠল।

শ্রীমতী বিস্মিত হ'ল তার কথা এবং হাসির রকম দেখে।

অতনু সহসা হাসি থামিয়ে বলল, অবাক্ হয়ে গেছ মনে হচ্ছে ? নিয়মের এতবড় ব্যতিক্রম দেখে আমার ভৃত্যটিও কম বিস্মিত হয় নি। কিন্তু আমাদের ডাক্তারটি শুনলে বলবেন, এটা ব্যতিক্রম নয়। স্বাভাবিক পরিণতি।

একটু থেমে সে পুনরায় বলল, আমার অতীতের দিনগুলি এদেরই মত আরও বহুর সঙ্গে কাটাতে হয়েছে। উপায় ছিল না আমার। ডুবে গিয়ে ভেসে ওঠার কৌশল আয়ত্ত করতে এদেরই সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে।

শ্রীমতী শান্তকণ্ঠে বলল, সে প্রয়োজন ত অনেক পূর্ব্বেই মিটে যাওয়া উচিত ছিল।

অতনুর ঠোঁটের প্রান্তে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল, সে বার-

কয়েক মাথা নেড়ে বলল, প্রয়োজনের কোন শেষ নেই শ্রীমতী। কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে, ডাক্তার কি কথাগুলি আমার অজ্ঞাতে তোমায় শিখিয়ে দিয়ে গেছেন ?

শ্রীমতী বিস্মিত হয়ে বলল, অর্থাৎ—

নইলে—অতনু বলল, তার কথাগুলি তোমার মুখে হুবহু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কেমন করে ?

শ্রীমতী গভীর কণ্ঠে জবাব দিল, তিনিও হয়ত সত্যিই তোমার মঙ্গল চান—

অতনু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, ঠিক জানিনে শ্রীমতী, তবে তাঁর এই গায়েপড়া উপদেশ আমার সব সময় ভাল লাগে না।

শ্রীমতী অর্থপূর্ণ কণ্ঠে বলল, তোমার কথাটা আমার মনে থাকবে—

উত্তরটা গায়ে না মেখে অতনু বলল, মনে রাখাই ত উচিত। যাঁরা উপদেশ দিতে আসেন তাঁদের বোঝা উচিত যে, প্রয়োজনের কোন সীমা নেই। অন্ততঃ সব মানুষের প্রয়োজনবোধ একই ধরনের হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, তোমার ডাক্তারটিকে কথাটা খোলাখুলি জানিয়ে দাও না কেন ?

অতনু বলল, দিয়েছি। একবার নয়, বহুবার, কিন্তু ফল হয় নি। তিনি জবাব দেন না।

শ্রীমতী বলল, তবে যে শুনি তুমি খুব কড়া মনিব। কিন্তু আমার কাছে তুমি জবাব পাবে। প্রয়োজন হলে খুব শক্ত জবাব দিতেও আমি জানি।

অতনু একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। শান্ত ভাবে বলল, তারও দরকার আছে শ্রীমতী, প্রয়োজনবোধেই মানুষের মনের রং বদলায়—তার বাইরের রূপের পরিবর্তন ঘটে। যে মুখে মানুষ হাসে সেই মুখেই সে ইতর-কথা বলে। কিন্তু আমাদের ডাক্তার-বাবুকে এই ধরনের বিচারবিশ্লেষণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অদ্ভুত, খাপছাড়া মানুষ। ওঁর একমুখ দাড়ি আর রঙিন চশমায় মনের কোন প্রতিবিম্বই পড়ে না।

কিন্তু তাঁর ব্যবহারে? শ্রীমতী প্রশ্ন করল।

অতনু বলল, বড্ড বেশী মূল্য দিতে চাইছ তুমি শ্রীমতী।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, আমি হয়ত দিতে চাইছি, কিন্তু তুমি যে দিয়ে বসে আছ। যোগ্য লোককে উপযুক্ত সম্মান দেওয়ায় লজ্জার কিছু নেই।

অতনু একটু হেসে বলল, তবুও তাঁকে আজও চোখে দেখ নি, শুধু কানে শুনেছ।

শ্রীমতী বলল, আমি তোমার মুখ থেকে শুনেছি, আর কারুর কাছ থেকে নয়।

কথাটা শেষ করে অতনুকে অন্য কথা বলার অবকাশ না দিয়ে পুনরায় বলল, সত্যি, ভারী দেখতে ইচ্ছে করে ডাক্তারবাবুকে।

অতনু বলল, ডাক্তার এখানে নেই। আগামী সপ্তাহে আসবেন। এলেই ডেকে পাঠিও। ভালই লাগবে তোমার, নিরহঙ্কারী সাদাসিধে লোক।

শ্রীমতী হেসে বলল, একটু আগেই কিন্তু অন্য কথা বলছিলে। রঙিন চশমা, একমুখ দাড়ি—অথচ সমালোচনা করতে বসে সেই আমার কথায় ফিরে এলে।

অতনুও এ হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, তোমার কথাও ঠিক, আমার কথাও মিথ্যে নয়।

শ্রীমতী বলল, বুঝলাম না।

অতনু একটু ঘুরিয়ে জবাব দিল, তুমি আয়নায় মুখ দেখ শ্রীমতী?

শ্রীমতী মুহূর্তে অনেক কথা ভেবে নিল। কিছু না বোঝার ভান করে বলল, এ আবার একটা কথা হ'ল নাকি?

অতনু রহস্য করে বলল, তা হলে বোধ হয় চোখে ভাল দেখতে পাও না তুমি।

শ্রীমতী খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, এটা কিন্তু সত্য কথা বললে না। এক তীরে যে দুটো প্রাণী বধ করতে পারে তাকে আর যা বল অন্ধ ব'ল না।

এবারে অতনুর বিস্মিত হবার পালা। সে বলল, অর্থাৎ ?

শ্রীমতী বলল, তোমার স্মরণশক্তিকে প্রশংসা করা চলে না। এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে ?

ভুলব কেন ? অতনু জবাব দিল, তোমার তীরের আঘাতে দাঁতালটাই মরেছিল জানি, আর কোন প্রাণীর কথা ত মনে পড়ছে না শ্রীমতী।

শ্রীমতী এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে স্বামীব মুখের পানে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়েছিল। সেই দিকে চোখ পড়তেই অতনু সজাগ হয়ে উঠল। হেসে উঠে শ্রীমতীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, একবিন্দু মিথ্যে বলিনি তোমায়। একটা হত হলেও অপরটা হয়েছিল আহত। তাই সে ফিরে দাঁড়িয়ে শিকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সহসা কানের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে আবেগভরে শ্রীমতীকে বেষ্টন করে ধরল সে।

শ্রীমতী অনায়াসে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে একটু হেসে বলল, যে শিকাবী সে কিন্তু সব সময় সজাগ থাকে।

অতনু তরল কণ্ঠে বলল, আহত জন্তু সবসময়ই একটু বেপরোয়া হয়ে থাকে।

অসাবধান হলেই মৃত্যু—শ্রীমতী বলল।

অতনু হেসে বলল, মৃত্যুর হাত থেকে ত তুমি বাঁচতে পার নি শ্রী।

শ্রীমতী বলল, ওকে মৃত্যু বলে না—বলে রূপান্তব। শ্রীমতীর কুমারী-জীবন শেষ হয়ে সংসারে প্রবেশ। কিন্তু—

পুনরায় অতনুর ভৃত্য এসে উপস্থিত হ'ল। জানাল, সাহেবদের জরুরী দরকার, একবার না গেলেই নয়।

অতনুকে উঠতে হ'ল।

শ্রীমতীর চোখের সম্মুখে নেমে এল অন্ধকার। এবং সেই অন্ধকারে বিদ্যুতের মত চমকে উঠল তার একজোড়া চোখ। ডানকান, আগরওয়ালাকে উপেক্ষা করবার শক্তি অতনুর নেই—আর তার নেই সেই অতনুকে ধরে রাখবার ক্ষমতা। নিজের এই অক্ষমতার লজ্জায় সে ম্লান হয়ে গেল।

কেষ্ট কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'ল। কোনপ্রকার ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলল, আপনি যেতে দিলেন কেন বৌদিবাণী—কাজটা ভাল করেন নি।

দিলাম —কতকটা উপেক্ষাভরেই সে জবাব দিল।

শ্রীমতীর জবাব দেবার ধরনটা কেষ্টর কাছে নতুন লাগল। এর পরে কি বলা উচিত বুঝে উঠতে না পেরে সে অকারণে খানিকটা হেসে পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করল, এমন করলে ত চলবে না—আরও অনেক বেশী শক্ত হতে হবে যে বৌদিরাণী।

শ্রীমতী পুনরায় হাসল কিন্তু জবাব দিল না।

৮

মনে পড়ল সূর্য্যদার কথা। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। তার অতীত জীবনের যে অংশটা একটা অকল্পিত পরিবেশ আর বিচিত্র সমারোহের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ সূর্য্যদা তার সম্মুখে এসে পড়ায় এই সর্ব্বপ্রথম সে ঘুম থেকে জেগে উঠল। আশ্চর্য্য। কি নিয়ে সে এমন বিভোর হয়ে আছে যে, কোন দিকে তার নজর নেই। এই যে তার বিয়ের পরে একদিনের জন্য সূর্য্যদা খোঁজ-খবর করে নি, এ কথাটা কি একবারও সে ভেবে দেখেছে?

ক'দিন ধরেই শ্রীমতীর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে তার দেহ ও মন ভেঙ্গে পড়েছে। অতনুকে

কথাটা সে জানায় নি। অকারণে বড় বেশী হৈ চৈ করে। শ্রীমতীর ভাল লাগে না। বড় বেশী কৃত্রিম মনে হয় এদের ব্যবহার।

শ্রীমতী চুপ করে বসে আছে। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখাটা সর্ব্বোচ্চ বেগে ঘুরছে। বেগ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীমতী শেষ পয়েন্টে ঘুরিয়ে দিয়ে এসেছে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন কবে বেখেছে। অস্থিব বোধ করছে শ্রীমতী। শবীরটা থেকে থেকে পাক খায়। কিছুদিন ধরেই একটা অস্বস্তিকর অবস্থাব মধ্যে দিন কাটছে তার। সময় নেই অসময় নেই।

এমনি ভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে তা শ্রীমতীর খেয়াল নেই। কতগুলি বিক্ষিপ্ত চিন্তা তাকে চতুর্দ্দিক থেকে ঘিরে ধরেছে। এ চিন্তাব মধ্যে খানিক আনন্দ, খানিক উৎকণ্ঠা হয়ত বা কিছুটা ভয়ও ছিল।

কিছুক্ষণ হ'ল অতনু ফিবে এসেছে। এমন নিঃশব্দে এসে সে ঘরে প্রবেশ করেছে যে, শ্রীমতী জানতেই পারে নি। অতনু ডাকল, শ্রী—শ্রীমতী—

শ্রীমতী চোখ তুলে তাকাল।

অতনু উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, তোমার মাথা ধরেছে নাকি? চোখ দুটো খুব লাল মনে হচ্ছে।

শ্রীমতী মনে মনে খুশী হ'ল। বলল, সামান্য—ও কিছু না। তুমি বস। একটু থেমে পুনবায় বলল, তোমার আগরওয়ালা আর ডানকান এরই মধ্যে চলে গেল? শ্রীমতী তাব শারীরিক গ্লানির কথাটা চাপা দিতে চায়।

অতনু কিন্তু তাব নিজের প্রশ্নে ফিবে এল, কিন্তু চোখ দুটো তোমার সামান্য লাল হয় নি শ্রী। আমি ডাক্তারবাবুকে ফোন করে দিচ্ছি।

শ্রীমতী বাধা দিয়ে হেসে বলল, এত সামান্যকে এমন বড় করে তুল না। আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু আমার লাগে, অতনু জবাব দিল। শুধু লাগে বললে কম করে বলা হবে। বরং ঠিক এমনটি না করলেই অত্যন্ত বেমানান হবে।

শ্রীমতী ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, তোমার কাছে বেমানান হবে বলে এই রাত দুপুরে মিথ্যে ভদ্রলোককে কষ্ট দেবে?

অতনু বলল, কষ্ট দেবার প্রশ্ন এখানে আসে না। তাকে আমি মাইনে দিয়ে রেখেছি, অসময়ে ডাকার জন্য আলাদা ফী দেওয়া হয়। তাছাড়া রাত দুপুর তুমি কাকে বলছ। একবার হাতঘড়িটার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে পুনরায় হেসে বলল, মাত্র দশটা। এই ত সবে সন্ধ্যা হ'ল শ্রীমতী।

শ্রীমতীর কথা বলতেও কেমন আলস্য লাগছিল। অতনুর কথার নতুন করে আর সে জবাব দিল না। তার চেয়ে ডাক্তারবাবু আসুন। এতদিন শুধু নামই শুনে আসছে, আজ চোখের দেখাটাও হয়ে যাক। তার এই শারীরিক গ্লানির একটা কারণ সে মনে মনে আঁচ করেছে, সেই জন্যেই বারে বারে সে বাধা দিয়েছে।

পাশের ঘর থেকে অতনুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, না না এমন কিছু না। তা হলেও আপনাকে একবার আমার দরকার আছে। আজ সকালেই এসেছেন আমি শুনেছি। বিয়ের পরে একদিনের জন্যেও আপনাকে আসতে হয় নি। কি বলছেন? ডাক্তারের প্রয়োজন যত কম হয় ততই মঙ্গল? বেহিসাবী কথা হ'ল এটা। ডাক্তার হয়ে একথা বলা ঠিক হচ্ছে না। এলেই আপনার টাকা। নইলে ত সেই গোনাগুনতি। আপনি অবিশ্যি আসবেন।

অতনু পুনরায় শ্রীমতীর ঘরে ফিরে এল। হেসে বলল, খরচ করবার জন্যই টাকা। তুমি মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবে আর আমি বাইরে বসে টাকার হিসেব নেব—এ হয় না। ভাল কথা, ডাক্তারকে অবস্থাটা ভেঙে বলে একটা প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে নিয়ে কেষ্টকে দিয়ে ওষুধটা আনিয়ে নিও।

শ্রীমতী সহসা মুখ তুলে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, কেন তুমি। তুমি থাকছ না? আবার কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

অতনু একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তোমাকে এখনও বলা হয় নি। একটা বড়রকমের লেন দেন হবে আজ রাত্রে তাই ডানকান, আগরওয়ালার সঙ্গে আমাকে এখুনি বেরুতে হচ্ছে।

নিজের কণ্ঠস্বরে অতনু নিজেই চমকে উঠল। সে কি কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করল নিজের কাজের! আর তা শ্রীমতীকে—সামান্য কয়েক মাস পূর্ব্বে যে মেয়েটিকে সে কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে গৃহে নিয়ে এসেছে! আশ্চর্য্য! তার বিগত জীবনে এ বস্তুটি কোনদিনই আবশ্যকীয় বলে মনে হয় নি।

অতনুর চিন্তা রেখাঙ্কিত মুখের পানে খানিক পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে সহসা শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, যখন মোটা টাকার লেন-দেন তখন অবশ্যই যেতে হবে। কিন্তু কথাটা যখন তোমার জানা, তখন ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাবার কি দরকার ছিল। তুমি বরং তাঁকে আসতে নিষেধ করে আবার ফোন করে দাও।

অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কথা ক'টি বলা হলেও তার মধ্যে যে অনেকখানি দৃঢ়তা রয়েছে এ কথা অতনু অনায়াসে বুঝে নিল। এবং সে নিজেও যে দুর্ব্বল নয় সহসা এই কথাটা শ্রীমতীকে বুঝিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠল। অতনু ধীর-শান্ত কণ্ঠে বলল, ডাক্তার আমার জন্যে ডেকে পাঠাই নি। আর বাইরেও তুমি যাচ্ছ না। কথাটা আমার মনে আছে। তাছাড়া এবাড়ীর প্রত্যেকটি প্রাণী আজ পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছাকেই নিঃশব্দে মেনে এসেছে। এইটেই এ বাড়ীর রেওয়াজ। তুমি এ বাড়ীর গৃহিণী—অবশ্যই তোমার একটা আলাদা মর্য্যাদা আছে। তা বলে সে মর্য্যাদাবোধ যদি বাড়ীর কর্ত্তাকে ছাপিয়ে উঠতে চেষ্টা করে তা হলে তুমি বাধা পাবে। কথাটা তোমার জেনে রাখা ভাল। তাতে ভবিষ্যতে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারব।

কথা ক'টি যেভাবেই বলা হোক তার মধ্যে যে কতখানি রূঢ় কর্ত্তৃত্বের সুর লুকান আছে তা শ্রীমতীর অগোচর রইল না। কিন্তু কেন এ অভিযোগ—কেন এই মুহূর্ত্তে অতনুর কথা ক'টি বলবার

প্রয়োজন হ'ল তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। শ্রীমতীর মনের ভাব বাইরে প্রকাশ পেল না। যেন কিছুই হয় নি এমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে সে বলল, কথাটা আমার জানা ছিল না। না জেনে যদি তোমার সম্মানে আঘাত করে থাকি তার জন্যে আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত। ভবিষ্যতে সব সময় তোমার কথাটা মনে করে রাখব। কিন্তু তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে না ত? বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন—এতবড় মোটা টাকার লেন দেন যখন। তুমি যাও। ডাক্তারবাবু এলে তাঁর যাতে কোন অসম্মান না হয় সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকবে।

শ্রীমতীর কথা ক'টি খুব মনোযোগ দিয়েই অতনু শুনল। তার অন্তরাত্মা তাকে বারংবার সাবধান করে দিল এই মেয়েটির সঙ্গে আরও ঢের বেশী হিসেব করে চলবার জন্য। এ সহজ নয়—শক্ত। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ অথচ নিঃশব্দ।

অতনু চুপ করে রয়েছে দেখে শ্রীমতী পুনরায় একটু হেসে বলল, কথা কইছ না যে? বিশ্বাস হ'ল না বুঝি? যত বুনো আমায় তুমি ভাব ততটা ঠিক আমি নই। মানীলোকের মান রেখে কেমন করে চলতে হয় সে শিক্ষাটুকু অন্ততঃ পেয়েছি। তবে ডাক্তারবাবুকে অন্য কোন কারণে যদি ডেকে পাঠিয়ে থাক সে আলাদা কথা।

অতনু শ্রীমতীর শেষ কথা ক'টিতে আপন অজ্ঞাতে খানিকটা চমকে উঠল। আজ এই সর্ব্বপ্রথম শ্রীমতীর মুখে এই ধরনের কথা। ওর বক্তব্যটা সহজবোধ্য নয়। তার অতীত জীবনের অন্ধকার অধ্যায়গুলির উপর কেউ কি আলোকপাত করেছে? নইলে—আশ্চর্য্য ইতিপূর্ব্বে এক দিনের জন্যও অতনু নিজের চলাফেরা সম্বন্ধে ভেবে দেখা আবশ্যকবোধ করে নি। প্রয়োজনও ছিল না। আজই বা হঠাৎ এ সম্বন্ধে সে ভাবতে সুরু করেছে কেন? আর এই কেনর সমাধান খুঁজতে গিয়ে আজ নতুন করে তার অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল।

একটু হাসবার চেষ্টা করে অতনু বলল, কারণ ছাড়া কাজ

হয় না। ওর একটার সঙ্গে অবশ্যই আর একটার যোগ আছে। কিন্তু তা নিয়ে অঙ্ক কষতে বসলে এক রাত্রে শেষ হবে না। সে বরং আব একদিন দেখা যাবে।

শ্রীমতী বলল, বেশ যা হোক এই কথাটাই ত তোমাকে এতক্ষণ ধবে বলছিলাম। মিথ্যে তুমি এতটা সময় অযথা নষ্ট করে দিলে। তোমাব ডানকান আব আগরওয়ালা সাহেব নিশ্চয়ই তোমার ওপর অত্যন্ত চটে গেছেন।

শ্রীমতীর কথাগুলি রীতিমত বাঁকা—অর্থপূর্ণ। কিন্তু তাকে মূল্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে অতনু রাজী নয় বরং অবহেলায় অগ্রাহ্য কবে সে বুঝিযে দিতে চায যে, সোজা বাঁকাব কোন দাম তাব কাছে নেই। যে উদ্দেশ্য নিযেই কথাগুলি বলা হযে থাক তা নিবর্থক। অথচ মনে মনে সে এত কথা ভেবে নিলেও প্রকাশ্যে সহজ হয়ে উঠতে পাবল না। চেষ্টা কবে মুখে হাসি টেনে এনে তাকে বলতে হ'ল, তাদেব ইচ্ছে হলে যত খুশী বাগ কবতে পাবে তা নিয়ে আমার ব্যস্ত হবাব কোন কাবণ নেই। তবে রাগ আমাব নিজের উপব হওয়া উচিত কাবণ লাভ-লোকসান তাদের নয়। আমাব।

শ্রীমতী বলল, তবু এতদিনে সুবুদ্ধি হ'ল। আজ ক'মাস ধরেই নাকি কাজ কাববাবে অবহেলা কবছিলে। লোকে আমাকেই দোষাবোপ কবতে সুরু করেছিল কিনা।

অতনু কোন জবাব দিল না। শুধু আবও খানিক গম্ভীর হয়ে উঠল।

শ্রীমতী অতনুব মুখেব এই পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করে পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বলল, বিয়েব আগে বুঝি দিনরাত শুধু কাজ করতে?

অতনুর কাছে শ্রীমতী ক্রমশঃই যেন দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছে, এবং এই মুহূর্ত্তে নিঃশব্দে পাশ কাটিযে চলে গেলেই ভাল হয় এ কথাটা উপলব্ধি কবেও কিন্তু সে চুপ কবে থাকতে পারল না। গম্ভীব কণ্ঠে বলল, দিন বাত কেউ কাজ নিয়ে থাকতে পাবে না। পারা সম্ভবও নয়। কথাটা তোমাব বোঝা উচিত।

শ্রীমতী হেসে ফেলল, আশ্চর্য্য আমারও যে এইটেই প্রশ্ন। সত্যিই ত এ আবার কখনও সম্ভব হয় কেমন করে। মানুষ সব সময়ই মানুষ। কিন্তু তুমি অকারণে রাগ করে বসে আছ কেন? কথাটা আমার কানে এসেছে বলেই জিজ্ঞেস করেছি। নইলে এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা!

অতনু বলল, তবুও প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু তোমার আজ কি হয়েছে বল ত। এত বেশী কথা কইছ কেন?

শ্রীমতী বলল, একটাকে ভুলতে আর একটার দরকার হয়েছে।

অতনু পুনবায় চোখ তুলে তাকাল।

শ্রীমতী হেসে বলল, তুমি দেখছি কিছুতেই আমার মাথাধরার কথাটা ভুলতে দেবে না। চেষ্টা করে দেখছিলাম যে, ডাক্তারবাবু আসবার আগেই মাথা ধরা ভূতটাকে ভাগাতে পারি কিনা। আচ্ছা তুমি এবারে যেতে পার।

অতনু এতক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সে বলল, এতক্ষণ ধরে যত কথা তুমি বলে গেলে শ্রী তুমি হয়ত নিজেই জান না তার মধ্যে কত গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে।

শ্রীমতী হেসে উঠল। বলল, তা হলে আয়ত্ত করে নিয়েছি বল? ছিলাম গরীবের মেয়ে, ছিলাম বুনো। মনে আর মুখে কোন প্রভেদ ছিল না অথচ কত সহজে তোমাদের সমাজের সেরা বৈশিষ্ট্যটি আয়ত্ত করে নিয়েছি। এমন কি তোমাকেও তাক লাগিয়ে দিয়েছি। একবার অন্ততঃ সাধুবাদ দাও।

অতনু আর একবার হোঁচট খেল। প্রশ্ন করল, এ কথার মানে?

সহসা শ্রীমতী মাত্রাধিক গম্ভীর হয়ে উঠল, এ প্রশ্নের জবাব আমার চেয়ে তুমি ঢের বেশী ভাল করে দিতে পারবে।

অতনু বলল, তা হলে প্রশ্ন করতাম না শ্রীমতী।

শ্রীমতী জবাব দিল, সব কথা প্রশ্ন করে জানতে চেও না। বিচার করে সমাধান করে নিও।

অতনু অন্যমনস্ক ভাবে বলল, সেই চেষ্টাই এবার থেকে করব।

শ্রীমতীর মুখের ভাব সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, তুমি সত্যি বলছো?

তেমনি ছাড়া ছাড়া ভাবে অতনু উত্তর করল, অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তে আমার কথাটাকে অত্যন্ত বড় সত্য বলে ধরে নিতে পার। কিন্তু আর নয়। ডাক্তারবাবুও এখুনি এসে পড়বেন, ওদিকে ডানকান, আগরওয়ালাও অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

অতনু দ্রুতপদে প্রস্থান করল।

এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের বড় সত্যটা এখন তার কাছে একটা প্রকাণ্ড পরিহাস বলেই মনে হচ্ছে। শ্রীমতীর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখখানা পুনরায় ম্লান হয়ে গেল।

৯

কৃষ্ণচন্দ্র অতনুর বহুদিনের পুরাতন এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য। অতনুর গতিবিধি থেকে আরম্ভ করে বহু খবর তার জানা। লোকটি অতনুকে ভালবাসে। তার হিতাকাঙ্ক্ষী। আভাসে-ইঙ্গিতে সে অনেক কথাই শ্রীমতীকে জানাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভৃত্যের মুখ থেকে তার মুনিব সম্বন্ধে কোন কথা শুনতে সে চায় না। এটা খুব সম্মানজনক বলে তার মনে হয় নি। তাই অন্য উপায়ে সে তার কৌতূহল চরিতার্থ করে নিয়েছে। গল্পের ছলে জেনে নিয়েছে ডানকান আর আগরওয়ালার ইতিকথা, জেনেছে ওদের সঙ্গে অতনুর সম্পর্ক। তাই সে সতর্ক হয়ে উঠেছে। অতনুকে আয়ত্তে সে আনবেই। অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি সে রাখবে না। তাই সোজা পথকে সে সযত্নে পরিহার করেছে। অতনুর স্বভাবের যতটুকু পরিচয় সে পেয়েছে তাতে শ্রীমতীর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, জোর করে, ভয় দেখিয়ে কিংবা চোখের জল ফেলে এই শ্রেণীর মানুষকে স্ব-বশে আনা সম্ভব হবে না। তাই সে এই পথ বেছে নিয়েছে। প্রচ্ছন্ন

উপেক্ষার খাদ মিশিয়েছে সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যবহারের সঙ্গে। যাতে করে অবহেলায় উপেক্ষা করতে না পারে, অথবা সোজাসুজি জলে ওঠাও না সম্ভব হয়। নিজেকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার ন্যায়সঙ্গত অধিকাব থেকে এক পা সবে যেতেও সে রাজী নয়। বিবাহের পূর্ব্বে তার চিন্তা করবার পথ ছিল আলাদা। স্বপ্ন দেখেছে অনেক। সূর্য্যদার জনসেবার মধ্যে তা ছিল সীমাবদ্ধ। সেদিনের সে সব বিক্ষিপ্ত কল্পনা আজ আর তেমন কবে মনকে নাড়া দেয় না। তার চেয়ে ঢের বেশী বড় হয়ে উঠেছে তাব বর্ত্তমানের স্বপ্ন। যা আজ আর শুধুমাত্র স্বপ্ন নয়। পৃথিবীব মাটিতে তাব অঙ্কুর দেখা দিয়েছে, যে অঙ্কুবেব পূর্ণরূপ দেখতে মন তার বিভোব হয়ে যায়।

ক'মাস চুপ কবে থেকে হঠাৎ সূর্য্যদা জেগে উঠেছে। আজই তার একখানা চিঠি পেয়েছে শ্রীমতী। সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু তার চেয়েও সংক্ষেপে জানিয়ে দেবে শ্রীমতী তাব অক্ষমতাব কথা। এ ছাড়া আর উপায় কি। আশ্চর্য্য! মানুষেব চিন্তার সঙ্গে এমন একটা যোগাযোগ বড় একটা চোখে পড়ে না। সূর্য্যদাকে শ্রীমতী জানে। সে চুপ করে থাকবে না তাও সে বোঝে, কিন্তু তার চেয়েও ভাল করে বুঝতে আরম্ভ কবেছে তার বর্ত্তমান অবস্থাটা। যাব সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার নিজের সম্মান—তাব বাবাব সম্মান। যা কোন-কিছুব বিনিময়ে শ্রীমতী আজ আর খোয়াতে বাজী নয়।

শ্রীমতীব চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। ভারী জুতার আওয়াজ আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে এল একটি অপরিচিত কণ্ঠেব আহ্বান। ঘব অন্ধকাব কেন? বৌমা কি ঘরে নেই?

শ্রীমতী সসব্যস্তে আলো জ্বালিয়ে দোবেব কাছে এগিয়ে এসে মৃদুকণ্ঠে আহ্বান জানাল, আসুন ডাক্তারবাবু—

অতনু—অতনু বাবু গেল কোথায়? ঘবে প্রবেশ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, এতক্ষণ আপনার জন্যে অপেক্ষা

করে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। ডানকান সাহেব আর শেঠ আগরওয়ালা এই মাত্র ডেকে নিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবুকে একটু যেন চিন্তিত মনে হ'ল, কিন্তু সে ভাবটা সম্পূর্ণ গোপন করে তিনি অন্য প্রসঙ্গে এলেন, দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ। এমন কাজ-পাগলা লোক আমি জীবনে দেখি নি। কিন্তু ঐ দেখ যার জন্যে এত রাতে এখানে আসা সেই কথাটাই এখনও জানা হ'ল না। তোমাব নাকি শরীরটা কিছু দিন ধরে খুব খারাপ যাচ্ছে?

একটুখানি হেসে শ্রীমতী বলল, বাড়িয়ে বলেছেন আপনাকে। আসলে আমার কিছুই হয় নি।

প্রশান্ত কণ্ঠে ডাক্তারবাবু বললেন, তা বলে তোমার কথা শুনে আমি ত ফিরে যেতে পাবি না। আমাকে দেখেও যেতে হবে— বিধানও একটা দিতে হবে।

ডাক্তাববাবুর কথা বলাব ধবনে শ্রীমতী কৌতুক বোধ করছিল। সে হাসিমুখে বলল, তা আমাব কোন অসুখ করুক আর না করুক?

ডাক্তারবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। শ্রীমতী সে হাসির শব্দে আচমকা চমকে উঠল। তার বাবাও ঠিক এমনি করে হাসেন। এমনি কারণে অকাবণে।

ডাক্তারবাবু সহসা হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, ঠিক তাই মা, তুমি একটুও মিথ্যে বল নি। চাকরী বজায় রাখতে হলে এ সব করতে হয়।

ডাক্তারবাবুর সহজ, স্বাভাবিক এবং প্রাণপূর্ণ কথাবার্ত্তায় শ্রীমতীর সঙ্কোচের যদিও বা কিছু কাবণ ছিল আপন অজ্ঞাতে তা কখন যে দূর হয়ে গেছে তা সে নিজেও জানতে পারল না। নইলে কখনই সে এমন অসংকোচে বলে উঠতে পারত না, তাই বলে আপনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবেন?

ডাক্তারবাবু পুনরায় হেসে উঠে বললেন, না দিয়ে উপায়

কি মা? আমি ছেড়ে দিলেও আর কেউ হয়ত দেবে না। মাঝখান থেকে আমাকেই বঞ্চিত হতে হবে। বুঝলে মা এরা হ'ল সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির মানুষ। আমি না নিলেও অতনুবাবু আর কাউকে বিলিয়ে দেবে। খরচ করাটা এদের বিলাস। আর আমার হ'ল প্রয়োজন।

শ্রীমতী ডাক্তারবাবুর কাছে এগিয়ে এসে হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, বেশ তা হলে দেখুন।

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠে স্নেহের বান ডেকেছে। আর সেই জলের টানে শ্রীমতীর ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, তার চেয়ে তুমি আমার পাশে বস মা। মা বেটাতে খানিক গল্প করি।

শ্রীমতী হেসে বলল, রুগী দেখতে এসে গল্প করলে বুঝি কোন দোষ হয় না? আর তাতে বুঝি মনিব রাগ করেন না?

ডাক্তারবাবুও হেসে বললেন, এ সময়টা আমার মাইনের মধ্যে পড়ে না কিনা তাই খুশী মত ব্যবহার করতে চাইছি। তাছাড়া যে সব রুগী রোগকে স্বীকার করে না তাদের রোগ আমাদের অনেক সময় গল্পের ভিতর দিয়ে নির্ণয় করতে হয়।

শ্রীমতী সহসা অন্য কথায় এল। বলল, আপনাকে সত্যি বলছি এমনি কথায় কথায় ডাক্তার দেখান কিংবা ওষুধ খেতে আমি অভ্যস্ত নই। তাই ঠিক—

তাকে বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, তখন তুমি ছিলে এ দেশের এক স্কুল-মাষ্টারের মেয়ে। সহস্র প্রয়োজনেও ডাক্তার দেখান কিংবা ঔষধ খাওয়াটাকে বিলাসিতা বলে ভাবতে বাধ্য হয়েছ। কিন্তু আজ তুমি মস্ত বড়লোকের স্ত্রী। আজ তোমার প্রয়োজন না থাকলেও প্রয়োজন হবে। নইলে যে মানাবে না মা।

শ্রীমতী বলল, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডাক্তারবাবু পুনরায় হো হো করে হেসে উঠে বললেন, তুমি খুব দুষ্টু ত!

শ্রীমতী একথার কোন জবাব না দিয়ে অন্য কথা বলল, কণ্ঠস্বর তার অত্যন্ত কোমল হয়ে উঠেছে, জানেন ডাক্তারবাবু আপনাকে দেখে অবধি আমার বার বার বাবার কথা মনে পড়ছে।

তার কণ্ঠস্বর সহসা বুজে এল। খানিক চুপ করে থেকে সে পুনশ্চ বলতে সুরু করল, আপনাকে আজই প্রথম দেখার সুযোগ আমার হ'ল, কিন্তু আপনার চোখের রঙিন চশমা থেকে সুরু করে অনেক খবরই আমার জানা। অথচ আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় পাবার কৌতূহল থাকলেও বিশেষ বড় রকমের আগ্রহ ছিল না। এমন জানলে কিন্তু রোজই আমার অসুখ করত।

শ্রীমতী মিষ্টি করে একটু হাসল।

ডাক্তারবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার কি এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে মা?

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, কষ্ট হবে কেন ডাক্তারবাবু? এত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রয়েছি, এটা ত আমার পরম ভাগ্য। কথাটা তা নয়। ও আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। তার চেয়ে আপনি আমাকে পরীক্ষা করুন আমি না করব না।

ডাক্তারবাবু সহজভাবেই শ্রীমতীর একখানি হাত তুলে ধরে নাড়ি টিপলেন, অনুভব করলেন তার গতিবেগ। তারপর মৃদু হেসে বললেন, রোগ তোমার নেই সত্যি, কিন্তু ঔষধের প্রয়োজন আছে। ব্যবস্থাপত্র আমি অতনুকেই দেব মা।

ডাক্তারবাবু একটু থেমে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে পুনরায় বললেন, পরীক্ষা আমার হয়ে গেছে। এবারে বল, এখানে তোমার মন বসছে না কেন?

শ্রীমতী বলল, আমি এমন কথা একবারও আপনাকে বলেছি কি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বললেন, না জেনে বলে ফেলেছ। সব সময় সব কথা কি বলবার দরকার হয় মা?

শ্রীমতী তর্কের দিক দিয়ে গেল না, বরং কথাটা একপ্রকার

মেনে নিয়ে বলল, যদি বুঝেই থাকেন তাহলে আমার মুখ থেকে সেকথা নতুন করে শুনে আর কি হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, বললে ভাল করতে মা। হয়ত চেষ্টা করলে তোমার কিছুটা কাজে আসতে পারতাম। অতনুবাবু আমার মনিব হলেও আমার অনুরোধের মর্য্যাদা দেবে বলেই আমি বিশ্বাস কবি। যাবে নাকি কিছুদিনেব জন্য মা-বাবার কাছে ?

এখন থাক ডাক্তারবাবু। শ্রীমতী নরম গলায় বলল, তার চেয়ে আপনি রোজ একবার করে আসবেন।

শ্রীমতীব কথা বলাব মধ্যে এমন একটা অকৃত্রিম আন্তরিকতা ফুটে উঠল যে, খুশীতে ডাক্তাববাবুর বুক ভরে উঠেছে। তিনি স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন, আসব বৈকি মা, নিশ্চয় আসব। এমন ডাক অবহেলা করবার কি আমাব ক্ষমতা আছে ? পুরুষগুলো বোকা, সব কথা তারা ভাল বোঝে না। তুমি ঠিকই বলেছ, তুমি গেলে এদিকে দেখবে কে ?

ডাক্তারবাবুব কথা বলাব ধরনে শ্রীমতী খানিকটা অবাক হ'ল, অবশ্য কিছু সে বলল না। ডাক্তারবাবু তখনও বলে চলেছেন, কিন্তু কাজটা তুমি ভাল করলে না। লোভ দেখিয়ে দিলে, এব পরে সামলাতে পারবে ত মা ? আর হ্যাঁ, আব একটা কথাও একটু মনে বেখ। অতনুবাবুকে বলে এই দরিদ্র ডাক্তারটির কিছু অর্থপ্রাপ্তিব ব্যবস্থা করে দিও। কি বল মা, কিছু অন্যায় দাবি করেছি ? রোজ যখন একবার কবে আসতে হবে। তিনি পুনরায় উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসির সঙ্গে শ্রীমতীও যোগ দিল। বলল, বলতে বলেন বলব, কিন্তু তাতে আপনার আর্থিক ক্ষতিই হবে।

ডাক্তারবাবু বিস্ময়ের ভান করে বললেন, তোমার কথাটা ত ভাল বুঝলাম না মা।

শ্রীমতী বলল, আমি কিন্তু ডাক্তারবাবুকে আসতে অনুরোধ করি নি। আমি আপনাকে আসতে বলেছি—যাঁর কথা বলা, আর হাসি বার বার আমাকে বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসায় গভীর হয়ে উঠল।

ডাক্তারবাবুরও রঙিন চশমার আড়ালে চোখ দুটো কি জানি কেন সজল হয়ে উঠল। তিনি বিগলিত কণ্ঠে বার বার বলতে লাগলেন, দুষ্টু মেয়ে—তুমি খুবই দুষ্টু মেয়ে।

১০

ঘড়িতে এইমাত্র বারটা বাজল। অতনু এখনও ফিরে আসে নি। শ্রীমতী জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার বাইরে নিবদ্ধ। ঘরের মধ্যে তখনও বৈদ্যুতিক পাখাটা পূর্ণবেগে ঘুরছে। যদিও জানালা পথে ঝলকে ঝলকে দখিনা বাতাস ভিতরে প্রবেশ করছিল। দূরে দেখা যাচ্ছে, অতনুর কারখানার সারি সারি ঘরগুলি। ঘুমিয়ে আছে। একেবারে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। সকাল থেকে দেখা দেবে প্রাণচাঞ্চল্য।

ডাক্তারবাবু বহুপূর্ব্বেই চলে গেছেন। তারপর প্রায় দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। কেষ্ট বারকয়েক ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে নিঃশব্দে। শ্রীমতী ফিরে তাকায় নি, তবে টের পেয়েছে। নিজের লজ্জা ঢাকতেই শ্রীমতী চুপ করে ছিল। কেষ্ট অনেক দিনের পুরান লোক, বহু তথ্যই হয়ত তার জানা। অতনুর রাত বারটায় বাড়ী ফিরে না আসার কারণটাও কেষ্ট জানে। লোকটির বেশ বয়স হয়েছে, হিসেব করে কথা বলে না—অযাচিত উপদেশ দেয়। উদ্দেশ্য তার ভাল হলেও শ্রীমতীর ভাল লাগে না।

অতনুর সম্বন্ধে টুক্‌রো টুক্‌রো অনেক কথাই তার কানে এসেছে। সে সব কথা তার কানে মধু বর্ষণ করে নি। তাকে খোসামোদ করবার ছলেই কথাগুলি শোনাবার প্রয়াস। তারা হয়ত একেবারে মিথ্যে বলে নি, কিন্তু তার বিবাহিত জীবনের এই ক'টা মাসের মধ্যে এমন কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ইতিপূর্ব্বে

ঘটে নি, যার জন্য সেই টুকরো কথাগুলি একত্র করে তাকে দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মান হতে হবে। তথাপি নিজের অজ্ঞাতেই যে শ্রীমতী অনেকখানি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে এ কথাটা হয়ত সে ঠিক জানে না। তাই নীরবে অগ্রাহ্য করে চলবার এই আগ্রহ।

স্বামী স্ত্রীর সহজ জীবনযাত্রার যতগুলি দৃশ্য আজ পর্য্যন্ত তার চোখে পড়েছে, তাদের জীবনে তেমনটি এখনও দেখা দেয় নি। হয়ত এদের সমাজে এইটিই স্বাভাবিক—রাত দশটায় তাই এদের সন্ধ্যা।

কম্পাউণ্ডের প্রান্তে মালির ঘর থেকে তখনও আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে। মালি এবং তার বউ বহুক্ষণ ধরে ফুলবাগানের বেঞ্চিটার উপর বসে আছে। ঐ একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ওদের প্রায় প্রতিদিনই এমনি সময়ে বসে থাকতে দেখা যায়।

পাশের ঘরে অতনু যখন গভীর নিদ্রামগ্ন—এপাশের ঘরে শ্রীমতী তখন হয়ত আকাশের তারা গোনে। অথবা মালিদম্পতির প্রেম নিবেদনের দৃশ্যগুলি চেয়ে চেয়ে দেখে। ওদের কথা যেন শেষ হতে চায় না, সময় ওদের জন্য থেমে আছে যেন!

অতনু একটা জীবন্ত ঝড়। ভেঙ্গেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চলে যায়, পিছনে পড়ে থাকে একটা প্রকাণ্ড অবসাদ, একটা অনির্ব্বচনীয় ক্লান্তি। নিজেকে সামলে নিয়ে শ্রীমতী যখন চোখ মেলে তাকায় তখন কোথায় বা সে ঝড়ের দাপট আর কোথায় বা সে শক্তির উৎস। ঝড় দানব তখন অবসাদে ভেঙে পড়েছে—প্রকৃতি উঠেছে জেগে, ভাঙার মধ্যে তার আনন্দ কোথায়, সৃজনের মধ্যে সে সুন্দরের আবির্ভাব ঘটাতে তৎপর হয়ে ওঠে।

শ্রীমতীর চিন্তাধারা কোন্ পথ ধরে আজ চলতে সুরু করেছে? কি সে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই মুহূর্ত্তে ?

শ্রীমতী নিঃশব্দে এসে শয্যার আশ্রয় নিল। কিন্তু চোখে তার ঘুম নেই। ডাক্তারবাবুর কথা তার মনে পড়ল, সেই সঙ্গে মনে পড়ল তার বাবার কথা, মায়ের কথা আর দাদার কথা। সূর্য্যদাও

তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার রূপ আলাদা। ওদের কোন দাবি নেই, সূর্য্যদার আছে।

এইমাত্র রাত একটার সঙ্কেত শোনা গেল, বাড়ীব সম্মুখে গাড়ী থামার শব্দ হ'ল। শ্রীমতী নিঃশব্দে উঠে এসে জানালাব কাছে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভার দরজা খুলে খানিক অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতবে প্রবেশ কবল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে কেষ্ট এসে উপস্থিত হ'ল। ওদের চলাফেরা দেখে মনে হচ্ছে এমনি ঘটনার সঙ্গে তাদেব ইতিপূর্ব্বেও পরিচয় ঘটেছে।

কেষ্টর সাহায্যে অতনু ধীরে ধীরে নেমে এল, ড্রাইভার গাড়ী গ্যারেজে তুলতে গেল।

মনে হ'ল কেষ্ট কিছু যেন বলছে। প্রশ্নটা শোনা না গেলেও উত্তরটা শ্রীমতীর কানে গেল। সব ঘুমিযে পড়েছে বলছিলি, না? বদমাসগুলির কথা শুনতে গিয়েই তুই থাম ব্যাটা তোর বৌদি আসবাব পব আর খেয়েছি আমি কিন্তু খবরদার কেষ্ট একটি কথাও যদি ফাঁস কবেছ তা হলে তোমায় আমি ডিস্‌মিস্ কবব—হ্যাঁ।

কেষ্ট এত কথাব একটিও জবাব না দিযে ধীরপদে অপর দিকে এগিযে চলল, আর শ্রীমতী দ্রুত নিজের শয্যায় ফিরে এসে ঘুমের ভান করে পড়ে বইল। পরস্পর কানাঘুষাব একটা দিক এই মুহূর্ত্তে তার কাছে আর অস্পষ্ট নয। কিন্তু অতনুব একটা কথা শ্রীমতীর ভাল লাগল—স্ত্রীকে তার সঙ্কোচ এবং খানিকটা ভয়। ঐটুকুই তার মূলধন। এই মূলধনকেই সে অবলম্বন করবে।

আদর্শ পিতার কন্যা সে। পিতাকে সম্মুখে রেখেই এতদিন শ্রীমতী মানুষকে বিচার করে এসেছে। তার আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়িয়েছে তারা এদের সগোত্র নয়—দরিদ্র কিন্তু সংযত। শ্রীমতী ভাবছিল—এর পরে কেমন করে আর কোন্ পথে সে এগিয়ে যাবে, এ নিয়েই তার চিন্তা। হার মানবে না সে—মাথা নীচুও করবে না। তেমন শিক্ষা সে তাব বাবাব কাছে পায় নি। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে সে শেখে নি, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলার মন্ত্র তার জানা।

পাশের ঘরে অতনু ঘুমাচ্ছে। এ ঘরে শ্রীমতী জেগে জেগে ভাবছে—কে এই ডানকান আর শেঠজী আগরওয়ালা। যাদের সরাসরি উপেক্ষা করতে সে পারে নি!

শ্রীমতী সারারাত ভাল করে ঘুমুতে পারে নি। একটা অদ্ভুত চিন্তা ঘুমের মধ্যেও তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তথাপি পরদিন যথাসময়েই তার ঘুম ভাঙল। নিঃশব্দে শয্যা ত্যাগ করে সে স্নানঘরে গিয়ে প্রাণভরে স্নান করে ফিরে এসে খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। অতনু ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে চায়ের টেবিলে এসে শ্রীমতীর জন্য অপেক্ষা করছে। শ্রীমতী পলকে অতনুর আপাদ-মস্তক দেখে নিল এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একখানি চেয়ারে বসে মৃদুকণ্ঠে বলল, আজ খুব সকাল সকাল উঠেছ ত?

অতনু বলল, তুমি কিন্তু আজ আর ডেকে ঘুম ভাঙাও নি।

শ্রীমতী শান্তভাবে বলল, ভাবলাম, হয়ত অনেক রাতে ফিরেছ, তাই আর ডাকিনি। সে নীরবে চা তৈরী করতে মনোনিবেশ করল।

অতনু বেশ খানিকটা অবাক হ'ল। যারা অনুযোগ দেয় কিংবা প্রতিবাদ করে তাদের বোঝা শক্ত নয়, তার একটা সহজ অর্থ সে বোঝে। কিন্তু নীরব নিস্পৃহতার কোন অর্থই সে খুঁজে পায় না। খানিক শঙ্কা তার মনে উদয় হয়। এখানে তার শক্তি সীমাবদ্ধ, কথাটা সে বোঝে। একটু বেশী করেই আজকাল বুঝতে আরম্ভ করেছে। তাই গত রাত্রের ঘটনার উপর সে খানিকটা ঠাণ্ডা প্রলেপ দেবার চেষ্টা করছে। অথচ যাকে কেন্দ্র করে এই দুর্ভাবনা তার তরফ থেকে আভাসে-ইঙ্গিতেও কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না।

অতনুর অন্যমনস্ক মুখের পানে খানিক আড়চোখে চেয়ে দেখে সহসা চা করা বন্ধ করে শ্রীমতী বলল, তুমি কর্নফ্লেক নেবে না পরিজ দেব? তোমার কুককে আমি স্ক্রাম্‌বলড এগ্‌স দেবার জন্য বলে এসেছি! ওতেই হবে না অন্য কিছুর কথাও বলে পাঠাব?

অতনু বলল, ওতেই হবে, কিন্তু তার আগে আমাকে এক পেয়ালা চা দাও।

শ্রীমতী একটু হেসে বলল, কি করব বল—আজ তোমার বেড-টি পাঠাবার পর্য্যন্ত অবকাশ দিলে না। কাল রাত্রে কিছু খাও নি বলেই মনে হ'ল। খাবাব তোমার ঘরেই এনে রেখেছিলাম, যেমন ঢাকা দেওয়া ছিল তেমনি পড়ে আছে দেখলাম।

অতনুর অনুসন্ধানী দৃষ্টি পুনরায় সজাগ হয়ে উঠেও তার ঈপ্সিত কোন বস্তুর সন্ধানই শ্রীমতীর মধ্যে খুঁজে পেল না।

শ্রীমতী বলে চলল, ভাবলাম হয়ত রাগ করেই শুয়ে পড়েছ। আমাকে ত দেখছই বড্ড ঘুমকাতুরে! অনেক বাত পর্য্যন্ত তোমার জন্যে বসে থেকে থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছি। তুমিও খেলে না, আমাকেও খেতে দিলে না।

শ্রীমতী একটুখানি হাসল।

অতনু মনে মনে খুশী হলেও মুখে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলল, কি অন্যায় বল দেখি, আমার যখন দেবী দেখলে তখন নিজে তুমি খেয়ে নিলে না কেন শ্রী?

শ্রীমতী পরিহাসেব ছলে বলল, আরও একটু সময় নেবে। কিন্তু কোন্‌টা অন্যায়? আমাব না খেয়ে রাত কাটান না তোমার দেরী করে ফিরে আসা?

অতনু পুনরায় সজাগ হয়ে উঠল।

শ্রীমতী তেমনি হাসিমুখেই বলল, একেবারে চুপ করে থাকবে? একটা জবাব অন্ততঃ দাও।

অতনু বলল, জবাব দিয়ে কোন লাভ নেই—তা ছাড়া তোমাদের এই সব ঠাকুরমাব যুগের নিয়ম-নিষ্ঠা নিয়ে বাদানুবাদ করতে আমার ভাল লাগে না, বিরক্ত বোধ করি।

শ্রীমতী হেসে উঠে বলল, ওটা প্রকাশ্যে। মনে মনে তোমরা খুশীও হও, খানিক পুলকিত হয়েও ওঠ এই বোকা জাতটার নরম মনোবৃত্তি দেখে।

অতনু বলল, এই মিথ্যা আত্মনিপীড়নের কোন অর্থ হয় না।

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। শান্তকণ্ঠে সে বলল, কি হয় আর কি হয় না তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সমাধান হবে না। ওটা একান্তই অনুভূতির বস্তু। আর ও বস্তুটির তোমার মধ্যে অত্যন্ত অভাব। সহসা শ্রীমতী তার কথার গতিকে রাশ টেনে থামিয়ে অন্য প্রসঙ্গে এল, কথায় পেলে আমার আব কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তোমাকে চা দেওয়াই হয় নি যে।

এক পেয়ালা চা সে অতনুর দিকে এগিয়ে দিল।

এক নিঃশ্বাসে চাটুকু পান কবে অতনু বলল, তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীমতী রহস্য তরলকণ্ঠে জবাব দিল, বোঝাব চেষ্টা করো না, মিথ্যা সময় নষ্ট হবে। তার চেয়ে তোমার খাবার এসেছে, সেই দিকে নজর দাও।

শ্রীমতীর মুখ বন্ধ হলেও হাত দুখানি চঞ্চল হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে মনটাও, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের সহজ কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারে নিজেও সে অবাক হ'ল। বিস্মিত হবার কথাও। গতরাত্রের গ্লানিময় অধ্যায়টি তার মনে কিছুমাত্র দাগ কাটতে পারে নি একথা বলা চলে না। অথচ মন এবং মুখের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের একটা ব্যবধান রেখে সে নিখুঁত অভিনয় কবে চলেছে। এমন সুন্দর সে অভিনয় যে অতনু পর্য্যন্ত হতচকিত হয়ে গেছে। কথাটা তার মুখ দেখেই শ্রীমতী অনুমান করেছে।

খাবার প্লেটগুলি অতনুর সম্মুখে ধরে দিতেই সে জিজ্ঞেস করল, তোমার কোথায় ?

শ্রীমতী জবাব দিল, আমি শুধু পবিত্র খাব—

সহসা একটা কথা মনে পড়তেই অতনু অন্য প্রসঙ্গে এল, আজ থেকে এই আলাদা ব্যবস্থা কেন ? ডাক্তারবাবুর নির্দ্দেশ নাকি ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে একটুখানি হাসল।

অতনু পুনরায় বলল, কি বললেন ডাক্তারবাবু ?

শ্রীমতী বলল, তুমিই তাঁকে জিজ্ঞেস করো, আমাকে কিছু বলেন নি।

তাই করব। অতনু বলল, কোন প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে গেছেন?

না। সংক্ষিপ্ত জবাব এল শ্রীমতীব কাছ থেকে, তোমার সঙ্গেই কথা বলবেন তিনি। কিন্তু এ সব কথা পবে হবে, তুমি খেয়ে নাও আগে।

অতনু আহারে মন দিল।

১১

প্রাতঃরাশ সমাপন কবে অতনু তাব পাইপে অগ্নিসংযোগ করল। উঠে দাঁড়িয়ে খানিক কি চিন্তা করে সে বলল, ডাক্তারবাবু সম্ভবতঃ সকালেই আসবেন, আমি বাইবের ঘরে আছি, এলে আমাকে ডেকে পাঠিও।

শ্রীমতী নীরব। অতনু ধীরে ধীরে বাইরের পথে এগিয়ে গেল। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সহজভাবে কথা বলতে কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করছে অতনু। এই অস্বস্তিকব আবহাওয়া থেকে বের হয়ে এসে সহসা ডানকান আগরওয়ালাগোষ্ঠীর উপব সে বিরূপ হয়ে উঠল।

শ্রীমতী খাবাব ঘর থেকে সোজা নিজের শয়নকক্ষে চলে এল। খানিক অকাবণে এটা সেটা নাডাচাডি করে চলে এল রান্নাঘরে। কোমবে কাপড় জডিয়ে কতকটা তৈরী হয়ে এসেছে সে।

গৃহকর্ত্রীকে এমন অসময় তাদের মহলে আসতে দেখে সকলে তটস্থ হয়ে উঠেছে। শুধু কেষ্টর চোখেমুখে খুশীর আভাস পাওয়া গেল। তার ভাবে-ভঙ্গিতে এতই স্পষ্ট হযে উঠেছে যে শ্রীমতীর তা দৃষ্টি এডাল না। কেষ্টকে উদ্দেশ করে সহাস্যে সে বলল, আজ সব রান্নাই দেশী মতে হবে কেষ্ট। ঠাকুরের অভ্যেস আছে ত শুক্তো কিংবা ঘণ্ট রান্না করবার?

কেষ্ট একগাল হেসে বলল, আপনি কি যে বলেন বৌদিরাণী—

শ্রীমতী পুনরায় বলল, বহুদিনের অনভ্যাস বলেই জিজ্ঞেস করছি। আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দেব। আজ একজন বাইরের লোক খাবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি এখনই ডাক্তারবাবুকে ফোন করে এখানে একবার আসবার কথা বলে এস কেষ্ট, দেরী করো না যেন, তোমাকেও আমার দরকার হবে।

কেষ্ট চলে যেতেই ঠাকুর একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল, রান্না করাই আমার কাজ মা, আপনি শুধু হুকুম দিয়ে চলে যান, আপনার কথামতই সব হবে। এখানে থেকে মিথ্যে আপনি কষ্ট পাবেন কেন!

শ্রীমতী প্রসন্নকণ্ঠে বলল, রান্নাঘরে থাকতে আমার কষ্ট হবে না ঠাকুর, আমার অভ্যেস আছে। তা ছাড়া ভালও লাগে।

ঠাকুর খানিক কৃতার্থের হাসি হাসল।

কেষ্ট ফিরে এসে বলল, ডাক্তারবাবু তাঁর বস্তি দর্শনে বেরুচ্ছিলেন, ওখানকার কাজ হয়ে গেলে সোজা এখানে চলে আসবেন বললেন।

একটু থেমে একটু দ্বিধা করে সে পুনরায় বলল, বলছিলাম কি—

শ্রীমতী হেসে বলল, কি বলছিলে কেষ্ট?

কেষ্ট বলল, বাইরের লোকটি কি আমাদের ডাক্তারবাবু বৌদিরাণী?

শ্রীমতী জানাল, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ কেষ্ট, আমি ডাক্তারবাবুর কথাই ভাবছিলাম।

কেষ্ট বলল, আমাদের ডাক্তারবাবু আর দাদাবাবু কিন্তু একই জিনিস পছন্দ করেন না—ডাক্তারবাবু মাংস একেবারে ছোন না।

শ্রীমতী বলল, কথাটা আমাকে জানিয়ে তুমি ভাল করেছ কেষ্ট, নইলে লজ্জা পেতে হ'ত। আর শোন, বাজার যাবার আগে এখন থেকে রোজ আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলো সরকার মশাইকে।

ঘাড় নেড়ে কেষ্ট সায় দিল এবং আর একবার রান্নাঘরের

অন্যান্য উপস্থিত সকলের মুখের চেহারাটা আড়চোখে দেখে নিল। ওদের চাঞ্চল্য আর সন্ত্রস্ত ভাব সে মনে মনে উপভোগ করছে বলে মনে হ'ল।

আর একটা কথা কেষ্ট। শ্রীমতী পুনরায় বলল, তুমি এখন থেকে রোজ সরকার মশাইয়ের সঙ্গে বাজারে যাবে। কি প্রয়োজন হবে তা তুমিই আমার কাছ থেকে জেনে নেবে। সরকার মশাইয়ের দেখা করবার কোন দরকার নেই।

কেষ্ট বলল, রোজই যেতে হবে বৌদিরাণী ?

শ্রীমতী একনজরে কিছু অনুমান করে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, রোজই এই নিয়মে চলবে, তুমি আমাব সঙ্গে চল। বলে কেষ্টকে সঙ্গে করে সে তার শয়নকক্ষে চলে এল। অনতিবিলম্বে কেষ্ট একখানি দীর্ঘ ফৰ্দ্দ হাতে খুশীমনে সরকাব মশাইয়ের উদ্দেশে বাহির-মহলে চলে গেল।

কর্ত্রীঠাকুবাণীব সহসা রান্নাঘরেব উপর নেক্‌নজর পড়ায় চাকর-চাকরাণী মহলে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। এ বাড়ীর অভ্যস্ত জীবনযাত্রা-পথে এই সর্ব্বপ্রথম এল বাধা। কেউ কেউ পেল ভয়। কেউ ভাবল, এ একটা বড়মানুষী খেয়াল, দু'দিনেই সখ মিটে যাবে। শুধু দু'চাবদিন একটু চোখ-কান বুজে থাকলেই গোল মিটে যাবে, তবু তাবা জেগে উঠেছে। যে খেয়ালের বশে তিনি রান্নাঘরে ছুটে এসেছেন তারই বশে অন্ন মারতেও পারেন।

শ্রীমতী ওদের রকম দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'ল। তার উপস্থিতিটা যে ওদের কাছে সুখদায়ক হয় নি তা সে অনুমান করে নিলেও তার অন্য কোন উপায় নেই। গতকাল সারারাতই সে তার ভবিষ্যৎ চলার পথ সম্বন্ধে চিন্তা করেছে—চিন্তা করে দেখেছে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। তার বিবাহের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত থেকে বর্ত্তমান-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সবকিছুই কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। অথচ এর কোনকিছুই মিথ্যা নয়—সত্য। এত বড় সত্য সে এমন মনপ্রাণ দিয়ে কোন-দিন অনুভব কবে নি। ডাক্তারবাবুকে সে আহ্বান জানিয়েছে।

মনে হয় তিনি খাঁটি লোক, শুনে এবং দেখে অবধি তার ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

হেরে যেতে সে রাজি নয়। অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলে দুই বিপরীতপন্থী মানুষের মধ্যে সে সেতু রচনায় ব্রতী হয়েছে। চেষ্টার সে ত্রুটি রাখবে না।

কেষ্ট এরই মধ্যে ফিরে এসেছে। নিঃশব্দ-চিন্তায় তাব অনেকক্ষণ কেটে গেছে, বুঝতে পাবে নি। শ্রীমতী খবর পেয়ে দ্রুত নীচে নেমে এল। হেসে বলল, খুব তাড়াতাড়ি এসেচ ত কেষ্ট!

কেষ্ট একমুখ হাসি দিয়ে জবাব দিল।

শ্রীমতী নিজেই হেঁসেলে প্রবেশ করেছে। নিজে হাতে সে আজ সব ক'টি রান্না করবে। সংসারের এই অংশের সঙ্গে যে তাব কত গভীর যোগ বযেছে কথাটা আবাব নতুন কবে সে অনুভব করল।

ঠাকুর বারে বারেই বলছিল যে, এত পবিশ্রম নাকি তার সইবে না, এসব কাজ কি সকলেব জন্যে?

শ্রীমতী মনে মনে হাসল, কোন জবাব দিল না। কিন্তু কেষ্ট চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, তুমি মেলা বকছ কেন ঠাকুর।

ঠাকুর একবার আগুনভরা দৃষ্টিতে কেষ্টব পানে তাকাল। কেষ্ট হয়ত আরও কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু শ্রীমতী তাকে থামিয়ে দিয়ে হেসে বলল, আজকেব দিনটা বিশ্রাম নাও ঠাকুর। রোজই -। কথাটা সে শেষ কবতে পাবল না। বাইবে ডাক্তাবববাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তিনি কেষ্টর নাম ধরে হাঁকডাক সুরু করে দিয়েছেন।

কেষ্ট সাড়া দিয়ে দ্রুত চলে গেল।

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বব পুনরায় শোনা গেল, রান্নাঘরে তোমার বৌদিরাণী। কেন, তোমাদের ঠাকুব গেলেন কোথায়? অসুখ-বিসুখ করে নি ত?

কেষ্টর উত্তবটাও শ্রীমতীর কানে এল, আজ্ঞে অসুখ করতে যাবে কেন। বৌদিরাণী ইচ্ছে করেই রান্নাঘরে গেছেন।

এতক্ষণে শ্রীমতীও এসে উপস্থিত হয়েছে। লালপেড়ে সাধারণ একখানি শাড়ী পরেছে সে। আঁচলটি আঁটসাট করে কোমরে জড়ান, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, দু'চোখে অপরিসীম ক্লান্তি, মুখে প্রফুল্ল হাসি।

একনজরে শ্রীমতীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে ডাক্তারবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বাঃ, সুন্দর—এই না হলে মানায়!

শ্রীমতী মাথা নত করল।

ডাক্তারবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে চললেন, তোমায় দেখে অনেক দিন পরে আবার নতুন করে আমার নিজের মাকে মনে পড়ল। সে এক মস্ত বড় ইতিহাস, একদিন তোমাকে শোনাব। কিন্তু এ বাড়ীতে এই নতুন নিয়ম কি চালাতে পারবে মা?

শ্রীমতী একটু হেসে বলল, হুকুমজারী করে এ নিয়ম চালান হবে না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু কি জানি কেন কথাটা এইখানেই চাপা দিলেন। বললেন, কিন্তু হঠাৎ এ বুড়োকে এমন জরুরী তলব কেন তা ত এখনও বললে না মা?

বলছি। শ্রীমতী বলল; তার আগে আমার ঘরে চলুন। সে মন্থর-পদে এগিয়ে চলল, ডাক্তারবাবু তাকে অনুসরণ করলেন।

চলতে চলতে শ্রীমতী বলল, আপনার এ বেলার কাজ শেষ করে এসেছেন ত ডাক্তারবাবু? না, আবার বেরুতে হবে?

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে জবাব দিলেন, একরকম শেষ করেই এসেছি।

ভালই হ'ল। শ্রীমতী জানাল আপনাকে আজ আমার বড্ড দরকার।

ডাক্তারবাবু উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে বললেন, শরীর খারাপ নয় ত?

শ্রীমতী হেসে ফেলে বলল, তা হলে কি রান্নাঘরে দেখতে পেতেন?

ডাক্তারবাবুও হাসিমুখে বললেন, তাও ত বটে। অভ্যেসের দোষ মা ; ভাল কোন কিছুই আর মনে আসে না। ডাক শুনলেই রোগের কথা মনে পড়ে যায়।

শ্রীমতী পুনরায় হেসে উঠল।

ঘরে এসে ডাক্তারবাবুকে সমাদর করে বসিয়ে শ্রীমতী তাঁর পদপ্রান্তে উপবেশন করে জুতোর ফিতে খুলতে যেতেই তিনি বাধা দিয়ে বললেন, তোমার মতলবটা কি বল দেখি মা ?

শ্রীমতী কোনপ্রকার ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলল, আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে, আমি জানি আপনি না করতে পারবেন না, তাই আর অনুমতির অপেক্ষা রাখি নি। কাল থেকেই বাবাকে বড্ড মনে পড়ছে।—একটু থেমে সে পুনরায় বলল, বাবাকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে আমি বড্ড ভালবাসতাম।

তাই বুঝি বেছে বেছে এই বুড়োকে ডেকে পাঠিয়েছ ? ডাক্তারবাবু প্রসন্নহাস্যে বললেন, কিন্তু এর পরে ঝক্কি পোহাতে পারবে ত মা ? এই কাঙাল বুড়োকে নিয়ে পাগল হয়ে যাবে যে—

শ্রীমতী গম্ভীরকণ্ঠে বলল, না—বেঁচে উঠব। আপনি আমাকে পাগল করেই দিন, আমি তাইত চাই।

ডাক্তারবাবু সঙ্গোপনে একটি নিঃশ্বাস মোচন করে বললেন, করে দিতে হবে না আপনিই হবে। এ তুমি দেখে নিও।

ডাক্তারবাবুকে যেন কথায় পেয়েছে, তিনি বলতে থাকেন, এ জাতটা পাগল বলেই আর একটা জাত বেঁচে আছে। নইলে দুঃখের অবধি থাকত না, পাগল বলেই এদেব আর নতুন করে পাগল হতে হয় না মা।

শ্রীমতী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে, কথা বলে না।

ডাক্তারবাবু সহসা অন্য প্রসঙ্গে এলেন, আমার মন বলছে এমনি একটা নেমন্তন্ন পাবার আমার দরকার ছিল। কাঁচকলা আর আলুসেদ্ধ খেয়ে খেয়ে পেটে আমাব চড়া পড়ে গিয়েছে।

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, ইচ্ছেটা নিশ্চয়ই আপনার ঐকান্তিক ছিল—

বিলক্ষণ! ডাক্তারবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, নইলে এত সহজে কি অন্নপূর্ণার আসন টলে উঠত মা।

শ্রীমতী লজ্জিতভাবে মাথা নত করল। ডাক্তারবাবু তার আনত মুখের পানে দৃষ্টি রেখে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

খেতে বসেও পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধরে ডাক্তারবাবু বললেন, ইচ্ছেটা যতদিন মনে মনে ছিল তখন তা পূরণ না হওয়ার জন্য দুঃখের অবধি ছিল না, কিন্তু আজ যখন তা মিটল তখনই মন উল্‌টো সুরে গাইতে সুরু করেছে। এ পথে ত নিবৃত্তি হবে না, বরং ইন্ধন জোগান হ'ল।

শ্রীমতী একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ একথা কেন?

ডাক্তারবাবু সহসা আহারে মন দিলেন। শ্রীমতীর প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বুঝলে মা, এই সে শুক্তনীটা খেলাম, এমন সুন্দর রান্না যে, কোনদিন খেয়েছি তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম -তেমনি হয়েছে সোনামুগের ডালটি। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার কথা বলব তাই বুঝে উঠতে পারছি না। মোচাঘণ্ট, এঁচোড়ের ডালনা, মুড়ীঘণ্ট, চিতল মাছের পেটির ঝাল, রুইমাছের কালিয়া, কইমাছের প্লাতুরী। সব ভাল—খাসা হয়েছে, কিন্তু এতগুলি কখন মানুষ খেতে পারে? আমি বলে তাই··· ডাক্তারবাবু থামলেন।

শ্রীমতী একাগ্রভাবে কথাগুলি শুনতে শুনতে তাঁর শেষ কথায় হেসে ফেলল।

ডাক্তারবাবু একবার শ্রীমতীর মুখের পানে একবার তাঁর থালার চতুর্দ্দিকের শূন্য বাটিগুলির পানে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন। এবং পরমুহূর্ত্তে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, হেসো না মা, এত খাওয়া সত্যিই ভদ্রলোকের জন্য নয়। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি বর্ত্তমানকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই মায়ের

হাতের রান্নার স্বাদ পেয়ে এমন করে চেঁছে-পুছে নিঃশেষ করে ফেলেছি। পরিমাপ আর পরিমাণের কথাটা মনেই ছিল না।

শ্রীমতী লজ্জিত হ'ল, ডাক্তারবাবুর তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি প্রসন্নহাস্যে বললেন, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন মা? নিজের গর্ভধারিণীই আমাকে ক্ষুদে-রাক্ষস বলে ডাকতেন। তবেই বোঝ, তার উপর আবার দীর্ঘদিনের উপুসী ব্রাহ্মণ!

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনশ্চ বলতে সুরু করলেন, কি দিনই তখন ছিল মা।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীমতী বলল, আপনি শুধু কথাই কইছেন—

বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, আর কিছু খাচ্ছি না, কি বল? কিন্তু এত খাবার সব গেল কোথায় বলতে পার? তুমি কিছু ভেব না, কোথাও যাতে একটি কণা পড়ে না থাকে তারই ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। পেট আমার মাত্র একটা যে মা। তারপরে শোন যে কথা তোমাকে বলছিলাম, এদিকে মা মুখে বলে বেড়াতেন ক্ষুদে-রাক্ষস; অথচ ভালমন্দ নানা রসদ যোগাতেন তিনি নিজেই। রান্না করে সামনে বসিয়ে না খাইয়েও তাঁর শান্তি ছিল না—পাছে একটু কম খাওয়া হয়। মাগুলি সব এমনিই বোকা আর এমনিই পাগল!

শ্রীমতী বলল, আর ছেলেগুলি ষোল আনা সুযোগ আদায় করে নেয় সেই সুযোগের।

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে! স্নেহময়ী মায়ের কথা পরিহাসের ছলে বলতে বলতে অকস্মাৎ তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কণ্ঠস্বর তাঁর গভীর আবেগে বুজে এল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, না নিয়ে উপায় কি মা, নইলে কোন তরফেরই মন ভরে না। যে নেয় তারও না, যে দেয় তারও না। সংসারে এ বড় চমৎকার খেলা।

খানিক চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলেন ডাক্তারবাবু। শ্রীমতী

তাঁর মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নীরবে বসে আছে, ডাক্তারবাবু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর অতীত-জীবনের দিনগুলি প্রদক্ষিণ করে এসেছেন। তিনি পুনরায় কথা কয়ে উঠলেন, বাবা অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন। বাবার যেমন ছিল পয়সা, তেমনি ছিলেন দাম্ভিক আর একরোখা। মায়ের গরিবী গিন্নিপনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না—মা ছিলেন তেমনি নিঃশব্দ, চেঁচামেচি করতে পারতেন না, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ—যেটুকু করবার করে যেতেন। বিশেষ করে আমার ব্যাপারে তিনি কারুর হুকুমনামা গ্রাহ্য করতেন না। এ নিয়ে মা এবং বাবার মধ্যে সব সময় প্রীতির সম্বন্ধ বজায় থাকত না।

কথার মাঝেই সহসা ডাক্তারবাবু থামলেন। শ্রীমতী একাগ্র-চিত্তে শুনছিল, তাঁর কথা বন্ধ হতেই মুখ থেকে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে এল, তারপর ?

ডাক্তারবাবু ততক্ষণে একটি গোটা রসগোল্লা মুখে পুরে দিয়েছেন। তিনি হাত নেড়ে জানালেন, হচ্ছে হচ্ছে ·

রসগোল্লাটি গলাধঃকরণ করে তিনি পুনরায় নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, বাবার কাছে যেটা আত্মসম্মানের প্রশ্ন, মায়ের কাছে সেটা আত্মতৃপ্তির প্রশ্ন। কলহ করতে কেউই তাঁরা পছন্দ করতেন না—অন্ততঃ সব জিনিসের জের টেনে চলাটা। সুতরাং সুরু হ'ল এক অভিনব লুকোচুরি খেলা। আমি তখন মাত্র বছরদশেকের বালক। এত রাগারাগি আর এত লুকোচুরির কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পেতাম না, কিন্তু আমাকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ানকে কেন্দ্র করেই যে বাবার সঙ্গে মায়ের মতান্তর এ কথাটা আমি অনুভব করতাম। কেমন একটা চাপা বেদনায় আমার মনটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠত।

ডাক্তারবাবু পুনরায় থামলেন। শ্রীমতী তেমনি নিঃশব্দে বসে আছে। সেই দিকে খানিক একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তিনি পুনরায় বলতে সুরু করেন, আমার মা কিন্তু খুব বেশী দিন বাঁচেন নি। একদিন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই চলে গেলেন।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, তিনি মারা গেলেন ?

ডাক্তারবাবু জানালেন, হ্যাঁ মা।

শ্রীমতী পুনরায় জিজ্ঞেস করে, তারপর ?

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, তোমাদের আজ খেতে হবে না মা ? অতনুবাবুর যে আসবার সময় হয়ে গেছে।

তা হোক। শ্রীমতী বলল, খাওয়া একদিনেই ফুরিয়ে যাবে না।

ডাক্তারবাবু একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন, তারপরে কম করে পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। মা বলে আমার কেউ কোনদিন ছিল তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। দশ বছরের ইতিহাস পঁয়তাল্লিশ বছরের গহ্বরে তলিয়ে গেল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যায় নি, আত্মগোপন করে ছিল—সময়মত ভেসে উঠেছে। সেদিনের সেই সুলভ বস্তুটি আজ দুর্লভ হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনি করেই মূল্য নিরূপণ হয়, বুঝলে মা ?

শ্রীমতীর দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল, ডাক্তারবাবুর কথাগুলি বড় দুর্ব্বোধ্য লাগছে।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা কিছুদিনের জন্য থেমে গেলেন। তাঁর হাঁকডাক, অকারণে চেঁচামেচি আর বড় একটা শোনা যায় না। চতুর্দ্দিকে বাবাকে নিয়ে রীতিমত জল্পনা-কল্পনা দানা বেঁধে উঠল। সব কথা আমার মনে নেই, মনে থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কথাটা নানাভাবে বড় বেশী আলোচিত হয়েছিল বলেই হয়ত এটা সম্ভব হয়েছে। ডাক্তারবাবু থামলেন।

শ্রীমতী প্রশ্ন করল, কি কথা ?

ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন, বাবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কথাটা। এই সব আলোচনার মাঝ থেকে আমি সকলের অলক্ষ্যে সরে যেতাম। নিঃশব্দে কত কান্নাই না কেঁদেছি।

ডাক্তারবাবু থামলেন। তাঁর চোখেমুখে বড় মধুর নরম খানিকটা হাসি লেগে আছে।

তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, কথাটা কে বলবে এই নিয়ে দেখা দিল সমস্যা। আমার এক দূরসম্পর্কের পিসিমা কাজটির ভার নিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছিল তা অবশ্য আমি শুনিনি। কিন্তু পিসিমাকে তার পরদিনই আমাদের বাড়ী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। পিসিমা চলে যাবার আগে আমাকে বুকে চেপে ধরে কী কান্নাই না কাঁদলেন। আমি কাঠ হয়ে তাঁর এই স্নেহের উৎপাত সহ্য করেছিলাম। বাবা আমাকে তাঁর হাত থেকে বাঁচালেন। ধমক দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ছেলেটাকে অযথা কাঁদিয়ে রেখে যেও না সবিতা।

শ্রীমতী সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, আপনার বাবা নিশ্চয় আর বিয়ে করেন নি—

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, না, বিয়ে তিনি আর শেষ জীবন পর্য্যন্ত করেন নি। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবার চালচলনে একদিনের জন্যও কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেতে দেখা যায় নি। মৃত্যুটাকে তিনি খুব সহজ ভাবে মেনে নিতে পেরেছেন এই কথাটাই সকলে বলাবলি করতে সুরু করে দিল। বাবার মত পুরুষসিংহের কাছে এমনটিই নাকি সকলে আশা করেছিলেন। আমি তখন খুবই ছেলেমানুষ। বোধশক্তি অপরিণত হলেও সব সময়ই আমার মনে হ'ত আসল সত্যের সন্ধান ওরা কেউ পায় নি। বাবা নির্জ্জন ঘরে সকলের অলক্ষ্যে যখন মাঝে মাঝে আমাকে নিতান্ত অকারণে বুকে চেপে ধরতেন তখন আমি কথাটা অনুভব করতাম। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভব করত যে, বাবা একটা মস্তবড় ব্যথা সারাদিনরাত অতি সঙ্গোপনে বয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি প্রায়ই চুপি চুপি জিজ্ঞেস করতেন, তোর খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে? আমার আজও পরিষ্কার মনে আছে, আমি বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে সবেগে মাথা নেড়েছিলাম, কিন্তু চোখের জল বাধা মানে নি। ফলে হ'ল কি জান মা? আমার সঙ্গে সঙ্গে বাবাও পুরো একটি মাস হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সেদিনের সে সব কথা মনে

হলেই ভাবি, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কত বদলে যায়। নিজের মত আর পথটা এতই বড় হয়ে ওঠে যে, মনের সুকুমাব বৃত্তিগুলিকে অবলীলাক্রমে গলা টিপে মারতেও এতটুকু হাত কাঁপে না।

ডাক্তারবাবু থামলেন এবং সহসা উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, আব একদিন শুনো মা। অতনু এতক্ষণে নিশ্চয় এসে গেছে।

১১

খাওয়া-দাওয়ার এই নতুন ব্যবস্থা নিয়ে অতনু শ্রীমতীকে কোন প্রশ্ন করল না। যদিও সে খানিকটা বিস্মিত হয়েছে। তা ছাড়া চেয়াব-টেবিলেব পরিবর্তে মেঝেতে আসনে বসে খেতে নেহাত মন্দও লাগছে না আজ।

কিন্তু অতনু প্রশ্ন কবতে না চাইলেও শ্রীমতী চুপ কবে থাকতে পারল না। বলল, তোমার খেতে বোধ হয় খুব অসুবিধা হচ্ছে?

অতনু সহজ ভাবে উত্তব দিল, বিশেষ করে আমার অসুবিধা হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। আমরা সাহেব নই আব জন্মাবধি কিছু চেয়াব-টেবিলে খেতেও অভ্যস্ত নই। বরং অনেক দিন পবে এই পুবান ব্যবস্থায় ফিরে এসে ভালই লাগছে।

শ্রীমতী খুশী হ'ল জবাব শুনে। বলল, চেয়াব-টেবিলেব কথাটাও না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু খাবাব জিনিসগুলি? এগুলি তোমাব মনের মত হয়েছে ত? শুক্তো, ঘণ্ট, মাছেব পাতুরি

তাকে বাধা দিয়ে খেতে খেতেই অতনু বলল, এগুলিব স্বাদ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠাকুব হতভাগাকে জরিমানা করতে হবে—

শ্রীমতী হাসিমুখে বলল, তাব অপবাধ?

এমন সুন্দব সুন্দর বান্না জানা সত্ত্বেও আমাকে এতদিন ফাঁকি দিয়েছে বলে, অতনু রীতিমত গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দিল।

শ্রীমতী স্মিতহেসে বলল, এসব রান্না তোমার ঠাকুর করে নি।

হুকুম কর ত যে রেঁধেছে তাকেই আজ থেকে বাহাল করে নিই। তোমার ঠাকুর থাকবে পোশাকী রান্নার জন্য।

কথাটা মন্দ বল নি, একমুখ হেসে অতনু বলল, কিন্তু লোকটি কে শুনি?

শ্রীমতী বলল, লোকটি তোমাব সামনেই বসে আছে।

অতনুর কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ল, তুমি! মানে আমার স্ত্রী এতগুলি ঠাকুব চাকবেব সামনে হেঁসেলে ঢুকে রান্না কবেছে। ওবা সব ভেবেছে কি।

অতনুব কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে শ্রীমতী অবাক্ হয়ে গেল। কিন্তু মনেব ভাব তাব কথায় প্রকাশ পেল না। বলল, ওরা কি ভেবেছে না ভেবেছে তা নিয়ে আমাব মাথা ব্যথা নেই।

কিন্তু আমাব আছে, গম্ভীর হয়ে অতনু বলল, আমি স্বীকার করছি তুমি খুব চমৎকাব রান্না কবতে পার। আমি এ কথাও অস্বীকার কবছি না যে, স্বাস্থ্যেব দিক দিয়ে বিচার করলে এমন খাওয়ার তুলনা হয় না। এমন কি একথাও আমি মেনে নিচ্ছি যে, এমনি ভাবে বসে খেয়ে আব খাইয়ে খুব আনন্দ পাওয়া যায়, তাই বলে তুমি রান্নাঘরে ঢুকে হাতা খুন্তি নিয়ে নাড়াচাড়া কববে—হাতে, কাপড়ে-চোপড়ে হলুদেব ছোপ লাগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে—, অতনু ভ্রূকুঁচকে এক বিচিত্র মুখভঙ্গি কবে পুনরায় বলল, হবিব্‌ল এ আমি কিছুতেই ববদাস্ত করতে পাবব না।

রান্নার ব্যাপাব নিয়ে যে এমনি এক অভাবিত দৃশ্যেব সম্মুখীন হতে হবে একথা শ্রীমতী কল্পনা কবতেও পাবে নি। সে খানিকটা বিস্মিত ভাবেই জবাব দিল, তোমার বক্তব্যটা আর একটু সহজ করে বললে ভাল হয়।

অতনু প্রচ্ছন্ন আদেশের স্বরে বলল, যে বাড়ীর যেটা রেওয়াজ সেইটে মেনে চলবার কথা বলছিলাম আমি।

শ্রীমতী কথাটা তেমন গায়ে না মেখে মৃদুকণ্ঠে বলল, আমরা অন্যরকম দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম।

অতনু অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল, আশ্চর্য্য, এটা যে তোমার বাপের বাড়ী নয় এ কথাটাও আমাকে বলে দিতে হবে নাকি ?

শ্রীমতীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু আশ্চর্য্যরকম সংযত-কণ্ঠে সে বলল, ভুলব কেন। ববং এটা আমার নিজের বাড়ী বলেই আমার ইচ্ছেমত চলবার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি। আর আমার এলাকায় আমার কাজের কেউ কৈফিয়ৎ চাইলে আমি তার জবাব দিতে বাধ্য নই এ কথাটা তোমাকেও আমি জানিয়ে দিতে চাই।

শ্রীমতীর উত্তর দেবার ধবনে অতনু চমকিত হ'ল এবং তার অজ্ঞাতেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, তোমার বাড়ী তোমার এলাকা·

শ্রীমতী তেমনি শান্ত সংযতকণ্ঠে বলল, ওটা আমার কথা নয় তোমাদেরই কথা। তোমরাই একথা সব সময় বলে থাক। অস্বীকার করতে পার একথা ?

অতনুর মুখে কোন উত্তর জোগাল না। সে শুধু ভাবছিল শ্রীমতীর কথা। ওর সম্বন্ধে তার আরও ঢের বেশী সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ঢের ঢের বেশী।

শ্রীমতী পুনবায় বলল, একেবারে থেমে গেলে কেন—বল যে ওটা ঠিক কথা নয় —প্রয়োজনে সুবিধে আদায় করে নেবার ছল মাত্র। আসলে আমার যেটা সেটা আমারই।

অতনু ভিতরে ভিতরে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেও সহজ হয়ে উঠবার চেষ্টা করে বলল, তোমার এ কথার জবাব আমি দেব না। অতনু উঠে দাঁড়াল।

শ্রীমতী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, দিলে ভাল করতে। কারণ তোমার কাছে যেটা ফাঁকা আত্মসম্মানের প্রশ্ন, আমার কাছে সেটা জীবনমরণ সমস্যা। তোমাদের এই আতিশয্যের মধ্যে আমি আর নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার একটা আলাদা পৃথিবী আছে। সেখানে তুমি স্বাধীন বেপরোয়া। ইচ্ছে খুশী যা প্রাণ

চায় তাই করতে পার। সঙ্গত বাধা থাকলেও অসঙ্গত খেয়াল চরিতার্থ করে গেলেও বলবার কিছু নেই, অথচ আমাদের বেলা এই অনুদার সীমাবদ্ধ গণ্ডী কেন?

অতনু এতক্ষণে হাসল। শ্রীমতীর কথার ঝাঁজ বেশ খানিকটা করুণ শোনাচ্ছে এতক্ষণ পরে। অতনু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করে বলল, কিন্তু আমার মান-সম্মান কি তোমার কিছু নয় শ্রী? আমার ভাল এবং মন্দ লাগাটাকে কেন তুমি আলাদা করে দেখছ?

শ্রীমতীর মুখে একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে বলল, ঠিক একই প্রশ্ন আমারও—তুমি কি জবাব দেবে শুনি? কিন্তু এসব তর্কযুদ্ধ এখন থাক। আমার অনুরোধ—একটু চোখ মেলে চলতে শেখো। দিন অত্যন্ত দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

অতনু শ্লেষ করে জবাব দিল, কথাটা তুমি ঘরে বসে দেখতে পাচ্ছ আর আমি—

তাকে বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, সেইজন্যেই আমি গৃহসংস্কারে লেগেছি। বাইরের জন্য ত তোমরাই আছ। কিন্তু ঘরে-বাইরে সমানভাবে কর্তৃত্ব করতে এস না, এইটেই অনুরোধ। এতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে যায়। তা ছাড়া এ কথাটা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না যে, স্বামী বা প্রিয়জনদের নিজে হাতে রান্না করে বসে খাওয়ানোর মধ্যে মান-সম্মানের কথাটা দেখা দেয় কেমন করে। একটু থেমে শ্রীমতী প্রসঙ্গান্তরে এল, আচ্ছা তুমি কেমন করে এত বড় একটা কোম্পানী চালাও বলতে পার?

অতনু বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে জবাব দিল, অবাস্তব প্রশ্ন।

শ্রীমতী বলল, হয়ত তাই। এটা নিছক কৌতূহল। কিন্তু তোমার যখন আপত্তি আছে তখন থাক।

অতনু আর একটি কথাও না বলে চলে গেল।

সে চলে যেতেই শ্রীমতীর মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা এসে ভিড় করে দাঁড়াল। বিশেষ করে ডাক্তারবাবুর কথাগুলিই ঘুরে

ফিরে উঁকি দিচ্ছে। তিনি কি গল্পের ছলে নিজের মা-বাবাকে সামনে রেখে তারই ভবিষ্যতের একটা ইঙ্গিত করে গেলেন? এ বাড়ীতে শ্রীমতী এসেছে মাত্র মাস কয়েক পূর্ব্বে কিন্তু ডাক্তারবাবু এঁদেব দেখছেন বহু বছর ধবে। সে হয়ত খানিকটা বিশেষ পদমর্য্যাদার অধিকারী হয়ে এসেছে। কিন্তু ক্ষমতাহীন এ পদমর্য্যাদার কতটুকু মূল্য? তার নিজের ইচ্ছেমত এক পা এগুবাব কিংবা পিছুবার অধিকারটুকুও নেই। অন্ততঃ আজ এই মুহূর্ত্তে কথাটা আর অস্পষ্ট নয়। তার চেয়ে বরং কেষ্টরও স্বাধীন-সত্ত্বা আছে। নানা বিধি নিষেধ তাব চলাব পথে বাধার সৃষ্টি করে না।

বিকেল বেলা পাচক এসে জিজ্ঞেস করল, আজ বাত্রে কি বান্না হবে মা?

শ্রীমতী আনমনা ভাবে বসেছিল। পাচকেব আহ্বানে সচকিত হয়ে উঠল।

পাচক পুনরায় তার বক্তব্য জানাল।

শ্রীমতী জবাব দিল, আমাকে জিজ্ঞেস করে কি বোজ ব্যবস্থা করা হয় ঠাকুর? যা হয় তুমিই কবগে।

পাচক বিনীতকণ্ঠে জানাল, আজ্ঞে কেষ্ট আপনাব হুকুম নেবাব কথা বলল।

একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে শ্রীমতী বলল, তোমাদের বাবুর পছন্দমত ব্যবস্থা করবে।

পাচক হেসে বলল, আপনি যেমন বলেন তাই হবে মা—কিন্তু আপনার জন্যেও কি একই—

তাকে বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, রাত্রে আমি কিছু খাব না ঠাকুর। বড্ড অবেলায় খেয়েছি।

পাচক তথাপি দাঁড়িয়ে আছে দেখে শ্রীমতী পুনরায় বলল, আর কিছু বলবে আমায়?

আজ্ঞে না—তবে বলছিলাম কি · আপনাব জন্যে খানকয়েক ফুলকো লুচি করে রাখব কি? ঠাকুর মৃদুকণ্ঠে বলল।

শ্রীমতী বলল, যদি দরকার মনে করি তোমাকে আমি খবর পাঠাব।

পাচক প্রস্থান করল।

পরদিন অতি-প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে সর্ব্বপ্রথম তার চোখে পড়ল অতনুর গত রাত্রের অভুক্ত খাবারগুলি। এর কারণটাও আজ আর তার কাছে অজানা নয়। কিন্তু এই নিয়ে মাথা খারাপ করে কোন লাভ নেই। শুধু মনটা তার দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমতী তার ঘাসের চটিতে পা গলিয়ে নিঃশব্দে বাগানে চলে এল। একটা লতানো যুঁইয়ের ঝোপের আড়ালে একখানি বেঞ্চির উপর অন্যমনস্কভাবে সে বসে আছে। মনটা তার বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। আবার নতুন করে তার বাবার কথা মনে পড়ল—মনে পড়ল এই বিবাহে তার দ্বিধার কথা, তাঁর দাদার যুক্তি-জালের কথা। কিন্তু মা রুদ্ররূপ ধারণ করলেন। ভালমানুষ বাবা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। শ্রীমতী এল এগিয়ে হাসিমুখে। বরণ করল অতনুকে। হলেই বা অতনু ধনী আর তার বাবা দরিদ্র স্কুলমাষ্টার। অর্থের প্রভেদ কখনও মানুষকে আড়াল করে রাখতে পারে না। বাবার কাছে সে একেবারে মিথ্যা শিক্ষা পায় নি। তার সহিষ্ণুতা, প্রেম আর সেবা দিয়েও কি এই কৃত্রিম দূরত্বকে এবং ব্যবধানকে জয় করতে পারবে না?

সূর্য্যদার কথাও তার একই সঙ্গে মনে পড়ছে। কিন্তু তাকে নিয়ে শ্রীমতীর কোনদিনই দুশ্চিন্তা ছিল না। আজও নেই। এই কাজের লোকটির মধ্যে চিরদিনই সে সূক্ষ্ম বোধের একান্ত অভাব লক্ষ্য করেছে—শুধু কাজ আর কাজ। এই কাজ-পাগলা লোকটিকে তাই সে বন্ধুভাবে সাহায্য করেছে—তার নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করে। সূর্য্যদাকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা করেছে, কিন্তু তাকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখেনি। কিন্তু তার দাদা সহজ পথে চিন্তা করতে পারে নি বলেই তার বিবাহের কথায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তার মনে একটা মধুর কল্পনা বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু শ্রীমতী তার সম্বন্ধে

অন্য চিন্তা পোষণ করত। পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে অকারণে দেহ ও মনকে ক্ষতবিক্ষত করাটা সে পছন্দ করতে পারে নি। তবুও আজ এই নিরালা লতাকুঞ্জে বসে আবার নতুন করে তার মনে হ'ল, তার হিসাব করতে কোথাও হয়ত একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। হিসাব মিলাতে যদিও তার যত্নের ত্রুটি নেই, তথাপি বারে বারে অক্ষরগুলির উপর কালি ঢেলে পড়ে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

এই বাগানটির এই বিশেষ স্থানটির উপর শ্রীমতীর প্রবল আকর্ষণ। কথাটা সকলেই জানে। মালী প্রাণপণে বাগানের পরিচর্য্যা করে। কখনও সামনে দাঁড়িয়ে কখনও শয়নঘর থেকে শ্রীমতী চেয়ে চেয়ে দেখে, মাঝে মাঝে নিজেও সে হাত দিতে চায়— মালীকে নানা প্রশ্ন করে। মালী সহজকে জটিল করে কর্ত্রীকে বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম্ম হয়ে যায়। পাছে এ বাড়ীর রীতিনীতির গায়ে আঁচড় লাগে সেইজন্যই এই পথে তাকে চলতে হয়। শ্রীমতী তার বাবাকে জোর গলায় বলেছিল যে, তাঁর দেওয়া শিক্ষাই শ্রীমতীকে জয়যুক্ত করবে। তার এত বড় অহঙ্কারকে সে মিথ্যে প্রতিপন্ন হতে দেবে না, নইলে সে তার বাবার কাছে কোনদিনই গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

শ্রীমতী লতাকুঞ্জ থেকে বের হয়ে এল। আকাশে সূর্য্য দেখা দিয়েছে। খানিক কাঁচা রোদ বাগানময় ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীমতী অন্যমনস্কভাবে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। কখন মালী এসে তার কাজে হাত লাগিয়েছে তা পর্য্যন্ত সে লক্ষ্য করে নি। অতসুর টেরিয়ারটাও ছাড়া পেয়েছে। হেমন্তের মিঠে ঠাণ্ডায় অসুখ হতে পারে। তাই ওর গায়ে সময়োপযোগী একটা জামা উঠেছে। কুকুরের উৎফুল্ল চীৎকারে শ্রীমতী সজাগ হয়ে উঠল। নীচু হয়ে কুকুরটার পিঠে বারকয়েক মৃদু চাপড় দিতেই সে ছুটে বাগানের অপর প্রান্তে চলে গেল। মালী ওখানে বসেই গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিচ্ছিল। মালী কাজ বন্ধ করে কুকুরটাকে আদর করল। চুরি করে কুকুরের গায়ের জামাটা হাত বুলিয়ে অনুভব

করে দেখল। কাপড়টা বড় ভাল—কর্ত্তাবাবুর কুকুরটা বড় আদরে আছে। কোন অভাব রাখেন নি তিনি।

ওপাশ থেকে মালী-বৌয়ের সরোষ চীৎকার শোনা গেল, মিন্‌সের নবাবী দেখে আর বাঁচিনে। সহসা বাগানের অপর প্রান্তে শ্রীমতীর পানে তার দৃষ্টি পড়তেই সে বোবা হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ, কথাটা বলে বসলেই হয়েছিল আর কি! তার কথা বন্ধ হয়ে গেলেও সে কিছু একটা ইসারা করল মালীকে। মালী দেখেও দেখল না। শ্রীমতী কিন্তু তার এই নীরব সঙ্কেত লক্ষ্য করল। সে ধীরে ধীরে মালী-বৌয়ের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল, মালী তোমার কথা শুনছে না বুঝি?

মালী-বৌ সসঙ্কোচে বলল, দেখুন ত রাণীমা—এই পিরানটা পরে ঘর থেকে এল আর···। কথাটা সে শেষ করল না—শেষ করে দিল শ্রীমতী। একটু হেসে বলল, আর এখন দেখছ মালী খালি গায়ে কাজ করছে। ভারী অন্যায় কথা, এই হিমে একটা অসুখ-বিসুখ করলে তখন দেখবে কে! কিন্তু জামাটা তুমি পেলে কোথায়?

ঘরের দাওয়ায় রাণীমা। জামাটা সেলাই করতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই মিনসের—। মালী-বৌ জিভ কেটে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

মালীর কোন দিকে খেয়াল নেই, ঘাড় গুঁজে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে। কুকুরটা তখনও বাগানময় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। শ্রীমতী আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না, লজ্জা আর সঙ্কোচ তাকে চতুর্দ্দিক থেকে চেপে ধরেছে। সে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায়, কুকুরটাও অনতিবিলম্বে তাকে অনুসরণ করে।

খাবার টেবিলের পাশে বসে তাদের আহার্য্যের ভাগ নেওয়াটা ওর নিত্যকার অভ্যাস।

শ্রীমতী ফিরে আসতেই সামনাসামনি অতনুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আজও তার বেশ সকালেই ঘুম ভেঙেছে। শ্রীমতী পাশ

কাটিয়ে ভিতরে যাচ্ছিল, অতনুর আহ্বানে সে ফিরে দাঁড়াল। বলল, কিছু বলবে আমাকে ?

হ্যাঁ। অতনু জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

লতাকুঞ্জে, শ্রীমতী জবাব দিল।

অতনু একটু হেসে বলল, না মালী-বৌর সঙ্গে গল্প করতে ব্যস্ত ছিলে ?

এক ঝলক রক্ত তার মুখের উপর ছুটে এল। মনটা তার বিষিয়ে উঠল, কিন্তু মনের বিরাগ তার কথায় প্রকাশ পেল না। সে একটু হাসবার চেষ্টা করেই বলল, পিছু নিয়েছিলে বুঝি ? তুমি ঠিকই ধরেছ, মালী বৌয়ের সঙ্গেই গল্প করছিলাম। কোন দোষ করেছি কি ?

অত্যন্ত সহজ উত্তর—অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু এর একটা সহজ জবাব অতনুর মুখে জোগাল না।

শ্রীমতী হাসিমুখে পুনরায় বলল, জবাব দিচ্ছ না কেন ? আমাকে সব জেনে নেবার সুযোগ দেবে ত, নইলে কখন আবার না জেনে কি অন্যায় করে বসব !

অতনু সংক্ষেপে বলল, এসব কথা এখন থাক।

শ্রীমতী বলল, যে কথা একবার সুরু করেছ সেটা শেষ না করলে আমার মন খুঁতখুঁত করবে। তুমি বল, আমাকে সব কথা জানতে দাও।

যার যতটুকু পাওনা—, অতনুর কণ্ঠে খানিকটা প্রচ্ছন্ন আদেশ, সে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, যার যতটুকু প্রাপ্য তার বেশী দিতে গেলে সে মাথায় উঠে বসতে চায়। মালী-বৌ মালী বৌ আর তুমি তুমি।

শ্রীমতী পুনরায় হেসে জবাব দিল, এ আর নতুন কথা বললে কি ? কিন্তু মাথায় ওঠার কথাটা আমি স্বীকার করি না। তবে মালী-বৌ যে শুধু মালী-বৌ তা সে নিজেও তোমার চেয়ে বেশী করে জানে। দেখলে না আমার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো সাধারণ প্রশ্নের

জবাব দিতে পর্য্যন্ত পারলে না? এমনিতেই ওরা নিজেদের কাছে ছোট হয়ে আছে। বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

খুশী হলাম শুনে, অতনু গম্ভীর গলায় বলল।

শ্রীমতী অতনুর জবাব শুনে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য হ'ল না—এমনি জবাবই সে প্রত্যাশা করেছিল। তবুও সে থাম্‌তে পারল না। মৃদুকণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি খুশী হতে পারি না এদের মনোবৃত্তি দেখে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে মনটা ছোট হবে কেন, কোন কাজই ছোট নয়।

অতনু প্রশ্ন করল, তুমি কাজ বলতে কি মনে কর?

শ্রীমতী হেসে জবাব দিল, অকাজ বা কুকাজ নয়—আমি শ্রমের কথা বলতে চাইছি। কিন্তু দেখ দেখি, কথায় কথায় চায়ের দেরী হয়ে গেল—চল।

১৩

ডাক্তারবাবু ঘরে প্রবেশ করতেই শ্রীমতী সহাস্যে এগিয়ে এসে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, আমি না ডাকলে বুঝি একবারও আসতে নেই? আপনি এলে যে আমি কত খুশী হই তা আপনি জানেন না ডাক্তারবাবু।

স্মিতহেসে ডাক্তারবাবু বললেন, আমারই কি আমার মাকে রোজ একবার দেখতে ইচ্ছে হয় না? কিন্তু কর্ত্তব্য আমাকে ঠেকিয়ে রাখে। যে সব দুর্ভাগা রুগী-রুগিণীরা পথ চেয়ে বসে থাকে তাদের প্রয়োজনের কথা মনে হ'লে অন্য সব কথা ভুলে যাই মা।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, ওরই ফাঁকে আমার কথাও একটু মনে রাখবেন। আমারও খুব প্রয়োজন।

শ্রীমতীর মুখের পানে খানিক স্নেহভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, কিন্তু ওদের সঙ্গে তার তুলনাই

হয় না। তাই নিজের কথাটা সময়মত মনেই আসে না। তাছাড়া তুমি যা নও তা কেমন করে ভাবি বলত মা।

শ্রীমতী গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, কোনদিন ওজন করে দেখেন নি বলেই একথা বলতে পারছেন। একদিকে উদ্বৃত্ত অপর দিকে সমপরিমাণ শূন্যতা। অঙ্ক কষে দেখুন, ফল শূন্যই হবে।

ডাক্তারবাবু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, আমি তর্কের কথা বলছি না, অনুভূতির কথাটা তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি মা।

শ্রীমতী বলল, সেইজন্যেই ত বিশ্বাস করতে বলছি। ওর মুখে হাসি দেখা গেল।

ডাক্তারবাবু খানিক প্রসন্ন দৃষ্টিতে শ্রীমতীর মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, তোমার কিন্তু স্কুলমাষ্টারের মেয়ে না হয়ে উকিলের মেয়ে হওয়া উচিত ছিল। তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পারব না মা, ওতে মিথ্যে দুঃখ বাড়বে। তার চেয়ে বিশ্বাস করা ঢের সোজা। তাতে অনেক আনন্দ।

জানেন ডাক্তারবাবু— শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল, আমি যদি এ বাড়ীর মালিক হ'তাম তাহলে সব সময়ের জন্য আপনাকে এখানে ধরে রাখতাম।

ডাক্তারবাবুর দৃষ্টিতে নীরব জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল। কিন্তু সোজা কোন প্রশ্ন না করে ঘুরিয়ে বললেন, তুমি ধরে রাখতে চাইলেও আমি যে তোমার অবাধ্য হতে পারব না একথা তোমায় কে বললে মা?

শ্রীমতী সহসা উঠে এসে ডাক্তারবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল। তাঁর চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, আপনার অনেক চুল পেকেছে ডাক্তারবাবু। জানেন, বাবার পাকা চুল বেছে দেওয়া আমার প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাজের একটা বলে আমি মনে করতাম।

শ্রীমতী থামল। অন্যমনস্কভাবে তাঁর চুলগুলি নাড়াচাড়া

করতে করতে মৃদুকণ্ঠে বলল, আপনি বলছিলেন যে, আমি চাইলেই কি আমার ইচ্ছা পূরণ হবে? এ কথার সত্যিই কি কোন মানে আছে? আমি কিন্তু ওকথা স্বীকার করি না। বরং বিশ্বাস করি যে, চাইবার মত করে চাইতে জানলে পাওয়াটা মোটেই শক্ত নয়।

ডাক্তারবাবু হাত বাড়িয়ে শ্রীমতীকে পিছন থেকে সামনে টেনে এনে বললেন, বড় ভাল কথা বলেছ মা। লাজ, মান, ভয় আর দ্বিধা ত্যাগ করে চাইতে জানলে কোথাও কোন গোল দেখা দেয় না।

শ্রীমতী খিলখিল করে হেসে উঠে স্মিতকণ্ঠে বলল, উকিলের মেয়ে হওয়ার চেয়ে আমার কিন্তু আপনার মেয়ে হতে লোভ বেশী।

ডাক্তারবাবু পরম স্নেহে একখানি হাত শ্রীমতীর মাথার উপর রেখে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, পাগলী মেয়ে—একটু থেমে, একটু হেসে তিনি পুনরায় বলেন, এটাই বা মন্দ হয়েছে কি?···

শ্রীমতী বলল, জোর করতে পারি নে যে—

ডাক্তারবাবু বললেন, এখন যদি না পার তাহলে তখনও পারতে না মা।

শ্রীমতী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, নিশ্চয় পারতাম।

বারকয়েক মাথা নেড়ে ডাক্তারবাবু বললেন, তাহলে এখন পারতেই বা বাধা কোথায়?

আপনি স্বীকার করছেন যে, বাধা কোথাও নেই? শ্রীমতী পাল্টা প্রশ্ন করল।

ডাক্তারবাবু কৌতূকপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, ঐরে, আবার সেই জেরায় পড়লাম! কিন্তু ওটা আমার জিজ্ঞাসা। উত্তর নয়।

শ্রীমতী উচ্ছ্বসিত হেসে বলল, আপনি কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছেন।

উঁহু—ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, তাতে আমার নিজেরই সবচেয়ে বেশী লোকসান মা।

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, এতক্ষণে তুটো ভাল কথা শোনা গেল। আমার মনের মত কথা।

ডাক্তারবাবু প্রাণভরে হাসতে থাকেন।

শ্রীমতী সহসা অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, আপনাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল কেন একথা এখনও কিন্তু জিজ্ঞেস করেন নি।

ডাক্তারবাবু মুখে একপ্রকার শব্দ করে মৃতুকণ্ঠে বললেন, অপরাধ নিও না মা। বেশী কথা বলার দোষই এই। কিন্তু তোমার শরীর ভাল আছে ত? ঔষধপত্র ঠিকমত খাচ্ছ ত?

শ্রীমতী নিরীহগলায় জবাব দিল, শরীর আমার খুব ভাল আছে, ঔষধপত্র একেবারেই খাই না। খেতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু সেজন্য আপনার স্মরণাপন্ন হই নি আমি।

ডাক্তারবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন, খুব অন্যায় কথা এটা। তোমাকে আমি ভাল মেয়ে বলেই জানতাম। তোমার এ অবাধ্যতা আমি আশা করতে পারি নি। তোমার অনুরোধে খবরটা এখনও অতনুবাবুকে আমি দিইনি, কিন্তু আমার অবাধ্যতা করলে শেষ পর্য্যন্ত আমাকেও অবাধ্য হ'তে হবে তা বলে রাখছি মা।

শ্রীমতী কোন জবাব না দিয়ে চোখেমুখে খানিকটা বিমর্ষভাব ফুটিয়ে তুলে নীরবে বসে রইল।

তার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে ডাক্তারবাবু একটু যেন উত্তেজিত কণ্ঠেই বললেন, তোমার উপর আমার কতখানি ভরসা তা যদি তুমি জানতে মা তা হলে কখনই এমন—অত্যন্ত দ্রুতগামী শিক্ষিত ঘোড়া এগিয়ে চলতে চলতে সম্মুখে অতল গহ্বর দেখে যেমন করে সম্মুখের তু'খানি পা তুলে আপন গতি রোধ করে—ডাক্তারবাবুও ঠিক তেমনি করে কথার মাঝে থমকে দাঁড়ালেন।

তাঁর এই আকস্মিক ভাবান্তরে শ্রীমতী বিস্মিত হ'ল। এবং বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, আপনি কার কাছে কি ভরসা করেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু ইতিমধ্যেই সামলে নিয়েছেন। তিনি হেসে

বললেন, এটাও বেশী কথা বলার দোষ মা। মাত্রা থাকে না। নইলে এতবড় একটা গোপন কথা কেউ প্রকাশ করতে উদ্যত হয়?

শ্রীমতীর চোখে একরাশ প্রশ্ন। ডাক্তারবাবুর বক্তব্যটা রীতিমত গোলমেলে।

ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করলেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি ততক্ষণে অন্য কথায় চলে গিয়েছেন, এই অবস্থাটা মেয়েদের জীবনের একটি বাঞ্ছিত স্বাভাবিক পরিণতি বলেই তাকে বিন্দুমাত্র অবহেলা করা উচিত নয়। আমরা উন্নত বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও যদি বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে না চলতে চাই তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি থাকতে পারে মা?

শ্রীমতী এতক্ষণে মৃদু হেসে বলল, শুধু পরিতাপের কথা নয়—ঘোরতর অন্যায় করা হবে ডাক্তারবাবু। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আপনার আদেশ এবার থেকে আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কিন্তু এর সঙ্গে আপনার নিজের আশা-ভরসার কি সম্বন্ধ তা ত বললেন না?

ডাক্তারবাবু সহসা গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তিনি গভীর আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, কেন এ কথাটা বলেছি তা আমিও ঠিক জানতাম না। বোধ হয় আমার অজ্ঞাতেই মনের মধ্যে বাসা বেঁধে ছিল। অসতর্ক মুহূর্ত্তে আপনিই প্রকাশ পেয়েছে। জান মা, জীবনের অনেকগুলি বছর পিছনে ফেলে এসেছি বটে, কিন্তু কোনদিন এমনি করে সেদিকে ফিরে তাকাই নি। ভাবতাম, বেশ ত চলে যাচ্ছে। যাচ্ছিল ঠিকই। আজ কিন্তু মনে হচ্ছে ওর মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক ছিল। যে ফাঁক বোজাতে আমার মন খুঁজে ফিরছিল বন্ধন। তাই মানুষের সেবাকে আমি ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করেছি। অথচ সে পথে আমার মনের ক্ষুধা পরিপূর্ণ ভাবে মিটছে না। এ আমি টের পেয়েছি।

শ্রীমতী উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, আপনার আজ কি হয়েছে ডাক্তারবাবু? আপনার শরীর খারাপ নয় ত?

ডাক্তারবাবুর মুখে স্নিগ্ধ একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। তিনি স্মিতকণ্ঠে বললেন, বোধ হয় তোমার কথাটা মিথ্যে নয় মা। এ একটা মনের ব্যাধি এবং এতবড় ব্যাধি বুঝি জীবজগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রকৃতির নিয়ম। যে নিয়মের মধ্যে আমিও দিনের পর দিন আটকে যাচ্ছি।

ডাক্তারবাবুর কথাগুলির মধ্যে কিসের ইঙ্গিত শ্রীমতী তার সন্ধান পায় না, কিন্তু শুনতে বড় ভাল লাগছিল। তিনি থামতেই মৃদুকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, কি সে নিয়ম ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু শান্ত হেসে বললেন, কেন মা—বন্ধনের মধ্যে মুক্তি। আনন্দময় মুক্তি। এই বাড়ীটিকে কেন্দ্র করেই আমি সেই মুক্তির সন্ধান করতে সুরু করেছি।

শ্রীমতী বলল, কিছু পেলেন কি?

পেয়েছি বৈকি মা। ডাক্তাববাবুব কণ্ঠস্বব গভীর আবেগে কেঁপে উঠল। তিনি কতকটা বিচলিত ভাবে বললেন, নিশ্চয় পেয়েছি। মা ছিল না মা পেয়েছি। মেয়ে ছিল না মেয়ে পেয়েছি। ওরে বেটি, তাই ত আমার এত ভয়, পাছে এই সুখটুকুও আমার ভাগ্যে না সয়!

ডাক্তারবাবুর কথার ধরনে শ্রীমতী বিচলিত হয়েছে মনে হ'ল। তার কণ্ঠস্বরেও সে ভাব প্রকাশ পেল। সে ছেলেমানুষের মত বলতে লাগল, নিশ্চয় সইবে কাকাবাবু। নইলে যাকে নিয়ে আপনার এত দুর্ভাবনা তার দিনগুলি যে একেবারেই অচল হয়ে পড়বে।

শ্রীমতী থামল। আশ্চর্য্য! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে স্বব তার নিজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তা যেন আর কারুব। শ্রীমতীব নয়। মুহূর্ত্তমধ্যে সামলে নিয়ে শ্রীমতী পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে উঠল, কিন্তু একটা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমাকে নিয়ে আপনার এই অকারণ উদ্বিগ্নতার হেতু কি?

ডাক্তার আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, বড় শক্ত প্রশ্ন মা।

নিজেই যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না, তা তোমাকে কেমন করে বোঝাব ? তবে খুব সম্ভব বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছি বলেই ভালটা কিছুতেই চোখে পড়ছে না।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, যে সংসারকে বড় বেশী আপন মনে করতাম সেই সংসারই আমাকে সবার চেয়ে বড় প্রতারণা করেছে, তাই তোমাদের কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখতে সুরু করেই আবার নতুন করে দিশাহারা হয়ে পড়েছি। পাছে আমার এ স্বপ্নটাও—

বাধা দিয়ে বিস্মিতকণ্ঠে শ্রীমতী বলল, এ কেমন কথা কাকাবাবু !

ডাক্তার বলেন, প্রশ্ন করো না, যুক্তি-বিচার করতেও যেও না, আমি জবাব দিতে পারব না। কিন্তু আপাততঃ আমার কাছে এটা একটা বড় সত্য—আমার বুকের জিনিস। রোগ আর রোগী নিয়ে দিন কাটত। ভাবতাম বেশ আছি, মন আমার ভরে আছে, আর কিছুই বুঝি আমার চাইবার নেই। সেই মনই আবার তোমাকে পাবার পর নতুন সুরে কথা কইতে সুরু করেছে।

একটু থেমে তিনি পুনশ্চ বলতে লাগলেন, যা এতদিন ধরে পেয়ে এসেছি তা সম্পূর্ণ নয়, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। যাদের নিয়ে মনের ক্ষিদে মেটাতে গেছি তারা আমাকে দেবতার মত ভক্তি করেছে, পূজো কবেছে, সম্মান দেখিয়েছে। কিন্তু যে পূজো দেবতার জন্য তাতে মানুষের মন ভরবে কেন ?

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, এটা ভালবাসার আর একটা দিক নয় কি কাকাবাবু ?

ডাক্তারবাবু বললেন, কি জানি মা কোন্ কথাটা ঠিক ! কিন্তু এমনি এক উঁচু আসনে বসে শুধু ভক্তি আর শ্রদ্ধা কুড়োতে আমার ভাল লাগে না। অথচ ওরা আমাকে কিছুতেই মাটিতে টেনে নামাতে পারে না। আমি অনেক পেয়েও তাই শূন্য হাতে ঘুরে বেড়াই।

শ্রীমতী বলল, এ ব্যবধানটুকু আপনি কি ইচ্ছে করলে দূর করতে পারেন না ?

ডাক্তারবাবু মৃদু স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, ইচ্ছে করলেই পারতাম কিনা তা জানি না, কিন্তু এই ইচ্ছেটারই ইতিপূর্ব্বে একান্ত অভাব ছিল।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে বলল, ভারী আশ্চর্য্য কথা, এতদিন যা চান নি, এমন কি তার প্রয়োজনবোধও করেন নি, আজই তা পাবার জন্য এত উৎসুক হয়ে উঠেছেন কেন ?

ডাক্তারবাবু কোমল কণ্ঠে বললেন, যদি বলি আমার মনের এই পরিবর্ত্তন তুমি ঘটিয়েছ, তা হলে কি তা তোমার বিশ্বাস হবে না ?

শ্রীমতী পুনরায় ডাক্তারবাবুর চেয়ারের হাতল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, অবিশ্বাস করতে পারব না সত্য, কিন্তু মনে আমার প্রশ্ন দেখা দেবে।

দেবার কথাও মা। ডাক্তারবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন, কৈফিয়ৎ দিচ্ছি না, কিন্তু প্রথম যেদিন তুমি আমায় নিজের হাতে রান্না করে সামনে বসে খাওয়ালে, সেইদিনই আমি সর্ব্বপ্রথম অনুভব করলাম—দূর ছাই, কি হবে আর নিজের মনকে নিয়ে এই লুকোচুরি করে। তার চেয়ে ঘরে ফিরে আমার মায়ের কোলে আশ্রয় নিই। মাঝপথে হঠাৎ থেমে কতকটা অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, কত বড় আহাম্মুকি দেখ দেখি মা ? একটু স্নেহের স্বাদ পেয়েই সব ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম যে, এ বাড়ীর আমি মাইনে-করা লোক, তার চেয়ে একটুও বেশী না।

এটা ঠিক কথা বলেন নি কাকাবাবু। শ্রীমতী বলল, আর কেউ না জানলেও আমি বুঝি এ বাড়ীর আপনি পরমাত্মীয়।

ডাক্তারবাবু ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তিবোধ করলেও মুখে তাঁর কথা জোগাল না।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, আমার এ ধারণা সন্দেহাতীত।…

ডাক্তারবাবু সহসা হো-হো করে হেসে উঠলেন। শ্রীমতী চমকে উঠল। তিনি বললেন, তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে ত সকলের চলবে না মা। ভাবের ঘোরে যত কথাই বলে থাকি, আর যত স্বপ্নই দেখে থাকি বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে তার কতটুকু মূল্য ?

শ্রীমতী স্নিগ্ধহেসে বলল, আপনি উল্টোপাল্টা কথা বলতে স্থরু করেছেন। কি যেন বলতে চান—আবার চানও না। আপত্তি যখন আছে তখন থাক, তবে একটা অনুরোধ যে, নিজেকে এভাবে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করবেন না, আমি খুব দুঃখ পাব।

ডাক্তারবাবু সহসা উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীমতীর দুই চোখের উপর এক জোড়া অনুসন্ধানা দৃষ্টি স্থাপন করে কিছু খোঁজ করলেন। রঙীন চশমার আড়ালের সে চাহনি শ্রীমতীর চোখে পড়ে না। সে হেসে বলে আপনি কি এখুনি চলে যাচ্ছেন কাকাবাবু? আর একটু বসবেন না ?

ডাক্তারবাবু পুনরায় হতাশভাবে বসে পড়লেন। শ্রীমতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে আমি তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম, লোভে পড়ে হয়ত আমার পতন হয়েছে। ছিলাম দেবতা, নেমে এসেছি মানুষের পর্য্যায়ে। মন খুশী হয়ে বলে, এই ত বেশ, চোখ দুটো চলে যায় উঁচু সিংহাসনের পানে। কত রঙের জেল্লা তাতে।

শ্রীমতী আবদারের সুরে বলল, আপনার এই ভক্তের দলকে একবাব দেখতে পাই না কাকাবাবু? তাদের একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। তারা কেমন মানুষ যে, এত অল্পে যে দেবতা তুষ্ট তার মনকেও ভরে দিতে পারছে না!

ডাক্তারবাবু আর একবার উচ্চ হেসে রহস্য-তরলকণ্ঠে বললেন, মন্ত্র জানা চাই মা—

শ্রীমতীও হাসিমুখেই জবাব দিল, না কাকাবাবু, শুধু মন্ত্রে কাজ

হয় না। তা হলে এত নৈবেদ্য আর উপচারের প্রয়োজন হ'ত না। আমি ওদের দীক্ষা দিয়ে আসব।

অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি কি এরই মধ্যে ভয় পেয়ে গেলে যে, ওদের আমার পিছনে লেলিয়ে দিতে চাইছ? তা হলে আমায় দেশত্যাগী হতে হবে মা, এ কথাটাও তোমাকে আগেভাগেই জানিয়ে রাখছি।

শ্রীমতী হাসতে লাগল।

ডাক্তাববাবু বললেন, তুমি হাসছ বটে, কিন্তু আমি মোটেই হাসির কথা বলি নি। ওদের চোখ ফুটিও না মা, দেবতা হয়ে আমি ববং ভালই আছি। ভক্তিব সঙ্গে খানিকটা ভয় জড়ান আছে। চেয়ে না পেলে বড় জোর মনঃক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু অপমান করে না, আঘাত পেলেও পালটা আঘাত করে না।

শ্রীমতী হেসে উঠে বলল, আপনি ত কম লোক নন! ভক্তিও চান—ভযও চান, আবার মন ভাল না বলে অনুযোগও দেন।

অনুযোগ দেব কেন মা। ডাক্তাববাবু স্মিতহাস্যে বললেন, আবার নিজেকেও মিথ্যে ফাঁকি দিতে চাই না। তুমি দীক্ষা দিয়ে আসতে চাও যেও, তবে যাবাব আগে বেশ কবে আগুপিছু ভেবে নিও। কিন্তু আজ আর নয়। ডাক্তাববাবু উঠে দাঁড়ালেন। চলতে চলতে পুনবায় শ্রীমতীকে তাব স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকার উপদেশ এবং নিয়মিত ঔষধ সেবনের প্রতিশ্রুতির কথা স্মবণ কবিয়ে দিয়ে ঘব ছেড়ে বেবিয়ে গেলেন।

১৪

কেষ্টর সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটি এসে বসবাব ঘরে প্রবেশ করল সে শ্রীমতীর সূর্য্যদা। তাকে বসতে বলে কেষ্ট অন্দবপথে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং অনতিকাল মধ্যে শ্রীমতী এসে উপস্থিত হ'ল। কোনপ্রকার ভূমিকা না করে শ্রীমতী বলল, কোন খবর না দিয়েই

উপস্থিত হয়েছ যে সূর্য্যদা। আগে একটা চিঠি পাঠালে না কেন?

সূর্য্য নীরসকণ্ঠে জবাব দিল, তাতে আর এমন কি লাভ হ'ত?

শ্রীমতী একটু থতিয়ে গিয়ে উত্তর দিল, অন্ততঃ স্টেশনে একটা গাড়ী পাঠাতে পারতাম। তাতে কুটুমের মর্য্যাদা থাকত।

সূর্য্য বলল, আমি তিনদিন আগে এসেছি, এবং এই তিনদিন ধরেই একবার করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছি।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে বলল, আমায় খবর পাঠাও নি কেন?

সূর্য্য একটু হেসে জবাব দিল, এ বাড়ীর সঙ্গে অতটা বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে চাইনি বলেই—

শ্রীমতী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার সূর্য্যের মুখের পানে চেয়ে দেখে মৃদুকণ্ঠে বলল, সেইজন্যই বুঝি চিরকুট পাঠিয়েছিলে? চাকরটা ঠিক বুঝেছে, তাই তোমাকে বাইরে বসিয়ে আমাকে খবর দিতে গেছে। আমি আবার অতটা তলিয়ে বুঝি নি, তাই তাকে অনর্থক গালমন্দ করে নিজেই ছুটে এসেছি। থাকগে ওসব কথা—কিন্তু একটা বিষয় আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না যে, গত তিনদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেও ফিরে চলে গেছ কেন? আমি ত বাড়ীতেই ছিলাম।

সূর্য্য একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, এই সাধারণ কথাটা তোমার বোঝা উচিত ছিল। নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে দেখা করাটাই আমার ইচ্ছে ছিল। আমাদের মধ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা এ বাড়ীর অপর কাউকে আমি জানাতে চাইনি বলেই ফিরে গেছি।

শ্রীমতী লাল হয়ে উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, বড় অদ্ভুত আর নতুন কথা শোনাচ্ছ তুমি সূর্য্যদা। আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে কোন লুকোচুরি ছিল বা আছে বলে আমি আজও মনে করি না, কোনদিন করতামও না।

সূর্য্য একটু যেন চমকে উঠেছে মনে হ'ল। অত্যন্ত সংযতভাবে শ্রীমতী কথা ক'টি বললেও তার মধ্যের প্রচ্ছন্ন-ব্যঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য

তাকে নির্ব্বাক্ করে দিল। কিন্তু অল্পেই সে ভাব কাটিয়ে উঠে যথাসম্ভব কোমলকণ্ঠে সূর্য্য বলল, কথার লড়াই থাক শ্রী। কথা চিরদিনই তুমি খুব ভাল বলতে পার, তার চেয়ে দুটো কাজের কথা বলে আমি বিদায় নিচ্ছি। সময় আমার অত্যন্ত কম।

শ্রীমতী তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, সে ত দেখতেই পাচ্ছি। বল কি তোমার বক্তব্য।

সূর্য্য বলল, তোমাকে অন্ততঃ চারখানা চিঠি দিয়েছি, তার একটারও জবাব দাও নি কেন?

শ্রীমতী স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, সময় হলেই জবাব পেতে—

সূর্য্য অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও তোমার সময় হ'ল না?

শ্রীমতী বক্রকণ্ঠে বলল, তুমি ত শুধু চিঠির জবাব প্রত্যাশা কর নি সূর্য্যদা, তুমি জানিয়েছ দাবী। যাঁরা আমার কুশল জানতে চেয়েছেন তাঁদের আমি সময়মত জবাবও দিয়েছি। তুমি নতুন সুরে কথা কইতে সুরু করেছিলে বলেই আমি নীরব ছিলাম।

সূর্য্য উষ্ণকণ্ঠে বলল, আমার দাবীটা কি খুবই অসঙ্গত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? আমি জানতে চাই যে, আমি কি শ্রীমতীর সঙ্গে কথা কইছি না আর কেউ তার হয়ে কথা বলছে?

তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে সূর্য্যদা? শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

সূর্য্য তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলে চলল, তোমার কথার ধারাই আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করিয়েছে। আমি না হয় কোন কথাই বলব না, কিন্তু তুমি নিজেকেই একবার জিজ্ঞেস করে দেখ ত?

শ্রীমতী হেসে উঠল, তুমি কি আমায় আজও এতই ছেলেমানুষ মনে কর? অনেক ভেবেচিন্তেই একথা তোমাকে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি। তুমি টাকার দাবী এই কি প্রথম করলে?

শ্রীমতীর কথার ধরনে সূর্য্য আরও বিস্মিত হ'ল। এটা সে ঠিক

কল্পনা করে উঠতে পারে নি। সে বলল, বার বারই তুমি টাকা দাবীর উল্লেখ করছ, কিন্তু আমি যে আমার নিজের জন্য একটি কানাকড়ির প্রত্যাশী নই, একথা তোমার চেয়ে বেশী আর কে জানে ?

আমি কতখানি জানি আর তোমার কতটুকু প্রয়োজন সে প্রশ্ন আজ থাক সূর্য্যদা। শ্রীমতী একটু থেমে বলল, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার এমন কিছু নেই যা তোমার কোন উপকারে আসতে পারে।

খানিকটা অবিশ্বাসের হাসি সূর্য্যর মুখে দেখা দিল। সে বলল, এ অসম্ভব কথাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল ? যার স্বামী এত পয়সার মালিক তার হাতে কিছু নেই !

তাকে বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, থাম সূর্য্যদা। আমার স্বামীর অনেক টাকা থাকতে পারে তাতে আমার কি ?

সূর্য্য গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তুমি স্বামীব স্ত্রী নও ? সেখানে তোমাব কোন অধিকাব নেই এই কথাই কি আমাকে আজ বিশ্বাস করতে হবে ?

শ্রীমতী হেসে উঠল।

সূর্য্য বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, তুমি হাসছ ?

হাসির কথা বলেই হাসছি সূর্য্যদা। শ্রীমতী বলল, আমাকে যখন তুমি স্বামীর স্ত্রী বলেই জান তখন তার টাকা চুরি করে তোমার হাতে তুলে দিতে বল কোন যুক্তিতে ?

সূর্য্য উষ্ণকণ্ঠে বলল, আমার কাছে অন্য কোন যুক্তি নেই— আমার যুক্তি হ'ল দেশের মঙ্গল করা।

শ্রীমতী উত্তাপহীন কণ্ঠে বলল, কিন্তু এই পথে যে মঙ্গল আসবে তা তোমায় কে বলল ?

সূর্য্য রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে উঠে বলল, আমি বলছি তোমায়—

শ্রীমতী তেমনি শান্ত-স্থিরকণ্ঠে বলল, তুমি যে অভ্রান্ত সে কথা যদি আমি স্বীকার করে না নিতে পারি—

সূর্য্য তীব্রকণ্ঠে বলল, কিন্তু একদিন করতে। তার মুখ কাল হয়ে উঠল।

শ্রীমতীর মধ্যে কোন চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হ'ল না। সে তেমনি ধীরকণ্ঠে বলল, তখন বুদ্ধি কম ছিল—উত্তেজনা ছিল বেশী। তলিয়ে দেখবার আগেই লাফিয়ে উঠতাম। সূর্য্যদা, যে পথে চলেছ তা ছাড়। এ পথে মঙ্গল নেই।

শ্রীমতীকে থামিয়ে দিয়ে সূর্য্য বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলল, আমি তোমার কাছে উপদেশ নিতে আসিনি শ্রীমতী।

সে আমি জানি সূর্য্যদা। শ্রীমতীর কণ্ঠে এতক্ষণে বিরক্তি ফুটে উঠল। সে বলল, তুমি টাকা চাও—আমি জানিয়েছি আমার অক্ষমতা—টাকা আমার নেই। চুরি করে টাকা দিতে আমি কোনদিনই পারব না।

সূর্য্য জ্বলে উঠল, কথাটা চিঠিতে জানিয়ে দিলে পারতে, তা হলে তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে আসতে হ'ত না।

শ্রীমতী অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, তুমি এত বোঝ আর এই সামান্য কথাটা বুঝলে না? জবাবটা চিঠিতে দেওয়া আমি পছন্দ করি না।

সূর্য্য জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শ্রীমতীর মুখের পানে চেয়ে থেকে গর্জ্জন করে উঠল, এত অবিশ্বাস! তার সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপতে সুরু করেছে।

শ্রীমতীও এতক্ষণে ধৈর্য্য হারাল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, ঠিক তাই। তুমি কি মনে কর একমাত্র তুমিই পৃথিবীতে বুদ্ধিমান? তোমার মত এবং পথ যে একেবারে বদলে গেছে তা আমি জানি না মনে কর? তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার জানা। তোমাকে অপমান করে বিদায় করতে আমায় বাধ্য করো না। তুমি চলে যাও, আমাকে আমার মত করে বাঁচতে দাও।

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়তে সে থামল। একটু কি চিন্তা করে পুনরায় বলল, হ্যাঁ, ভাল কথা। একেবারে খালি হাতে

তোমাকে বিদায় করতে আমি পারব না। বস, আমার বলতে যা আছে এনে দিচ্ছি। গ্রহণ করে আমাকে ধন্য কর।

শ্রীমতী দ্রুত ঘর ছেড়ে সোজা তার শয়নকক্ষে চলে এল, এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে আব একবার নতুন করে তার দাদার লেখা চিঠিখানা পড়তে বসল। এই একটি সপ্তাহে অন্ততঃ দশবার সে চিঠিখানা পড়ে ফেলেছে।

অরুণেব চিঠি—

শ্রী,

তোমার চিঠি পেয়েছি। সূর্য্যদা তোমাব কাছে চার পাঁচবার টাকার জন্য চিঠি দিয়েছেন লিখেছ। যেটা শুধু অনুরোধ করা চলে সেইটেই তিনি দাবী কবেছেন। এটা সূর্য্যদাব পক্ষেই সম্ভব। তোমার বিয়েব পরে বাবে বাবে তাব বং বদলাচ্ছে। তার মত এবং পথ আগাগোড়া বদলে গেছে। আদর্শবাদ আজ আত্মস্বার্থেব যূপকাষ্ঠে তিনি বলি দিয়েছেন। আলোর চেয়ে অন্ধকাবেব ভক্ত হয়ে পড়েছেন। ঐ পথেই চলেছে তাঁব সাধনা।

সত্য কথা শুনতে অত্যন্ত কটু হলেও তা সব সময়ই সত্য। সূর্য্যদা এতদিন তার সাবাদেহে সমাজসেবাব বর্ম্ম এঁটে সম্পদের স্বপ্ন দেখেছেন। একদিন তাকে ঠাট্টার ছলে বলেছিলাম, এমন কোনদিন ভাবতেও পাবি নি দাদা। অর্থেব প্রতি এমন তীব্র আসক্তি—আপনাব মত লোকের! কালোবাজারেব কাল বং যে আপনার উজ্জ্বল বর্ণকে বিবর্ণ করে ফেলেছে।

সূর্য্যদা নির্লজ্জের মত হেসে জবাব দিলেন, ওটা কাঁচা রং অরুণ, ধুয়ে ফেললেই উঠে যাবে।

আঘাত দেবাব জন্যই আমি বললাম, না টাকাব জেল্লায় ঢাকা পড়বে?

সূর্য্যদা এতেও লজ্জিত হলেন না। বললেন, তাতে দেহের ময়লা রংটাই ঢাকা পড়বে, কিন্তু মনের মালিন্য ঘুচবে কেমন করে? বোকা ছেলে—যে টাকা আমি রোজগার করেছি তা আমি না নিলে

আর কেউ সরিয়ে ফেলত, অথচ তুমি জান টাকার আমার কত দরকার। টাকা ছাড়া কোন কাজ হয় না। সে তোমার সমাজ-সেবাই বল আর রাজনীতিই বল।

বিস্মিত এবং ব্যথিত হলাম। এতদিন ধরে যা-কিছু দেখেছি আর বুঝেছি তা কি আগাগোড়াই ভুল হতে পারে। কিন্তু নিজের চোখ আর কানকে অবিশ্বাস করি কেমন করে! তা ছাড়া কথাটা যখন সূর্য্যদার নিজের মুখ থেকে শোনা।

সূর্য্যদা আমাকে নীরব দেখে পিঠ চাপড়ে বললেন, জীবনের অনেকখানি সময় নিঃস্বার্থভাবে লোকের সেবা করে পেলাম কি বলতে পার অরু?

জবাব দিলাম, কেন আত্মতৃপ্তি!

সূর্য্যদা বিজ্ঞের মত হেসে বললেন, ওতে পেট ভরে না—মন ভরতে পারে। ওরে অরু, আজকের দুনিয়ায় লোকে ফাঁকি দিয়ে ফাঁক বোজাতে চায়।

জিজ্ঞেস করলাম, তাতে কি সত্যিই ফাঁক বুজে যায় দাদা? না সেই সামান্য ফাঁক বিরাট গহ্বরে পরিণত হয়?

সূর্য্যদা হেসে বললেন, ওটা কথার মারপ্যাঁচ অরু। এ শুধু বালির পলস্তারা দিয়ে ক্ষয়ে-যাওয়া ইটের স্বরূপ ঢেকে রাখা।

বললাম, ক্ষয়ে যাওয়া ইটের জীবনীশক্তি তাতে কিছুই কি বৃদ্ধি পায় না দাদা?

সূর্য্যদা হেসে বললেন, ওটা আরও মারাত্মক অরুণ। যা ক্ষয়ে গেছে তাকে শেষ হয়ে যেতে দাও। তাতে দেশের এবং দশের মঙ্গল হবে। সে যা তা সকলকে দেখতে দাও, জানতে দাও। তার বিষাক্ত আর দূষিত স্পর্শ থেকে সরে গিয়ে বাঁচবার সুযোগ পাক তারা—যারা অন্ততঃ বাঁচতে চায়।

সূর্য্যদার বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাকে বুঝতে আজ আর কষ্ট হচ্ছে না শ্রী। আমি কিন্তু তার বর্ত্তমান রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেছি। সে যেন তার অতীত জীবনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা

করেছে। তার নীতিবোধ, চারিত্রিক নিষ্ঠা, আদর্শবাদ সবকিছুই বিসর্জ্জন দিয়েছে। সাঁওতাল পল্লীতে পূর্ব্বেও ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে, তার যে হাত একদিন ওদের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বেলে দিতে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই হাতেই নিজের জ্বালা আলো তিনি নিভিয়ে দিয়ে তাদের আরও নিরন্ধ্র অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেছেন। প্রথমে ওরা হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারে নি তাঁর আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু জানতে পারল চরম সর্ব্বনাশ ঘটে যাবার পরে। ভুলুয়া সর্দ্দারের মেয়ে লছমিয়াকে নিয়ে তিনি যে কাণ্ডটি করেছেন তা কল্পনা করতেও মন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। সূর্য্যদা শেষ পর্য্যন্ত পালিয়েছেন। সম্ভবতঃ এ তল্লাটে আর আসবেন না। না এলেই ভাল হয়।

সূর্য্যদা নাকি অনেক টাকা রোজগার করেছেন শুনতে পাই। কয়লাখাদের বড়কর্ত্তাদের কাছ থেকে নিয়মিত তিনি প্রচুর পেয়েছেন। সেবার নামে এ শঠতা অমার্জ্জনীয়। সূর্য্যদাকেও তাই কেউ ক্ষমা করতে পারে নি। ভুলুয়া টাঙ্গি হাতে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের বাড়ীর আনাচে-কানাচেও তাকে দেখা যায়। মুখে স্বীকার না করলেও আমাদের উপরও তার একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ওকে দোষ দিচ্ছি না। আমরাও একসময় তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলাম—তাঁর কাজের সঙ্গী ছিলাম।

তোমাকে এত কথা জানাতাম না শ্রী, কিন্তু আমি খবর পেয়েছি যে, সে এখন কলকাতায় আছে। যদি কোনদিন কোন কারণে তোমার সঙ্গে দেখা করে তার দাবী নতুন করে জানাতে চায় তা হলে এই খবরটা তোমার উপকারে আসবে।

সব দেখেশুনে বাবা কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সূর্য্যদা তাঁরই একজন বিশ্বস্ত ছাত্র, একান্তভাবে তাঁরই হাতে গড়া, তাই বোধ হয় এতবড় আঘাত পেয়েছেন। বাবার মুখের পানে তাকান যায় না। তিনি বলেন, এমন ত কোনদিন ভাবতে পারি নি অরুণ। এতদিন ধরে এত কষ্ট আর এত সাধনা করে যা কিছু

সে অর্জ্জন করল তাকে এমন নির্দ্দয় ভাবে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিল সে কিসের লোভে ? টাকার তার কিসের প্রয়োজন ? আর প্রয়োজন যদি ছিলই তবে এ পথে এল কেন ? আর এলই যদি তবে আবার ফিরে গেল কেন ?

বুঝতে ঠিক আমিও পারি না—তবুও বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। বলি, তার সাধনায় গলদ ছিল বাবা।

মা এসে বহুক্ষণ আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমরা কেউ টের পাই নি। জানতে পারলাম মা সাড়া দিতে। তাঁর এমন শান্ত, ধীর কণ্ঠস্বর ইতিপূর্ব্বে কোনদিন শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। তিনি বললেন, এমন যে হবে তা আমি জানতাম। তাই তোমাদের মত সূর্য্যকে নিয়ে মাতামাতি করতে পারি নি।

বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দিন পালটে যাচ্ছে একথা সব সময় ভুলে থাকতে চাও বলেই এত কষ্ট পাও।

বাবা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় বললেন, এ তোমাদের অন্যায় কথা—যুগ পালটে যাচ্ছে বলেই মানুষকেও বদলে যেতে হবে, তার স্বভাব-মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলতে হবে, এ আমি মেনে নিতে পারি না।

মা হেসে জবাব দিলেন, তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে মানুষ পালটে যাবে না। ও নিয়ে কারুব মাথাব্যথাও নেই।

মার হাসি বাবাকে আঘাত করে। তাঁর মুখের ভাব পবিবর্ত্তন দেখে অনুভব করলাম। তিনি আর্ত্তকণ্ঠে মাকে বললেন, অন্য লোকের কথা আমি ভাবছি না, কিন্তু সূর্য্য আমার ছাত্র। তাকে আমি যথার্থ মানুষ হবার শিক্ষাই দিয়েছিলাম। ওকে নিয়ে আমার অহঙ্কারের সীমা ছিল না যে।

মা কিন্তু বাবার মত চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। তিনি সহজ ভাবেই বললেন, সূর্য্যকে নিয়ে মিথ্যে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ। সে এমন কিছু অসাধারণ নয়, সাধারণকে অসাধারণ ভাবতে গিয়েই

তুমি দুঃখ পাচ্ছ। তুমি তোমার কর্তব্য করেছ—সে তার পথ বেছে নিয়েছে। এইটুকুই সত্য। একে স্বীকার করে নিলেই চুকে গেল।

আগে হলে তর্ক করতাম, প্রতিবাদ জানাতাম। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মা বোধ হয় মিথ্যে বলেন না। আসলে আমরা মানুষকে দেবতা ভাবতে গিয়ে না খুঁজে পাই দেবতাকে না মানুষকে। সূর্য্যদার বেলায়ও তাই হয়েছে। অথচ তাকে নিয়ে কত সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা আমি নিজেও কবেছি। তোমাব বিয়ের আগে কত তর্ক-বিচার করেছি। দেখেশুনে আজ মনে হচ্ছে আমাদের চিন্তা করবার গণ্ডী কত সীমাবদ্ধ, কত সামান্য আমাদের পুঁজি। বাস্তব আর কল্পনায় কত প্রভেদ।

আব ভাল লাগছে না, আবাব পরে জানাবাব মত কিছু ঘটলে লিখব। ইতি—

—দাদা

চিঠিখানি পড়া শেষ হলে যত্ন করে তা যথাস্থানে রেখে দিয়ে শ্রীমতী তার গহনাব বাক্স খুলে একটি অত্যন্ত মূল্যবান আংটি তুলে নিযে দ্রুত নীচে নেমে এল এবং ঘবে প্রবেশ কবে কোনপ্রকার ভূমিকা না করে সূর্য্যকে বলল, বড্ড দেরী হয়ে গেল, অনেক খুঁজে পেতে দেখতে হ'ল। তোমাকে খালি হাতে ফেরালে সত্যিই অন্যায় হয়ে যেত। কি ভাগ্যি মনে পড়ে গেল।

একটু থেমে একটু ইতস্তত' কবে সে তার হাতের মুঠো সূর্য্যর চোখের সম্মুখে মেলে ধবল। খানিকটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, আংটিটা চিনতে পাব সূর্য্যদা? এটা তুমি আমার বিয়েতে উপহার দিয়েছিলে। এর মূল্য তখন আমি জানতাম না, ভেবেছিলাম কাচ, কিন্তু হাতে পরলাম অমূল্যনিধি মনে করে।

সূর্য্য স্তম্ভিত। তার মুখে কথা যোগাল না, শুধু চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শ্রীমতী থামতে পারল না। সে বলে চলল, কিন্তু এ বাড়ীতে

এসে ওঁর যথার্থ মূল্য জানতে পারলাম। আমার কপালগুণে কাচ হ'ল হীরা, সূর্য্যদা আমায় দিয়েছেন হীরার আংটি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলাম স্বচ্ছ-শুভ্র একখণ্ড পাথর, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই সামান্য ক'টা মাসের ব্যবধানে পাথরখণ্ড নীল হয়ে গেছে।

সূর্য্যর বিস্মিতকণ্ঠ থেকে তার অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল একটিমাত্র শব্দ, নীলা।

হ্যাঁ নীলা। শ্রীমতী একটু হেসে বলল, পাথরের নীচে লুকানো ছিল বিষের পাত্র। দেখছ কি অমন করে, সত্যিই তাই। নীল হয়ে গেছে পাথর, তাই ভয় পেয়ে খুলে ফেললাম। ভালই হ'ল তুমি এসেছ, তোমার জিনিস তোমায় ফেরত দিয়ে আমি দায়মুক্ত হব।

আংটিটি সূর্য্যর হাতে তুলে দিল শ্রীমতী। তার বিহ্বল দৃষ্টি আংটির উপর ন্যস্ত। শ্রীমতী পুনরায় বলল, আমি বাঁচতে চাই সূর্য্যদা। তাই এই মারাত্মক বস্তুটি তোমাকে ফেরত দিলাম। এটা তুমি নিয়ে যাও। পয়সার প্রয়োজন থাকলে বিক্রি করে দিও। নইলে রেখে দিও আর কাউকে বিয়েতে যৌতুক দিতে পারবে।

সূর্য্যর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। শ্রীমতীর তা দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু সে তা ভ্রূক্ষেপ না করে শান্তকণ্ঠে বলতে লাগল, আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি সূর্য্যদা—যদি কখনও সকলের সামনে সহজ ভাবে কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে আমার কাছে আসতে চাও এস, নইলে এইখানেই যেন শেষ হয়। নিজেকে আর ছোট ক'র না।

সূর্য্য এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছে। তার চোখমুখের ভাব পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল। সে বলল, এতটা আমি কল্পনাও করতে পারি নি, কিন্তু তোমার আজকের কথা আর ব্যবহার আমার চিরদিন মনে থাকবে। আংটিটা ফেরত দিয়ে ভালই করেছ। আমার ভুল তুমি সংশোধন করে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ। অনেকগুলি টাকা সত্যিই অপাত্রে পড়েছিল।

একটু থেমে সূর্য্য পুনরায় বলল, আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি শ্রীমতী। টাকার আমার খুব প্রয়োজন থাকলেও এ আংটি আমি বেচব না। এই আংটির দ্যুতি আমাকে ভবিষ্যতে পথ দেখাবে। যে বিষের সন্ধান তুমি আমাকে দিলে তা আমার অজানা ছিল। জেনে ভালই হ'ল। এই বিষকেই আর একবার নতুন করে মূলধন করব—

সূর্য্য ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে চলে গেল। শ্রীমতী আরও খানিক-ক্ষণ সেইখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মন্থর-পদে প্রস্থান করল।

১৫

শ্রীমতী এই উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে এলেও মন থেকে খানিক পূর্ব্বের ঘটনাগুলিকে বিদায় করতে সক্ষম হ'ল না। বারে বারে তার মনে হতে লাগল যে, কেমন করে সে সূর্য্যদার সঙ্গে এতখানি রূঢ় ব্যবহার করতে পারল। অথচ এই সূর্য্যদাকে সে কত শ্রদ্ধা করত। এ শ্রদ্ধা তিনি এমনি পান নি। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে তিনি যা অর্জ্জন করেছিলেন, কত স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা খুইয়ে বসলেন। বর্ত্তমানের স্খলন অতীতের সবকিছু একেবারে ধুয়ে-মুছে দিল। এতটুকু অনুকম্পা কেউ দেখাতে রাজী নয়। তার নিজের ব্যব-হারেই আজ এ কথা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

কিন্তু কেন? কিসের জন্য সূর্য্যদা আজ এই পথে নেমে এলেন? কি এর কারণ? মানুষের জীবনের পটপরিবর্ত্তন ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই বলে দেবতা এমন দানবে রূপান্তরিত হবে। শেষ পর্য্যন্ত ভুলুয়া সর্দ্দারের মেয়েকে—শ্রীমতী নিজের মনে কথা কয়ে উঠল, সে কোন অন্যায় করে নি বরং সূর্য্যদাকে প্রশ্রয় দিলেই অন্যায়কে প্রতিপালন করা হ'ত। হীরের আংটিটা ফেরত দিতে পেরে সে খুশীই হয়েছে। আজ ক'দিন

ধরেই ওটা একটা দুর্বিসহ বোঝা হয়ে তার মনের উপর চেপে বসেছিল। আজ বোঝা নামিয়ে দিতে পেরে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

শ্রীমতী পায় পায় তার শয়নকক্ষে এসে উপস্থিত হ'ল। মনটা তার বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তার বারে বারে ডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়ছে। দিন কয়েক ধরে তিনি এ মুখো হন নি। ইতিমধ্যে দু'দিন টেলিফোন করেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

কেষ্ট বলে, এমন মাঝে মাঝে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। ডাক্তারবাবুর ছানাপোনা কি কম মনে কবেছেন বৌদিরাণী? ওদেব ছ্যাপা পোয়াতেই ডাক্তারবাবু ফকিব।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে বলল, আজ যে আবার নতুন কথা শোনালে কেষ্ট। এসব কথা এব আগে কখনও শোনাও নি ত?

কেষ্ট এক মুখে হেসে কৃতার্থকণ্ঠে জানাল, আমবা চাকর-বাকর মানুষ। জিজ্ঞেস না কবলে কিছু বলতে নেই। নইলে ডাক্তারবাবুর হাসপাতালেব কথা কে না জানে?

শ্রীমতী প্রশ্ন করে, হাসপাতালের সঙ্গে ছানাপোনার সম্বন্ধ কি কেষ্ট?

কেষ্ট হেঁ-হেঁ করে খানিক হেসে বলল, আজ্ঞে ওখানে যাঁবা আসেন-যান উনি তাঁদেরকে ছানাপোনা বলেন। ওদেব চিকিচ্ছে-পত্তব ডাক্তাববাবু নিজেব পযসায করেন।

শ্রীমতী পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কত বড় হাসপাতাল কেষ্ট?

কেষ্ট জবাব দিল, বড় আর হবে কেমন কবে? চিকিচ্ছে করে ত আর পয়সা পান না।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে বলল, পয়সা পান না মানে!

জিব কেটে কেষ্ট জবাব দিল, পয়সা নেন না যে—উল্টে দিয়ে আসেন। গরীব ছেলেদের জন্য আবার একটা ইস্কুল করে দিয়েছেন।

শ্রীমতী হেসে বলল, তোমাদের ডাক্তারবাবুর তা হলে অনেক পয়সা আছে বল।

কেষ্ট বলল, আজ্ঞে তা ত জানি না। তবে ডাক্তারবাবুর দিলটা খুব বড়। আমাদের বাবুও তাঁকে খুব মান্যি করেন।

শ্রীমতী হাসি মুখে বলে, করেন বুঝি? আচ্ছা কেষ্ট, তোমাদের ডাক্তারবাবু থাকেন কোথায়?

কেষ্ট গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দেয়, ঐ এক মস্ত দোষ ডাক্তারবাবুর। তিনি বস্তীতে থাকেন। যত সব পূবে বাংলার খেদান লোকগুলির সঙ্গে। আমাদের বাবু কি এখানে থাকবার জন্য কম খোশামোদ করেছেন! উনি পূবে বাংলার লোক কিনা বড্ড গোঁ। সাফ জবাব দিলেন, তোমাদের দালান-কোঠায় আমার কাজ নেই।

শ্রীমতী বলল, ওখানেই বুঝি ডাক্তারবাবুর হাসপাতাল আর স্কুল?

নইলে আর কোথায়? কিন্তু বৌদিরাণী, হলে হবে কি বস্তী—বেজায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কেষ্ট মৃদুকণ্ঠে বলল।

শ্রীমতী জিজ্ঞেস করল, এখান থেকে কতদূরে ডাক্তারবাবুর বস্তিবাড়ী কেষ্ট?

জবাব দিতে গিয়ে মুখ তুলেই কেষ্ট থামল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে শ্রীমতী দেখল অদূরে নিঃশব্দে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তারবাবু। শ্রীমতীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি হেসে বললেন, ডাক্তারবাবুর বস্তীবাড়ীর খোঁজ করছিলে কেন? ওসব জায়গা ত তোমাদের জন্যে নয় মা।

কে বলে ও-কথা কাকাবাবু। বরং ঐটেই আমার উপযুক্ত স্থান। একটুখানি হেসে শ্রীমতী পুনরায় বলল, কথাটা তা নয়। খোঁজ নিচ্ছিলাম আপনার। আজ অনেক দিনের মধ্যে একবারও দেখা পাইনি তাই। ডাক্তার বলে অসুখ-বিসুখ হতে পারবে না এমন ত কোন কথা নেই—

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বরে খানিক অভিমান ফুটে উঠল। ডাক্তারবাবুর কানেও তা স্পষ্ট ধরা পড়ল। ভালই লাগল তাঁর। তিনি সহাস্তে বললেন, এ বুড়োর জন্য তুমি এত ভাবতে সুরু করেছ কেন মা—এতটা কি সহ্য হবে আমার।

শ্রীমতী কোন জবাব দিল না।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন, ভবিষ্যতে ত্রুটি দেখলে সংশোধন করে দিও।

শ্রীমতী লজ্জা পেল। মৃদুকণ্ঠে বলল, ও আবার কি কথা কাকাবাবু। ত্রুটি আবার কোথায় হ'ল আপনার, আসলে আমারই ভাল লাগছিল না। তার উপর আমাদের বাগানের মালী-বৌয়ের বড্ড অসুখ। মালী এসে কেঁদে পড়ল।

ডাক্তারবাবু সহসা গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, বোকা লোকগুলির কি রেখে ঢেকে চলবার উপায় আছে মা। কিন্তু ভাবছিলাম চাকরিটি শেষ পর্য্যন্ত বজায় বাখতে পারব কিনা? যে কড়া মনিব।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, এ কথা বলছেন কেন কাকাবাবু!

ডাক্তারবাবু তেমনি গাম্ভীর্য্য বজায় বেখে বললেন, আজ মালী-বৌ, কাল ধোপা-বৌ, পবশু ড্রাইভারেব শালা, তাবপবে দেখা দেবে পাড়াপড়সীব পালা। এত ঝামেলা পোহাতে গিয়ে হয়ত রুটিন-বাঁধা কাজে দেখা দেবে অবহেলা। শেষ পর্য্যন্ত চাকরিটি খোয়াব না ত?

এতক্ষণে শ্রীমতী যেন কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে। সে হেসে বলল, খোয়াতে হয় আপনি খোয়াবেন। তার জন্যে আমার অত ভাবনা নেই।

ডাক্তারবাবুও সে হাসিতে যোগ দিলেন। বললেন, তুমি ত আমার খুব হিতাকাঙ্ক্ষী মা!

ঠাট্টার কথা নয় কাকাবাবু। শ্রীমতী বলল, নিতান্ত বিপদে না পড়লে আপনাকে ব্যস্ত করব না। আপনার যে কত কাজ সে কি আমি জানি না মনে করেছেন? তা ছাড়া বহুর কথা চিন্তা করতে

গেলে কাজের চেয়ে নিজের মনকেই ক্লেশ দিয়ে বসব। আমাদের আর কতটুকু সাধ্য।

ডাক্তারবাবু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, এটা একটা কথাই নয় শ্রীমা। মানুষই মানুষেব কথা ভেবে থাকে। নইলে নিজের কাছেও সময়েতে কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু সাবধান, নিজেকে ভুল করেও প্রকাশ কর না। বিশেষ করে তোমার দুর্ব্বলতা। তা হলেই ভিড় জমবে। যার প্রয়োজন আছে সেও আসবে, যার নেই সেও ভিড় বাড়াবে। কিন্তু আর না, চল যাই, তোমার মালী-বৌকে একবার দেখে আসি গিয়ে।

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, তাই বলে ধূলো-পায়ে যাবেন—একটু-ক্ষণ বসে গেলে হ'ত না?

ডাক্তারবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, না মা, তা হলে বসেও শান্তি পাব না। যখন বসব তখন বসবার মত করেই বসব।

শ্রীমতী ছেলেমানুষেব মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, আপনি বড় ভাল কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে বললেন, তুমি নিজে ভাল বলেই এ কথা বলতে পেবেছ। আমি ত বরং তোমার মালী বৌকে এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমিই যেতে দিলে না। নাও এবারে চল।

চলতে চলতে শ্রীমতী বলল, এখন মনে হচ্ছে গরজ আপনারই বেশী, কিন্তু প্রস্তাবটা শুনেই অমন করে উঠলেন কেন?

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, ওটা অভ্যাসেব দোষ। মনে যাই থাক না কেন মুখে তার প্রকাশ ঘটালেই আর বাঁচবার কোন উপায় থাকবে না। বড বড় ডাক্তারেরা তাঁদেব ফি-এর জোরে আত্মরক্ষা করেন, আব আমাদের মত অখ্যাতদের করতে হয় মুখের জোরে।

শ্রীমতী শ্রদ্ধা-মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, আপনি কিন্তু এদের গোষ্ঠীর কেউ নন কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু প্রাণ খুলে হেসে বললেন, না মা, এটা ঠিক কথা বল নি। নাম চাই, পয়সা চাই, আত্মরক্ষার জন্য রূঢ় কথা বলি, তবুও তুমি এ কথা বলবে? তিনি আর একদফা হেসে উঠলেন।

মালী-বৌর সামান্য জ্বর। সর্দ্দি বুকে আছে, কিন্তু তার জন্য ব্যস্ত হবার কিছুই নেই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে শ্রীমতী পুনরায় তার শয়নকক্ষে ফিরে এল। বলল, আপনার খুব তাড়া নেইত কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, তাড়া থাকলেই কি তুমি আমায় এখন যেতে দেবে?

শ্রীমতী জবাব দিল, আপনার কাজের ক্ষতি করে ধরে রাখব—এই কি আপনি মনে করেন?

ডাক্তারবাবু স্নেহ-কোমলকণ্ঠে কথাটা সংশোধন করে নিয়ে বললেন, উল্টো করে বলা হয়েছে মা। আমার বলা উচিত ছিল যে, কাজের তাড়া আমার যতই থাক একবার এসে যখন পড়েছি তখন অত সহজে কি চলে যেতে পারি?

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, কথাটা আমার সব সময় মনে থাকবে। বলেই হেঁট হয়ে ডাক্তারবাবুর জুতোর ফিতে খুলতে সুরু করে দিল।

ডাক্তারবাবু বাধা দিলেন না। বরং পরম তৃপ্তিব সঙ্গে পা দুখানি এগিয়ে দিলেন।

জুতো জোড়া খুলে বাইরে রেখে এসে শ্রীমতী বলল, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত একটু বিশ্রাম করে নিন। দেরি হবে না আমার।

শ্রীমতী দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে চলে গেল। এবং প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিবে এসে সলজ্জ-হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বলল, একটু দেরি হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে বললেন, তা একটু হয়েছে, কিন্তু তুমি অমন করে নেয়ে উঠলে কেমন করে?

শ্রীমতী মৃদুহেসে বলল, এ বাড়ীর নিয়মকানুনের গণ্ডি ডিঙিয়ে গিয়েছিলাম তাই। আপনাকে আমি ঠাকুর চাকরের হাতের জিনিস খাওয়াতে পারব না। উঠুন। বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসুন।

ডাক্তারবাবু প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, তা না হয় উঠলাম, কিন্তু আমাকে যে খাওয়াতেই হবে তার কি কথা আছে ?

শ্রীমতী ছেলেমানুষেব মত বলল, তা কেমন কবে হবে ? আপনি যে খেতে ভালবাসেন।

ডাক্তারবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন, বিশেষ করে তোমার হাতের রান্না। এ বুড়োকে তুমি ঠিক চিনেছ মা। এতটুকু ভুল কর নি। বলেই তিনি বাথরুমের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

ফিরে এসে খাবার আয়োজন দেখে ডাক্তারবাবু উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, আয়োজন দেখছি নিতান্ত কম কর নি তুমি।

শ্রীমতী মিষ্টি করে একটু হাসল, জবাব দিল না। বস্তুতঃ আয়োজন সত্যই কম কবে নি শ্রীমতী। এমন কি ডাক্তারবাবুর প্রিয় খাদ্যও দু'একটি ব্যবস্থা করতে সে ভুল করে নি।

ডাক্তারবাবু সহসা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, শ্রীমতীর তা দৃষ্টি এড়াল না। এমনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে এক সময় তিনি মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, মাঝে মাঝে নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয়। দেহ বলে, আর পারি না। সে বিশ্রাম চায়। কিন্তু মন চোখ বাড়িয়ে কি বলে জান ?

শ্রীমতী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, না।

ডাক্তাববাবু বলেন, মন বলে ঐটি ক'র না। কর্ম্মকে বাদ দিলে দেহও টিকবে না—মনও বাঁচবে না। তাব চেয়ে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নাও। ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। মন সব ছেড়েছুড়ে আমার মায়ের আশ্রয়ে চলে আসতে চায়।

শ্রীমতী উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, তা হলে আমিও বেঁচে যাই কাকাবাবু। পৃথিবীটা বড় আজব স্থান। একজন খোঁজে কাজ—

আর একজন খোঁজে বিশ্রাম। আপনার খানিকটা বোঝা আমাকে বইতে দেবেন? এমনি করে শুয়ে-গড়িয়ে সময় আমার আর কাটতে চায় না। এমনি করে মানুষ কখনও বাঁচতে পারে কাকাবাবু?

ডাক্তারবাবু বলেন, কাজের অভাব আছে নাকি? কত কাজ তুমি চাও?

শ্রীমতী বলল, আমি অভাবের কথা বলছি না। কিন্তু এখানে যে কাজের চেয়ে লোক বেশি তাই—

ডাক্তারবাবু হেসে উঠে বললেন, তাদের ঠিকভাবে চালানও একটা বস্তবড় কাজ মা।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, তার জন্যে আবাব এক নতুন হাউস-কীপার এসেছেন। এখানেব এই অনাবশ্যক ভিডেব মধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি কাকাবাবু। নিজেকে অসহায়—বড় বেমানান মনে হচ্ছে। সেইজন্যই আমি আপনাব কাজে সাহায্য কবতে চাইছি। আমি কাজ পেলে বেঁচে যাব।

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বললেন, কাজের অভাবে বড্ড কষ্ট পাচ্ছ বুঝি?

শ্রীমতী মধুর হেসে বলল, অবর্ণনীয় কষ্ট কাকাবাবু—কিন্তু এসব কথা পবে হবে, আপনি আগে খেতে সুরু করুন। নইলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু বাধ্য ছেলের মত খাওযায় মন দিলেন। পর পর খানকয়েক লুচি ও গোটা কয়েক মিষ্টি গলাধঃকরণ করে পুনরায় মুখ তুলে কিছু বলবার উপক্রম কবতেই শ্রীমতী শাসনের ভঙ্গীতে বলল, উঁহু, আগে খাওয়া তারপরে কথা—

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, গল্প ক'বতে ক'বতে না খেলে এত খাবার উঠবে না যে মা।

ডাক্তারবাবুর কথা বলার ধবনে শ্রীমতী হেসে উঠল। বলল, তা হলে না হয় গল্প করতে কবতেই খান। কিন্তু একেবারে নিঃশেষ করে খেতে হবে সে কথাও আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি।

দরজার পাশ থেকে নবনিযুক্ত হাউস-কীপার সরে গেল। সেই দিকে দৃষ্টি পড়তেই ডাক্তারবাবু বললেন, উনিই তোমাদের হাউস-কীপার বুঝি? উনি চান কি?

শ্রীমতী অগ্রাহ্যভরে বলল, সেটা উনিই ভাল জানেন। ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

ডাক্তারবাবু সায় দিয়ে বললেন, ওটা না থাকাই ভাল মা। তাতে মনও ভাল থাকে মাথাও হালকা থাকে। তাই বলে চোখ বুজে কোন-কিছুকে অবজ্ঞা করাও উচিত না। সময় মত সাবধান হতে পারলে অনেক অভাবিত দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। আমার কথাটা মনে রেখ।

রাখব—শ্রীমতী কৃতজ্ঞকণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু আপনি একেবারেই কথা রাখছেন না কাকাবাবু। শুধু গল্পই করছেন, খাচ্ছেন না কিছু।

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, ওটা বয়েসের দোষ মা। বলেই তিনি পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করলেন। কিছুক্ষণ হাত এবং মুখের কাজ একসঙ্গে চলতে লাগল। সহসা একটা কথা মনে পড়তেই তিনি খাওয়া বন্ধ করে বললেন, কথায় কথায় আসল বক্তব্যটিই ভুলে বসে আছি। তখন থেকেই কথাটা আমার বার বার মনে হয়েছে। একে একটা যোগাযোগ বলা যেতে পারে—অথচ কার্য্যকারণে ইচ্ছা-পূরণের পথে রয়েছে মস্তবড় অন্তরায়—

শ্রীমতী বিস্মিত হ'য়ে বলল, কিসের যোগাযোগ কাকাবাবু? অন্তরায়টাই বা কি?

ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ কাজ আর আমি পাচ্ছি না কাজের লোক। অথচ তোমাকে আমি ডেকে নিতে পারছি না।

শ্রীমতী বলল, কেন পারেন না? বাধা কোথায়?

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মত এবং পথ এক নয় একথা আজ আমার

কাছে আর অজানা নয়। কিন্তু তবুও আমার আশা আছে যে, এই বিপরীতমুখি দুটি ধারা একদিন একই বিন্দুতে গিয়ে মিলবে—

শ্রীমতীর মুখে বড় বিচিত্র একটুকরো হাসি ফুটে উঠল, এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হতে পারে কাকাবাবু?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী। আমাব কথাটা তোমার বোঝা উচিত ছিল। গতি-পথকে একটু একটু করে বাঁকা করতে থাক তা হলেই বিন্দুটিব সন্ধান পাবে। নইলে অনন্ত কাল ধরে চলেও থামতে আর পারবে না। যতকিছু দেখবার যতকিছু অনুভব করবার তার থেকে বঞ্চিত হয়েই একটা জীবন কেটে যাবে। জীবনে সমস্যা যেমন আছে—সমাধানও আছে। বছরের পর বছর যারা লড়াই করে তারা শুধু উত্তেজনার স্বাদটাই পেয়ে থাকে—শান্তির নয়।

শ্রীমতী সহসা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। বলল, আপনার কথাগুলি ঘুমের মত নরম, কিন্তু যুক্তি নেই—বড একতরফা কথা।

পাগলী মা। ডাক্তারবাবুব কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, তুমি ঠিক বলেছ মা। আমিও যুক্তির লডাই কবতে বসি নি। আমি আমার মাকে তাব সত্যিকাব উপযুক্ত স্থানে দেখতে চাই। যাতে খিদে পেলে অসঙ্কোচে হাত পেতে এসে দাঁড়াতে পাবি—কিন্তু শ্রীমা, তোমার ঐ হাউস-কীপাবটি অমন চোরের মত আশেপাশে ঘুরে বেডাচ্ছে কেন বলতে পার?

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বব বদলে গেল। সে বলল, জানি না। তবে মনে হয় এটাও ওর কাজের একটা অংশ। ওব মত ওকে চলতে দিন। এক সময় আপনিই থেমে যাবে।

ডাক্তারবাবু ভিতবে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেও বাহিরে তা প্রকাশ পেল না।

সে ত দেখতেই পাচ্ছি, তিনি শান্ত ভাবে বললেন, কিন্তু অতনুর শেষ পর্য্যন্ত মাথা খারাপ হযে গেল নাকি? ঘরে-বাইরে কোথাও যে আর বন্ধু কেউ থাকবে না। তুমি শুধু একটা দিক চিন্তা করছ,

কিন্তু আমি ভাবছি এতে যে শেষ পর্য্যন্ত সে নিজেই সবচেয়ে অসুখী হবে এটাও অতনুবাবু বোঝে না?

শ্রীমতী অন্যমনস্কভাবে বলল, আপনাকে ত খুব শ্রদ্ধা করেন শুনতে পাই—

ডাক্তারবাবু একটু হাসলেন, বললেন, বহু লোকের কাছে অসংখ্যবার শোনা কথা। কিন্তু বিশ্বাস করে এক পা এগুতে পারি নি। অতনুবাবু যত বড় ধনী তার চেয়েও বেশী খেয়ালী। খেয়াল হলে তিনি শ্রদ্ধাও করতে পারেন আবার খেয়ালের বসে ছুড়ে ফেলে দিতেও তাঁর আটকায় না।

একটু থেমে তিনি পুনবায় বললেন, আজ আর বসব না মা, মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী বলল, তা হোক, তবুও আপনাকে বসতেই হবে। আমি না আসা পর্য্যন্ত চলে যাবেন না যেন। সে দ্রুত প্রস্থান করল।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে বসে আছেন। কোন দিকে তাঁর হুঁস নেই। হাউস-কীপার পুনরায় দেখা দিল। হঠাৎ ডাক্তারবাবুর দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হ'তেই তিনি একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। মনে মনে তিনি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে ঠেকবে ভাবতে গিয়ে তিনি অস্বস্তিবোধ করছিলেন। এমনি সজাগ-প্রহরার কোন সহজ অর্থ তিনি খুঁজে পেলেন না। ডানকান-আগরওয়ালা চক্র অতনুর এতদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রাকে সমূলে নাড়া দিয়েছে এ খবর তিনি পেয়েছেন, কিন্তু তাই বলে ঘরের আবহাওয়াকে এমন করে তিক্ত করে তুলতে সে অগ্রণী হ'ল কিসের জন্য!

ডাক্তারবাবু হাউস-কীপারকে আহ্বান জানালেন। সে ঘরে আসতেই ডাক্তারবাবু তাকে প্রশ্ন করলেন, কতদিন হ'ল তুমি বহাল হয়েছ? তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিলেন।

মৃদু জবাব এল, দিন সাতেক হয়েছে—

ডাক্তারবাবু সোজা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাজ বুঝি সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা ?

পুনরায় জবাব এল, আপনি যা খুশী অনুমান করে নিতে পারেন—

তার উত্তর দেবার ধরনে ডাক্তারবাবু সাবধান হলেন। বললেন, আমি এ বাড়ীর ডাক্তার। যখন তখন আসা-যাওয়া করতে হয়, তাই খবরাখবর নিচ্ছি। তোমার নামটি বলবে কি ?

একটু হেসে মেয়েটি জবাব দিল, মিত্রা রায়।

ডাক্তারবাবু মোলায়েমকণ্ঠে বললেন, সুন্দর নাম তোমার। মিত্রা রায়। এর আগেও বুঝি এ কাজ তুমি করেছ ?

মিত্রা জবাব দিল, না, এই প্রথম। আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই বোধ হয়। আমার অনেক কাজ—যাই।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বললেন, সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বুঝি। তোমার অনেক কাজ। কাজের মেয়ে তুমি। আচ্ছা যাও।

মিত্রা চলে যেতে শ্রীমতী এসে উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞেস করল, মিত্রার খবরাখবর নিচ্ছিলেন বুঝি।

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, নেবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ব্যাপার কি শ্রীমা, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি ?

শ্রীমতী সহজ ভাবেই বলল, হ্যাঁ কাকাবাবু। আপনার সঙ্গে আজ হাসপাতাল দেখতে যাব।

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, অতনুবাবুর যে ফেরবার সময় হয়েছে মা। এই সময় তোমার চলে যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে ?

শ্রীমতী বলল, তাঁর জন্যে আমার ভাববার কিছু নেই। চাকর-বাকর আছে, হাউস-কীপার মিত্রা রায় রয়েছে। প্রয়োজন হ'লে আরও নতুন লোক পাওয়া যাবে। আমাকে আমার মত করে ক'টা-দিন চলতে দিন কাকাবাবু—

ডাক্তারবাবু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। বিষের ধোঁয়া এরই

মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে অনেকখানি উর্দ্ধে উঠে গিয়েছে। যে প্রশ্ন তৃতীয় ব্যক্তি হয়েও তার মনে জেগেছে তা শ্রীমতীর মনে বহু পূর্ব্বে দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। তাই হয়ত আঘাতকে আঘাত দিয়েই প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে চাইছে সে।

শ্রীমতী পুনরায় তাগিদ দিতেই ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, যাবেই যখন চল মা। হয়ত এরই আজ প্রয়োজন আছে।

১৬

শ্রীমতী ডাক্তাববাবুব সঙ্গে বেরিয়ে যাবাব কিছুক্ষণ পরেই অতনু ফিবে এল। মিত্রা তার আবশ্যকীয় কাপড়-চোপড় এগিয়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে জানাল, বৌদিবাণী আপনাদের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বার হয়ে গেছেন। খবরটা আপনাকে দিয়ে দিতে বলে গেছেন।

অতনু জিজ্ঞেস কবল, হঠাৎ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কোথায় আবার গেলেন? কখন এসেছিলেন তিনি?

মিত্রা বলল, ঘণ্টা দুই আগে তিনি এসেছিলেন। বৌদিরাণী তাঁর খাতির-যত্নেব কোন ত্রুটি বাখেন নি। একটু থেমে, একটু ইতস্ততঃ করে পুনশ্চ বলল, আপনি কিন্তু অযথা আমাকে বেখেছেন। মিথ্যে আপনাব টাকা খরচ হবে। হাউস-কীপারের আপনার কোন দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না।

অতনু একটু হেসে বলল, কিন্তু তোমার ত প্রয়োজন আছে মিত্রা!

মিত্রা মৃদু জবাব দিল, আমাব প্রয়োজন আছে বলেই আপনি অকাবণে দেবেন কেন? তা ছাড়া কাজ না করে হাত পেতে টাকা নিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি।

অতনু জবাব দিল, নতুন কথা শোনাচ্ছ মিত্রা। কাজ যারা করে না তারাই সব সময় দাবি করে—এইটেই ত ইদানিং দেখতে পাচ্ছি।

মিত্রা বলল, আপনি কি দেখেছেন সেটা আমার ভাবার কথা নয়। আমি যেটা অনুভব করেছি তাই আপনাকে বললাম।

অতনু বলল, ওটা তোমার ভাববার কথা নয় মিত্রা। তোমাকে কখন কোন প্রয়োজনে আমি ব্যবহার করব তা তোমার দেখবার প্রয়োজন নেই। কাজ আপনি দেখা দেবে।

মিত্রার মুখে খানিকটা অর্থপূর্ণ হাসি।

অতনু বলল, তোমাকে নিয়ে আসায় ডানকান-আগরওয়ালা মনে করেছে কর্ম্মক্ষেত্রে এটা তোমার অবনতি, কিন্তু আমি মনে করি তোমার পদোন্নতি হয়েছে। তোমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমাকে ওদের নোংরা ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এ আমার সব সময় মনে থাকবে মিত্রা।

মিত্রা বিনয়াবনতকণ্ঠে বলল, আমার একান্ত দুদ্দিনে আপনি আমাকে চাকরি দিয়ে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। আর আমি করেছি আমার কর্ত্তব্য।

অতনু হেসে বলল, অতনু কাউকে মিথ্যে অনুগ্রহ দেখায় না মিত্রা। তার প্রমাণ তুমি নিজেই। হিসেব সে খুব ভাল বোঝে।

মিত্রা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার ভান করে প্রফুল্লকণ্ঠে জবাব দিল, নইলে আর এত বড় ব্যবসা চালাচ্ছেন কেমন করে!

অতনু খুশী হয়ে বলল, সবটাই আমার কৃতিত্ব নয় মিত্রা, তোমার মত আমার আরও কয়েকজন হিতৈষী কর্ম্মচারী আছে বলেই বেঁচে আছি। এমনি করেই দুনিয়াটা চলে। নইলে দুদিনেই রসাতলে যেত। কিন্তু তোমার চরিত্র এখনও আমার কাছে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ঠেকে।

মিত্রা কোন জবাব দিল না। একটুখানি হাসল।

অতনু বলল, হাসির কথা নয় মিত্রা।

মিত্রা বলল, আমিও আপনার একজন সাধারণ কর্ম্মচারী। অভাবের জন্য চাকরি করতে এসেছি। আর অভাব মিটে যাবে এ আশাও যখন মনের মধ্যে আছে—

কথার মাঝে থেমে মিত্রা দ্রুত প্রস্থান করল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে বলল, না কেউ নয়। আপনার কেষ্ট ওখানে দাঁড়িয়েছিল।

কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে অতনু বলল, আমার অনেক দিনের চাকর—খুব হিতাকাঙ্ক্ষী।

মিত্রা বলল, সত্যি কথা। আপনার উপর সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী দেখছি সংখ্যায় অনেক।

অতনু তার কথাটা যেন শুনতে পায় নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, তোমাদের দেশ কোথায় মিত্রা?

মিত্রা একটু যেন চমকে উঠেছে মনে হ'ল। সে বলল, ও পাঠ চুকেবুকে গেছে।

অতনু বলল, অর্থাৎ পূর্ব্ব-বাংলায়। কিন্তু কোথায় ছিল সেইটেই আমার জিজ্ঞাস্য।

মিত্রা বলল, ফরিদপুর, কোটালিপাড়া। কিন্তু আজ আবার নতুন করে এ প্রশ্ন কেন স্যাব?

অতনু একটুখানি হেসে পুনরায় বলল, এর আগেও জিজ্ঞেস করেছি বুঝি? মনে নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা। শোন হাউস-কীপাব, এখুনি কেষ্টকে ডেকে আমার আপিস ঘর খুলে দিতে বল।

মিত্রা জিজ্ঞেস করল আপনি কি এখুনি—

তাকে বাধা দিয়ে অতনু বলল, প্রশ্ন কর না। যা বলছি তাই কর। ওদের সঙ্গে আমার আজ শেষ হিসেব-নিকেশের দিন। কক্‌টেলের নেমন্তন্ন করেছি। হ্যাঁ···আচ্ছা মিত্রা দেবী, হঠাৎ তুমি এদের গ্রাস থেকে অতনুকে বাঁচাতে গেলে কেন, আমায় বলবে কি?

মিত্রা সহজকণ্ঠে বলল, ওটা এখনও আমি ভেবে দেখি নি। তবে ওদের অসঙ্গত চক্রান্তের হাত থেকে বাঁচাবার কথাটা যে মনে এসেছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

অতনু পরিহাসের ছলে বলল, অথচ এর পিছনে আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাই না?

মিত্রা সাবধানতা অবলম্বন করল। বলল, উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজ কেউ করে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

অতনু হেসে উঠে বলল, ভাল, ভাল। তুমিও দেখছি বেশ চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে জান। তোমার পড়াশুনা কতদূর মিত্রা?

মিত্রা বিব্রতকণ্ঠে বলল, খুবই সামান্য। আমার আবেদন-পত্রে সে কথা লেখা আছে।

অতনু তার পাইপে অগ্নিসংযোগ করে তাতে বারকয়েক টান দিয়ে বলল, তুমি জানিয়ে ছিলে বটে, কিন্তু আমাদের আগরওয়ালা আর ডানকান বলে ওটা মিথ্যা।

মিত্রার চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলেও সে সংযতকণ্ঠে বলল, আপনিও কি তাই বিশ্বাস করেন স্যার?

অতনু জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, এ কথা বলবারই বা অর্থ কি মিত্রা দেবী?

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে বলল, কথাটা আমার নয়—যারা বলেছে তারাই আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে।

অতনু বলল, আরও অনেক আপত্তিকর কুশ্রী ইঙ্গিত করেছে।

মিত্রা ভিতরে কেঁপে উঠলেও প্রকাশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, এ কথা ওরা বলতে পারে অতনুবাবু। ওরা যে বোকা নয় বুদ্ধিমান এইটেই আর একবার জানা গেল। আপনাকে বাজিয়ে দেখছে। সাবধান হয়ে তাদের নাড়াচাড়া করবেন, এটা আমার অনুরোধ।

অতনু মৃদু হেসে বলল, তোমার অনুরোধটা সময়োপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই। ওরা একটা-কিছু অনুমান করে নিয়েছে—সেইটেই যাচাই করে দেখছে। এ অভিযোগ তারই প্রতিক্রিয়া।

প্রসন্ন হাসিতে মিত্রার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, আপনি আমাকে বাঁচালেন। বলতে বলতেই সহসা থেমে

সে কেষ্টকে উচ্চকণ্ঠে ডাকল, কেষ্ট উপস্থিত হতে তাকে অতনুর আদেশ জানিয়ে দিল।

কেষ্ট অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতনু বলল, জান মিত্রা, মানুষকে বিশ্বাস না করেও উপায় নেই—করেও শাস্তি নেই।

মিত্রা প্রশ্ন করে, এ কথা কেন?

অতনু বলল, বিশ্বাসভঙ্গের অসংখ্য নজির আমার আশেপাশে রয়েছে বলেই এ কথা বলছি। কথাটা পুরোপুরি শেষ না করেই সে আচমকা অন্য প্রসঙ্গে ফিবে গেল, আচ্ছা মিত্রা, তোমাকে আমার এখানে আসবাব আগে আর কোথাও দেখেছি কি?

এই ধবনের কথাবার্তায় মিত্রা অস্বস্তিবোধ কবছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে যথাসম্ভব শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, এ প্রশ্নেব জবাব আপনিই ভাল দিতে পাববেন।

অতনু বলল, তুমি ঠিক বলেছ মিত্রা। আমার মনে হয় তোমাকে আমি ঘুমের ঘোরে কোথাও দেখেছি। তাই প্রকাশ্য দিনের আলোয় ঠিক ·

মিত্রা কথার মাঝে তাকে থামিয়ে দিয়ে হেসে উঠল। পর-মুহূর্তেই গম্ভীরকণ্ঠে বলল, আপনার মনের মধ্যে সন্দেহ বাসা বেঁধেছে তাই ঘুমিয়ে দেখেন স্বপ্ন, জেগে উঠে দেখেন তারই বিভীষিকা।

অতনু বার কয়েক মাথা নেড়ে ধীবে ধীরে বলতে থাকে, অস্বীকার কবে কোন লাভ নেই মিত্রা। বিশ্বাস কাউকেই আমি পুবো কবতে শিখি নি।

মৃদুকণ্ঠে মিত্রা বলল, যাদের আপনি বিশ্বাস করেন না তাদের আপনার চলার পথ থেকে সবিয়ে দেন না কেন?

এটা কাজের কথা হ'ল না মিত্রা—অতনু বলল, তা হলে নিতান্তই একক জীবন কাটাতে হয় যে। যা একেবারে অসম্ভব। মানুষ কখনও তা পারে না।

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে বলল, বুঝতে পারলাম না।

অতনু হেসে বলল, বুঝতে না পারার মত এটা কি শক্ত কথা মিত্রা?

মিত্রা ধীরে ধীরে বলতে থাকে, সত্যিই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। আপনি এত স্পষ্ট বলেই বলছি। এর পরেও কেউ বিশ্বস্তভাবে আপনার স্বার্থরক্ষা করে চলবে বলে কি আপনি মনে করেন স্যার?···

পারি বৈ কি মিত্রা দেবী, অতনু হাসিমুখে বলল, যারা সত্যিই বিশ্বস্ত তারা আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারে না। ওরা সব আলাদা জাতের মানুষ।

আর যারা তা নয়? মিত্রা বলল।

অতনু বলল, যারা বিশ্বস্ত নয় তাদের কথা বলছ ত মিত্রা? তাদের আমি আরও ভাল করে চিনি। না বোঝার ভান করে পাশে থেকে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করে। দিনরাত খোশামোদ করে চলে, কিন্তু এমনি মজা যে, জেনেশুনেও সহজে এদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না—নিতান্ত প্রাণের দায় না হলে।

মিত্রা সহসা খাপছাড়া ভাবে বলে বসল, আপনি ত তা হলে আপনার স্ত্রীকেও বিশ্বাস করেন না—

অতনু হো-হো করে হেসে উঠল। তার হাসির বন্যায় মিত্রার কথাটা প্রায় ভেসে গেল। সে গম্ভীরস্বরে বলল, প্রশ্নটা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক আর অসঙ্গত হলেও উত্তরটা জেনে নাও মিত্রা রায়। অতনু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাউকেই এক তিল বিশ্বাস করে না। তুমি এখন যেতে পার। তোমাকে আর আমার দরকার নেই এখন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাই।

মিত্রা বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অতনু চোখ বুজে সোফার উপর নিঃশব্দে বসে আছে। ভাবছিল নিজের আচরণের কথা। মিত্রার মত একটা মেয়ের সঙ্গে কিসের জন্য সে এভাবে আলোচনায় যোগ দিল? ডানকান-আগরওয়ালা-

চক্রের সন্ধান ও দিয়েছে সত্য, কিন্তু তাই বলে সে খানিকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলছে নাকি? ওকে আরও ঢের বেশী হিসাব করে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। একজনার কাছে যে বিশ্বাস ভাঙতে পেরেছে প্রয়োজন হলে যে, সে আর একজনকেও ছেড়ে কথা কইবে না এ কথা তার বোঝা উচিত। এই কথাটাই সে প্রকারান্তরে মিত্রাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

ডানকান-আগরওয়ালার এ বাড়ীতে আসা-যাওয়াটা আজ নতুন নয়। তবে আজকের প্রয়োজন তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। আজ তারা ইঁদুরকলে ধরা পড়েছে। অতনু জানে, ছুটে না এসে তাদের উপায় নেই। এক কথায় সিংহাসনচ্যুতি তারা মেনে নেবে না। নেওয়া সম্ভবও নয়। তারা প্রাণপণে যুদ্ধ করবে। অতনু তার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে।

অতনুর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। শ্রীমতী ফিরে এসেছে। অতনু দেখেও দেখল না। কথাও কইল না।

শ্রীমতীই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, তুমি কতক্ষণ এসেছ?

অতনু জবাব দিল, তুমি চলে যাবার অল্প পরেই—এই ঘণ্টা-তিনেক হবে।

শ্রীমতী কথাটা গায় না মেখে প্রস্থানোদ্যত হতেই অতনু তাকে ডেকে বলল, ডাক্তারবাবু এ বাড়ীর কর্ম্মচারী আর তুমি গৃহিণী, এ কথাটা তুমি সব সময় ভুলে যাও।

শ্রীমতীর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল। সে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে অতনুকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, তোমার ইচ্ছেটা কি?

অতনু শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, একটুও অস্পষ্ট নয় যে, না বোঝার ভান করছ। তুমি এখন যেতে পার।

তার কথার ধরনে শ্রীমতী প্রায় জ্বলে উঠতে গিয়েও আত্মসংবরণ করল এবং আর একবার তার পানে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শ্রীমতী মুখে কিছু না বলে নীরবে চলে গেলেও তার দৃষ্টির

মধ্যে যে ভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা অতনুর চোখেও ধরা পড়েছে। রুদ্ধ রোষে সে মেজের কারপেটে তার জুতা ঘষতে লাগল। কিন্তু ফেটে পড়বার আগেই কেষ্ট এসে ডানকান-আগরওয়ালার আগমন সংবাদ দিতে অতনু উঠে দাঁড়িয়ে শিষ দিতে দিতে বাইরের পথে পা বাড়াল।

১৭

ডানকান এবং আগরওয়ালা সত্যিই ছুটে এসেছে। সহসা শিষ দেওয়া বন্ধ করে অতনু কেষ্টকে জিজ্ঞেস করল, ওদের ঘর খুলে বসিয়ে এসেছ ত ?

তাদের ভিতরে ঢুকতে দেয় নি দরওয়ান—কে॰ ॰নাল।

অতনুর মুখে খানিক হাসি ফুটে উঠল। কার ॰া থেকে তাড়া খেয়ে এসেছে। অতনু নিজেকে নিজে বলল।

কেষ্ট বলল, তা হলে কি হুকুম আপনার ?

হুকুম ! এর পরেও কি ওরা চলে যায় নি ? অতনু জিজ্ঞেস করল।

আজ্ঞে না, ওরা দেখা না করে যাবে না। তাই ত আপনাকে খবর দিতে এলাম। কেষ্ট বলল, বলেন ত ঘর খুলে বসাই—

অতনু সাপের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, তাই কর কেষ্ট। আমার এতদিনের পুরানো পার্টনার, তাদের এভাবে দরওয়ান অপমান করল কেন জান তুমি ?

আজ্ঞে তাকে নাকি আপনিই হুকুম দিয়ে এসেছেন ? কেষ্টর চোখে বিস্ময়।

অতনু বলল, তা দিয়েছিলাম—

অতনুর অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করে পুনরায় কেষ্ট বলল, তা হলে কি ওদের ঘর খুলে দেব ?

দাও—আমি একটু পরে আসছি। অতনু হুকুম দিতেই কেষ্ট

দ্রুত চলে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে মিত্রা এসে উপস্থিত হ'ল। সে কোনপ্রকার ভূমিকা না করে বলল, আপনি কি ওদের—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে অতনু বলল, আদর করে বসাতে বলে দিলাম। ভয় নেই, ওদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছি। যত খুশী আদর করলেও—

সময় পেলে আবার বিষদাঁত গজাতে পারে স্যার। তাকে বাধা দিয়ে মিত্রা বলল।

অতনু ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, না অন্ততঃ সে দাঁত আর গজাবে না। কিন্তু তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে মিত্রা। অতনু হাসল।

মিত্রা চুপ করে থাকে।

অতনু পুনরায় বলে, যাবে নাকি আমার সঙ্গে ওদের অভ্যর্থনা জানাতে?

মিত্রা চমকে উঠল।

অতনু হেসে বলল, থাক তোমাকে যেতে হবে না। দূর থেকেই না হয় ওদের অভ্যর্থনাব বহরটা দেখে আসবে চল।

অতনু এগিয়ে চলল।

ডানকান এবং আগরওয়ালাকে বসিয়ে কেষ্ট বিনীতকণ্ঠে বলল, আমাদের দরওয়ানটা একেবারে বুনো। মানী লোকের সম্মান দিতে জানে না শেঠ সাহেব। আমার সাহেব আপনাদের খাতির-যত্ন করতে বলেছেন। সোডা, হুইস্কি আনব কি?

ডানকান ক্ষিপ্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমরা তোমার সাহেবকে চাই। হুইস্কি, সোডা নয়। বেয়াকুফ কোথাকার।

তার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অতনু এসে ঘরে প্রবেশ করল। শান্ত-ধীরকণ্ঠে বলল, ডানকান সাহেব বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, কেষ্ট আমার চাকর আপনার নয়। কথাটা দয়া ক'রে ভুলেও আর কোনদিন ভুলবেন না।

ডানকান এবং আগরওয়ালার ছ'জোড়া চোখই একসঙ্গে জ্বলে উঠে পরমুহূর্ত্তে নিভে গেল। অতনুর সাবধানী দৃষ্টিতে তা ধরা পড়লেও সে প্রকাশ্যে একটি কথাও না বলে দৃঢ়পদে এগিয়ে গিয়ে একখানি চেয়ার দখল করল।

কথা বলল আগরওয়ালা. ডানকান হয়ত মাথা ঠিক রেখে কথা বলতে পারে নি অতনুবাবু। আপনারই চাকর যদি আপনাকে বাড়ীতে ঢুকতে বাধা দেয় তা হলে আপনার মনের অবস্থাটা কেমন হয় তা নিশ্চয় বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

অতনু কঠিনকণ্ঠে বলল, তা হলে সে চাকরকে চাবুক মেরে নিজের পথ করে নিতে আমি একবিন্দু দ্বিধা করতাম না। কিন্তু পরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করতে গিয়ে গলাধাক্কা খেলে সে অপমান নিঃশব্দে হজম করা ছাড়া উপায় কি আগরওয়ালা সাহেব!

ডানকান পুনরায় মেজাজ দেখিয়ে বলল, আপনার এই বেআইনী কাজের জন্য অনুতাপ করতে হবে।

অতনু উত্তাপহীন-কণ্ঠে বলল, বেআইনী কাজের জন্য সকলেরই অনুতাপ করা উচিত। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন সাহেব। বেআইনী লোভ আপনাদের বঞ্চিত করেছে এই কথাটা মনে রেখে ভবিষ্যতে পথ চলবেন।

ডানকান পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠতেই তাকে থামিয়ে দিয়ে আগরওয়ালা ধীরে ধীরে বলল, আপনি বড় গোলমেলে কথা বলছেন বাবু সাহেব। এ বড় তাজ্জবের কথা! আমরা জানলাম না অথচ রাতারাতি কারবারে অধিকার হারালাম। জিজ্ঞেস করতে পারি কি আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে হঠিয়ে দেবার ক্ষমতা আপনাকে কে দিল?

অতনু ভাবলেশহীন চোখে তাদের পানে তাকিয়ে সাপের মত হিস্‌হিস্ করে বলল, এ প্রশ্নটা নিজেদের করুন। জবাব খুঁজে পেতে দেরি হবে না।

ডানকান ধৈর্য্যহারা হয়ে উঠে দাঁড়াল। চীৎকার করে বলল,

ভণ্ডামার একটা শেষ আছে। চলে এস আগরওয়ালা। আমাদের প্রশ্নের কেমন করে জবাব আদায় করে নিতে হয় তা দেখে নেব। গায়েব জোরে ছনিয়া চলে না।

অতনু বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি ডানকান সাহেব। আমার ধাবণা ছিল কাবখানা থেকে তাড়া খেয়ে তোমাদের চৈতন্য হবে, কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের গায়ের চামড়া ঢেব বেশী মোটা। কিন্তু শেষ বারেব মত শুনে যাও যে, সে চামড়া ভেদ করবার মত বুলেট আমার কাছে বল্ড আছে বলেই তোমাদেব মুখোমুখী দাঁড়াবাব আযোজন করেছি।

অতনু থামল, তার কথার আঘাতে ওদের মুখের চেহারায় কত-খানি পবিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে তা একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সে পুনরায বলতে সুরু করল, তোমাদের বন্ধুব মত বিশ্বাস করেছিলাম, তাই আমাব ব্যবসায অংশীদার হতে পেরেছিলে। তাই বলে তোমাদের কাববাবের মালিক হতে দিতে আমি পারি না। আমার সামান্য বেতনেব একজন কর্ম্মচারার যতটুকু সততা আছে তোমাদের মধ্যে সেটুকুও নেই। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ সাহেব?

ডানকান পুনরায চাৎকার কবে উঠল, Don't talk non-sense।

অতনু ডানকানের রাগ দেখে হাসল। কোন জবাব দিল না।

আগরওয়ালা ডানকানকে নিয়ে বেশ খানিকটা বিব্রত বোধ করল। তাকে ইঙ্গিতে বাদানুবাদ করতে নিষেধ করেও থামাতে পারল না। ডানকান ক্ষিপ্তেব ন্যায় বলে উঠল, ছুটো বাজে কথা বলে আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পাববেন মনে করে থাকলে আপনিও মারাত্মক ভুল করেছেন।

অতনুব মুখে অবজ্ঞার হাসি দেখা দিল। সে বলল, তুমি আবার আমাকে হাসালে সাহেব। তোমাদের এত বড় রুজি-রোজগারের পথটা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল আর তোমরা চুপ করে থাকবে, এ কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। আমিও তা করি নি। আর তার জন্মে

তৈরী হয়েই আছি। তোমাদের জাল-জুয়াচুরির প্রত্যেকটি নজির আমার কাছে আছে। খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি। তোমাদের সায়েস্তা করতে তাব যে কোন একটাই যথেষ্ট।

অতনু আর একবাব হেসে উঠল। বলল, ওকি আগরওয়ালা সাহেব! তোমার মুখটা অত কাল হয়ে উঠল কেন? ভয় নেই, তোমাদের জাল ধরিয়ে দিযে জেলে পাঠাবাব ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু নিজেদের জালে যদি তোমরা ইচ্ছে করে জড়িয়ে পড় আমি তোমাদের মুক্ত করতে পারব না এই কথাটাই জানিয়ে দিলাম। ডানকান, তুমি একটু বেশী চেঁচামেচি করছিলে। ওটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখ সে তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান।

ডানকান তথাপি চুপ কবে থাকতে পাবল না। বলল, আবার বলছি, আমরা চুপ করে থাকব মনে কবলে ভুল কবেছেন।

অতনু হেসে বলল, ডানকান সাহেব কি ভয় দেখাতে চেষ্টা কবছেন?

ডানকান উত্তপ্তকণ্ঠে জবাব দিল, ও কাজ আপনিই ভাল পারেন।

অতনু ধমক দিল, থাম ডানকান সাহেব। স্পর্দ্ধা তোমার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ খোলা দবজাব পানে দৃষ্টি ফিবিযে সে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল, কেষ্ট, বাবুদেব বাইবের পথ দেখিয়ে দাও।

কেষ্ট কাছাকাছি কোথাও ছিল, ছুটে এল।

অতনু পুনরায় বলল, এর পরেও যদি তোমাদের কিছু বলবার থাকে আদালতের মারফৎ জানিও। জবাব পাবে। এবাবে তোমবা যেতে পার।

ডানকান এবং আগরওয়ালা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। কেষ্ট ওদের সঙ্গে গেল।

ওরা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই তনু তার পাইপে অগ্নি-সংযোগ করে চোখ বুজে টানতে সুরু করল।

ডানকানগোষ্ঠীকে সে বিতাড়িত করেছে। গুরুতর তাদের অপরাধ। অন্যায় ভাবে নিজেদের মধ্যে শেয়ার ছড়িয়ে অতনুকে তারা উচ্ছেদ কবতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেক এগিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। অতনুব জন্য তৈরী দড়ির ফাঁস অজ্ঞাতে ওদেরই গলায় আটকে গেছে। টানাটানি করতে গেলে নিজেদেরই মৃত্যু ডেকে আনবে।

সময় থাকতে মিত্রা অতনুকে সাবধান করে দিয়েছে। ডাক্তারও কবেছিল। একবাব নয়, বহুবাব, কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারে নি। মিত্রাকেও সে অবিশ্বাস কবতেই চেয়েছিল। সে হাতে করে নিয়ে এল প্রমাণ। অতনুব বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই মেয়েটিকে ডানকান-আগরওযালাব অনুবোধেই রাখা হয়েছিল। আর দশটা সাধাবণ কর্ম্মচাবীর চেয়ে ওকে আলাদা চোখে সে কোন দিন দেখে নি। হলেই বা সে মেয়ে।

পাইপেব ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে শূন্যের পথে ভেসে চলেছে। আর তারই আবর্ত্তের মধ্যে সহসা এসে মিত্রা দাঁড়িয়েছে হাসিমুখে। এই মুহূর্ত্তে মিত্রা আর সাধারণ নয়। বরং একটু বিশেষভাবেই অসাধারণ মনে হচ্ছে। ওর হাসির মধ্যে একটা দৃঢ়-সঙ্কল্প। মিত্রা আজ তাব কাছে অনন্যা।

অতনু পুনরায় জোরে পাইপে টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া শূন্যে নিক্ষেপ করল।

ডানকান চলে গেছে। চলে গেছে আগরওয়ালা। ডানকানের বুদ্ধিটা একটু মোটা। আগরওয়ালা সতর্ক। তাই সে কথা বাড়ায় নি। গোলমালের সূত্রের সন্ধান পেয়েই থেমে গেছে।

মিত্রাকে ওরা চেয়ারে বসিয়েছিল। সে ওদের পথে বসিয়েছে।

ডানকান-আগবওয়ালাকে ফটকের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসে কেষ্ট খবরটা অতনুকে দিল, বলল, ওরা খুব গালমন্দ করছিল।

অতনু জবাব দিল, আমি জানি—সে পুনরায় চোখ বন্ধ করে ধূমপানে আত্মনিয়োগ করল।

আরও কিছু সময় নিঃশব্দে অপেক্ষা করে কেষ্ট পুনরায় বলল, আপনি কি এখন এখানেই থাকবেন ?

অতনু চোখ না খুলেই জবাব দিল, হুঁ—তুমি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যাও কেষ্ট। আজ আর কেউ যেন আমাকে বিরক্ত করতে আসে না।

কেষ্ট আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যেতেই লঘু পদে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল মিত্রা। মার্জ্জারের মত নিঃশব্দ তার গতি। শুনতে না পাবারই কথা, তাই অতনুর মৃদু আহ্বানে সে চমকে উঠল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস মিত্রা। অতনু চোখ বুজেই বলল, তুমি যে আশেপাশেই উপস্থিত থাকবে তা আমি জানতাম।

কিছুক্ষণ মিত্রার মুখে কোন কথা যোগাল না।

অতনু অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলল, খুব অবাক্ হয়ে গেছ বুঝি ?

মিত্রা তথাপি নিরুত্তর।

অতনু বলতে থাকে, খুব ভয় পেয়ে গেছিলে তুমি। ওরা কিন্তু তোমার সম্বন্ধে একটিও বাজে কথা বলে নি।

মিত্রা এতক্ষণে মুখ খুলল, আমার জন্যে আমি ভাবি নি স্যার।

ভারী আশ্চর্য্য কথা শোনালে মিত্রা, অতনু হেসে উঠে বলল, তা হ'লে ওখানে লুকিয়েছিলে কেন মিত্রাদেবী ? আর এত দুর্ভাবনায় পড়েছিলে কার জন্যে ?

মিত্রা সহজকণ্ঠে জবাব দিল, আমি ডানকান-আগরওয়ালাকে ভয় পাচ্ছিলাম। তারা এত সহজে চলে যাবে আমি ভাবতে পারি নি।

অতনু তার পাইপে পুনরায় গোটাকয়েক টান দিয়ে হেসে বলল, শোন মিত্রা—আমার ঠাকুরদা ছিলেন জমিদার। এক ছটাক জমির জন্য হাসতে হাসতে গোটাকয়েক কাঁচা মাথা দেহ থেকে নামিয়ে দিতে কোনদিন দ্বিধা করেন নি। আমার অবশ্য জমিদারী নেই, কিন্তু দেহে সেই একই রক্ত বইছে। তাছাড়া আমার যা কিছু শিক্ষা তা তাঁরই কাছে হয়েছে। কথাটা শুনে রাখ।

শিক্ষা অতনু যাঁর কাছেই পেয়ে থাক না কেন ডানকান-আগরওয়ালা চক্র তাকে রীতিমত বিব্রত এবং চিন্তিত করে তুলেছে। আইনের সাহায্য তারা নেয় নি। এমন কি সামনা সামনিও এগিয়ে আসে নি। অথচ অষ্টপ্রহর তারা অতনুকে অনুসরণ করে ফিরছে। চোখে দেখা না গেলেও সে স্পষ্ট অনুভব করছে, কতগুলি অদৃশ্য হস্তের দুর্ব্বোধ্য নাড়াচাড়া। অতনু ওদের যত বোকা আর সাধারণ ভেবেছিল তা ওরা নয়। বরং ঢের বেশী চতুর আর হুঁশিয়ার। অলক্ষ্যে থেকে নিজেদের কাজ করে চলেছে। অতনুকে ভাবিয়ে তুলেছে—শঙ্কিত করে তুলেছে।

যে শত্রুকে চোখে দেখা যায়—কাছে পাওয়া যায়, তাকে হয়ত চূর্ণ করাও সম্ভব, কিন্তু নাগালের বাইরে থেকে যারা শত্রুতা করতে সুরু করেছে তাদের কেমন করে কায়দা করবে অতনু ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তার বুদ্ধি তেমন খেলছে না। শুধু একটা অসহনীয় দুশ্চিন্তা দিনের পর দিন তার মনের উপর চেপে বসে অতনুকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে। ফলে তার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। কারণে সে চুপ করে থাকে—অকারণে চাৎকার করে। তার আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা কেউ বা বিস্মিত হয়, কেউ মুখ টিপে টিপে হাসে।

মিত্রা অনুযোগের ভঙ্গিতে বলে, আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন মনে হয়। আপনার কর্ম্মচারাদের দাবিটাই বরং মেনে নিন। সব গোলমাল মিটে যাবে।

অতনু ধমক দিল, ভবিষ্যতে একটু হিসেব করে কথা ব'ল মিত্রা দেবী। আর ভুলে যেও না যে কারখানার পরিচালক তুমি না আমি।

মিত্রা আর কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। যে কোন

কারণেই হউক ইদানিং সে [illegible]সময়েই [illegible]কে তাড়িয়ে রাখতে চায়। অথচ তেতে উঠলেই সেখানে আর দাঁড়ায় না।

শ্রীমতী বলে, কাজটা তুমি ঠিক করছ না। যখন জানতে পেরেছ যে, ডানকান আর আগরওয়ালা এই গোলমালে ইন্ধন যোগাচ্ছে তখন—

বাধা দিয়ে অতনু উষ্ণকণ্ঠে বলল, আমার কাজের সমালোচনা না করলেই আমি খুশী হব।

শ্রীমতী সহজকণ্ঠে বলল, সমালোচনা না হলে সংশোধন হয় না। তা ছাড়া একে সমালোচনা না ভেবে সৎপরামর্শ বলে ধরে নিতে পারছ না কেন?

অতনু অধৈর্য্য হয়ে জবাব দিল, তোমার বাবার মাষ্টারীবিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছ দেখছি, কিন্তু দয়া করে ভুলে যেও না যে, আমি তোমার স্বামী—ছাত্র নই।

শ্রীমতীর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল। নিরস কণ্ঠে বলল, সেটা আমার ভাগ্য! নইলে আপশোষের সীমা থাকত না। তুমি স্বামী-স্ত্রীর বাংলা অর্থও জান না।

অতনু গম্ভীর হয়ে উঠল। একটা শক্ত কথা তার ঠোঁটের ডগায় এসে পড়েছিল। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে বাঁকা হেসে বলল, তোমার বাবা তাঁর মেয়েকে বিয়ে না দিলেই ভাল করতেন। তা হলে তিনি লাভবান হতেন সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলল, তিনি ব্যবসাদার নন—স্কুল-মাষ্টার। লাভ লোকসান কম বোঝেন। কিন্তু তোমার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে যে, তোমার মত যদি তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি থাকত তা হলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হ'ত না।

একটু থেমে শ্রীমতী পুনরায় বলতে থাকে, কোন কথাই তুমি আমাকে বলতে চাও না। বলার আবশ্যক আছে বলেও মনে কর না। তোমার অহঙ্কার তোমাকে অন্ধ করে রেখেছে, নইলে সহজ পথটা চোখে পড়ত। কিন্তু তোমার ইহজন্মেও চোখ ফুটবে

না। বারুদের উপর দাঁড়িয়ে তুমি আগুন জ্বালতে জান—জলের কথা একবার মনেও আসে না। এইটেই আমার বড় দুঃখ।

অতনুর চোখেমুখে খানিক অবজ্ঞা-মিশ্রি হাসি ফুটে উঠল। সে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, জল ঢালা তুমি কাকে বলতে চাও আমি বুঝি না। তিল তিল রক্তেব বিনিময়ে যা-কিছু এতদিন ধরে গড়ে তুলেছি তাকেই দু'হাতে বিনা বাধায় বিলিয়ে দেওয়াকে?

শ্রীমতী বলল, অংশ দেওয়ার নাম বিলিয়ে দেওয়া নয়। তোমার এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে যত রক্তক্ষরণ হয়েছে তার কতটুকু তোমাব আর কতটুকু ওদেব তার হিসেব করে দেখলে এ কথা এত সহজে তুমি বলতে পাবতে না। ওবা বাঁচলে তুমিও বাঁচবে। এ কথা ভাববার দিন আজ এসেছে।

অতনু কঠিন কণ্ঠে বলল, যাবা দূবে বসে তোমার মত সমালোচনা কবে তাবাই এ কথা বলে থাকে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, তুমি আমাব স্ত্রী না আমাব কাবখানার মজুবদের সেক্রেটারী? তোমার কথাবার্তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হযে উঠেছে।

শ্রীমতী খানিক স্থিরদৃষ্টিতে অতনুর মুখেব পানে চেয়ে থেকে তিক্ত হেসে বলল, আমাব ভুল হযেছে। তোমাকে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। তুমি কৃপার পাত্র।

চলে যাবাব জন্য শ্রীমতী পা বাড়াতেই অতনু তাকে বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়াও। তাব রক্তেব মধ্যে প্রচণ্ড দাপাদাপি সুরু হয়েছে। সে ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, তোমার বাবার একটা জিনিস আমাব খুব ভাল লাগে।

শ্রীমতী ঘুরে দাঁড়াল।

অতনু বলতে থাকে, অবাধ্য ছাত্রকে বেত মেরে শাসন করাটা। আমরা শাসন করি অবাধ্য ঘোড়াকে চাবুক মেরে।

শ্রীমতীর দু' চোখ জ্বলে উঠল। সে তীব্র ঘৃণাভরে অতনুর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অতনু হো-হো করে হেসে উঠল। শব্দটা শ্রীমতীকে তাড়া করে নিয়ে চলল। অতনু যেন আজ পাগল হয়ে গেছে। অতি সাধারণ আর সহজ কথাটাকেও সে বুঝতে চাইছে না। নিজের কথার গুরুত্বও সে নিজে বুঝতে পারছে না। শ্রীমতী একপ্রকার ছুটতে ছুটতে এসে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সশব্দে দবজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর স্থিরভাবে চিন্তা কবতে লাগল। ঝোঁকের বশে হঠাৎ একটা-কিছু কবে বসবার মত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে শ্রীমতী নয। তাই বলে এত বড অপমানকেও সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। এ বাড়ীতে প্রবেশ করবার পর একে একে সে তার বহু মত এবং পথকে ত্যাগ কবেছে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, এমনি এক মধ্যপন্থা বেছে নিয়ে অবস্থাব সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা সে কবে আসছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই বলে শ্রীমতী আব ভাবতে পাবছে না। তাব মাথাব মধ্যে দপদপ করছে। এখানে আর একটি মুহূর্ত্ত থাকতে তার মন চাইছে না। কিন্তু তার এতবড পবাজয় বাবার বুকে কত বড যে আঘাত কববে এই কথা ভাবতে গিয়ে তাকে বাবে বাবে চতুর্দ্দিকে তাকাতে হচ্ছে। তা ছাডা সর্ব্বাঙ্গে এতখানি পরাজয়েব গ্লানি মেখে অপবেব কাছেই বা সে মুখ দেখাবে কেমন করে। তারপব···তারপর কেন সেই কথাটাই ত তাকে আজ সর্ব্বাগ্রে ভাবতে হচ্ছে। শ্রীমতী আজ আব একলা নয়। তাব দেহকে আশ্রয় কবে ধীবে ধীবে বেড়ে উঠছে অতনুর সন্তান। তার ত কোন অপরাধ নেই।

শ্রীমতী বাথরুমে প্রবেশ করে বহুক্ষণ ধবে মাথায় জলের ধারা দিল। তারপর ফিরে এসে কাপড বদলে ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ী নিয়ে বার হয়ে পডল।

গাড়ীর শব্দটা অতনুর পরিচিত। সে উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। অদৃশ্যমান গাড়ী আর তার আবোহিনীর পানে চেয়ে চেয়ে তাব হু'চোখ উত্তেজনায় জ্বলে উঠল। অতনু জানে কোথায়

শ্রীমতী গেল। ডাক্তারের ওখানে আসা-যাওয়াটা কিছুদিন ধরে তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কথাটা ডাক্তারকে জানিয়ে দেবারও সময় হয়েছে। অতনু ঘরময় পায়চারি করতে করতে ভাবছিল।

মিত্রা এসে ঘরে প্রবেশ কবল।

অতনু দেখেও দেখল না।

মিত্রা চলে যাবার উদ্যোগ করতেই অতনু ডাকল, কতক্ষণ এসেছ?

এইমাত্র, মিত্রা জবাব দিল।

যাচ্ছ কেন? বস। অতনু বলল, এবং নিজেও একটি সোফায় দেহ এলিয়ে দিল।

মিত্রা নিঃশব্দে তার পাশের সোফায় উপবেশন করতেই অতনু সবাসরি বলল, তোমার বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির উপর আমার আস্থা আছে মিত্রা।

মিত্রা বলল, আপনি বোধ হয় ঠাট্টা কবছেন···

অতনুর কণ্ঠস্বরে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে বলল, তোমার সঙ্গে আমাব ঠাট্টার সম্বন্ধ নয় মিত্রা। তা ছাড়া অকারণে ঠাট্টা করাটা আমি পছন্দ করি না।

নিরীহ কণ্ঠে মিত্রা জবাব দিল, আমার বুঝতে ভুল হয়েছে—

অতনু বলল, ডানকান-আগবওয়ালা-চক্র পূর্ণবেগে ঘুরতে সুরু করেছে মিত্রা। আমি তাদেব চিরদিনের জন্য থামিয়ে দিতে চাই।

মিত্রা বলল, চক্র যে সত্যিসত্যিই ঘুবতে সুরু করেছে তা আপনাকে কে বললে? আব যদি ঘুরতেও থাকে তাতেই বা ভয় পাবার কি আছে?

ভয় অতনু যেন গর্জ্জন করে উঠল।

মিত্রা একটু হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ ভয়—নইলে আপনি এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠতেন না। আপনি রাগ করবেন না—সত্যি-সত্যিই আপনি এত ভয় পেয়েছেন যে, কারুর ভাল কথাও আর ভাল মনে নিতে পারছেন না। আমার কথা ছেড়ে দিন—বাইরের

লোক, আপনার একজন সাধারণ কর্ম্মচারী, কিন্তু আপনি আপনার স্ত্রীকেও অকারণে না হোক দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।

খানিক চুপ করে থেকে অতনু বলল, স্ত্রীর কথা থাক। তোমার কথা বল। আমি শুনব।

মিত্রার মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল। বলল, আমিও যদি আপনার স্ত্রীব কথা ক'টিই আবাব নতুন করে বলি তা হলে কি তা আপনার ভাল লাগবে? তিনি ত কিছু অন্যায় বলেন নি।

অতনু পুনবায় উত্তেজিত হযে উঠল। বলল, ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয় মিত্রা। কিন্তু এইসব বস্তা-পচা অতি সাধারণ উপদেশ-গুলো শুনতে আমাব ভাল লাগে না। নতুন কিছু শোনাতে পাব? নতুন কোন পথের সন্ধান দিতে পাব তুমি? যাতে করে সবদিকে একটা সামঞ্জস্য থাকে? তোমার প্রচুর বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, সেই সঙ্গে আছে সজাগ দৃষ্টি। একদিন তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিযেছ মিত্রা। সেইজন্যই তোমাকে এত কথা বলছি। যদি গ্রহণযোগ্য কোন পথ তোমাব জানা থাকে আমাকে দেখিয়ে দাও।

মিত্রা শান্ত গলায় বলল, গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা বিচার করে দেখবে কে অতনুবাবু? আপনি নিজে ত? আমাব মুস্কিল ত সেইখানে। আপনার মনেব মত কবে বলতে না পাবলেই রাগ করবেন। তাব চেয়ে আপনাব পথ আপনিই দেখে নিন।

অতনু বলল, তোমাব বক্তব্যটা কি মিত্রা?

খুব সহজ অতনুবাবু। মিত্রা গম্ভীব কণ্ঠে বলতে থাকে, আপনার স্ত্রীর যুক্তি আর অনুবোধকে যে ভাবে উপহাস আর অসম্মান দেখিযে উপেক্ষা কবেছেন তারপরেও কি আপনি আশা করেন যে, আমাব মত একজন নগণ্য কর্ম্মচাবী আপনাকে কোন যুক্তি-পরামর্শ দিতে পাবে?

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলল, বার বার তুমি ঐ একটা কথা বলছ কেন মিত্রা? আমি ত তোমাকে ঠিক ও ভাবে দেখি না।

মিত্রা স্নিগ্ধহেসে বলল, সেটা আপনার অনুগ্রহ। আজ দয়া করে মূল্য দিতেও পারেন, কাল ইচ্ছে করলে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিতেও পারেন। আমার কাছে এ অনুগ্রহের যথার্থ কোন মূল্য নেই অতনুবাবু।

অতনু খানিক স্থিরদৃষ্টিতে মিত্রার মুখের পানে চেয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলে, আমি তোমার বন্ধুত্বের দাবি করছি।

মিত্রা বলে, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না অতনুবাবু। মাঝে একটা মস্তবড় ফাঁক থেকে যায়। তা ছাড়া কেমন করে আপনার একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি? যে লোক স্ত্রীর বন্ধুত্বকে সহজ মনে মেনে নিতে পারে না, তাঁর মুখে এ কথা সত্যিই কি পরিহাসের মত শোনায় না?

অতনু বলে, আমাদের মধ্যের প্রত্যেকটি কথাই তুমি শুনেছো দেখছি।

মিত্রা জবাব দিল, আমার দুর্ভাগ্য, আপনার প্রত্যেকটি কথাই আমার কানে গেছে।

অতনু বলল, সে যা ব'লেছে তা অপরের শেখান বুলি—শ্রীমতী স্রেফ মুখস্থ বলে গেছে।

মিত্রা বলল, তাতেই বা ক্ষতি কি? ভাল ভাল কথা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শিখি না অতনুবাবু—মেহনত করে শিখতে হয়।

অতনু উষ্ণ হয়ে উঠেও সামলে নিয়ে বলল, তোমাদের সকলেরই দেখছি এক রোগ। সুযোগ পেলেই উপদেশ দিতে সুরু কর। ওটা একটু কম করে দিলে ক্ষতি কি?

মিত্রা বিন্দুমাত্র না দমে সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু যারা আপনার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী তারা সব সময় এ কথা বলবে। আপনার স্ত্রী এবং ডাক্তারবাবু—

বাধা দিয়ে অতনু বলল, তাদের কথা আমি জানিনে মিত্রা, কিন্তু তোমার সত্যিকার পরিচয় আমি পেয়েছি বলেই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি।

মিত্রা মৃদু হেসে বলল, আপনার কি কখনও ভুল হতে পারে না ? আপনি অত্যন্ত বাড়িয়ে বলে আমাকে সঙ্কোচের মধ্যে ফেলছেন। তা ছাড়া এতবড় একটা সমস্যাপূর্ণ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা এত সহজে হয় না অতনুবাবু।

অতনু বলল, শ্রীমতী কিন্তু কিছু না ভেবেই উপদেশ দিতে এগিয়ে এসেছিল মিত্রা।

মিত্রা বলল, তাঁরা হয়ত অনেক আগেই ভেবে রেখেছিলেন। আমাকে আপনি মাপ করুন। এ নিয়ে অনর্থক আমাকে প্রশ্ন না করে নিজেই ভেবে-চিন্তে একটা পথ আবিষ্কার করে নিন। সেইটেই হয়ত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে। তবে আমাদের যুক্তিগুলোকে নিছক কুযুক্তি ভেবে অন্যায় ভাবে বাতিল করে দেবেন না যেন।

বলেই কতকটা খাপছাড়া ভাবে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

অতনু বিস্মিত ভাবে তার চলার পথে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

১৯

আশ্চর্য্য ! মিত্রা তার নিজের ব্যবহারে সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এমনটি কেমন করে সম্ভব হ'ল তা সে নিজেও সঠিক ভেবে পেল না। যে কথাগুলি কথাপ্রসঙ্গে সে অতনুকে বলে এল এইটেই কি তার মনের কথা ? এ কথা সে বলতে চায় নি। কেউ যেন তাকে দিয়ে জোর করে বলিয়ে নিয়েছে। এ পথ তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ নয়। মিত্রা কি করতে চেয়েছিল আর কি সে করতে বসেছে।

আগরওয়ালা আর ডানকান তার দেহটাকে অপবিত্র করেছে। এই মূল্য দিয়েই তাকে মুক্তি ক্রয় করতে হয়েছিল। অতনু তার সর্ব্বনাশ করতে গিয়েও করেনি। ওদের হাতে ফেলে রেখে নিজে সরে গিয়েছিল। আর ঐ দুই নরপশু তার দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে

খেয়েছে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। এতবড় অন্যায়কে একমুহূর্ত্তের জন্যও মিত্রা ভুলতে পারে নি। অতনুকেও সে একই দলভুক্ত করে বিচার করে রায় দিয়েছিল। ডানকান আর আগরওয়ালাকে আশ্রয় করেই সে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে—ফিরে আঘাত করবার প্রত্যাশায়। তারপর সময় এবং সুযোগ বুঝে আঘাত হেনেছে। রাজ-সিংহাসন থেকে একেবারে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু এইখানেই মিত্রার থেমে যাবার কথা নয়। থেমে যাবার জন্য সে আরম্ভ করে নি। তার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের একে একে চূর্ণ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই মিত্রা এই সিংহগহ্বরে প্রবেশ করেছিল। অতনুকেও সে ঘৃণা করে—সেই সঙ্গে কিছুটা ভয় এবং শ্রদ্ধাও করে। তার অপরাধটাকে খানিকটা লঘু করে দেখবার চেষ্টাও সে করে। কিন্তু ডানকান আর আগর-ওয়ালাকে শুধু ঘৃণাই করে। পেটের জ্বালায় ওদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। খুবলে খুবলে গায়ের মাংস তুলে নেয়। নেকড়ের মত লোভী আর শিয়ালের মত ধূর্ত্ত ওরা। মাংসের লোভ অতনুরও আছে। কিন্তু সে লোভের মধ্যেও একটা রাজকীয় আভিজাত্য আছে। ক্ষুধা আছে হ্যাংলামী নেই। যে শিকার একবারে ধরতে পারে না তার পিছু নেওয়ার প্রলোভন ওর নেই। কথাটা যতই দিন যাচ্ছে, মিত্রা ততই অনুভব করতে পারছে। তাই আঘাত করবার সুযোগ পেয়েও সে নিজেকে সংযত রেখেছে। এই সামান্য ক'টা মাসের সান্নিধ্য মিত্রাকে ভিতরে ভিতরে অনেকখানি দুর্ব্বল করে ফেলেছে। আর এই দুর্ব্বলতার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ লুকিয়ে আছে এ কথাটাও আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এতদিন মিত্রার মধ্যে যুক্তি-বিচারের স্থান ছিল না। শুধু একদিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু ডানকান আর আগর ওয়ালা ধরাশায়ী হতে সে চলা বন্ধ করে ভাবতে সুরু করেছে এবং নিজের মনের এক আশ্চর্য্য রূপ দর্শনে স্তম্ভিত-বিস্ময়ে হতচকিত

হয়ে গেছে। এমন অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হতে পারে? অমৃত বলেই কি এতখানি বিষেও তাকে ম্লান করতে পারে নি।

মিত্রা আবার নতুন করে ভাবতে বসেছে। ভাবতে বসেছে তার ক্ষতির পরিমাণ কতখানি আর কতটুকু ক্ষতি সে তার পরিবর্তে করতে পেরেছে। কতটুকু সে করতে পারত সেটা বড় কথা নয়। কতটুকু করেছে সেইটেই হিসেব সাপেক্ষ। অতনু থাবা গুটিয়ে নিয়েছিল তার অসহায় অবস্থা দেখে, কিন্তু তার পার্শ্বচর নেকড়ে দুটো সুযোগ নিয়েছিল সেই অসহায় অবস্থার। আক্রান্ত উভয় দিক থেকেই সে হয়েছিল, আর না বুঝে, মিত্রা নেকড়ের গহ্বরে গিয়ে ধরা দিল। যে সুন্দর দেহটাকে কেন্দ্র করে তার জীবনে এত বড় একটা দুর্ঘটনা দেখা দিয়েছিল তাকেই শেষ পর্য্যন্ত সে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করল।

একমুহূর্ত্তে মিত্রা বদলে গেল। তার মুখভাব বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তার পুরানো ক্ষতস্থান থেকে আবার নতুন করে রক্ত-ক্ষরণ সুরু হয়েছে। মিত্রার স্বপ্নে-গড়া সুন্দর মন আর ফুলের মত নরম দেহটাকে নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলেছে। সে তুলনায় মিত্রা ওদের কতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছে? মিত্রা নিজেকে নিজে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করে। ওরা প্রয়োজন মিটিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছে। বলেছে, ওরা নাকি শুধু অতনুর ইচ্ছাকেই পূরণ করেছে। আসলে তারা আজ্ঞাবহ মাত্র।

মিত্রা ভিতরে ভিতরে গুমরে মরেছে—মুখে বোকার মত হেসেছে। প্রকাশ্যে আরও এগিয়ে গিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। ওরা ক্ষতিপূরণ করবার অছিলায় তাকে অতনুর কারখানায় নিয়ে এসে চাকরি দিয়েছে। মিত্রা কৃতজ্ঞতা জানাবার ছলে নানাভাবে তাদের প্রলুব্ধ করেছে। অন্তরঙ্গতার সুযোগ নিয়ে পরামর্শ দিয়েছে। পরামর্শ মত কাজ করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তার-পরে সুযোগ মত সে পাশ ফিরেছে, ওরা গড়িয়ে পড়েছে।

অতনুর সঙ্গে সঙ্গোপনে দেখা করে ডানকান-আগরওয়ালার

বিশ্বাসভঙ্গের দলিলপত্র তার হাতে তুলে দিয়ে এল মিত্রা। তাদের উদ্যত ফণা আর বিষদাঁত একটি আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল। এইবার অতনুর পালা। যার জন্য মিত্রাকে আরও ঢের বেশী সতর্ক হয়ে এগোতে হয়েছে। পাশের অনুচর দুটো গেছে বটে, কিন্তু তারাও যে চুপ করে নেই তা সে টের পেয়েছে। তার প্রমাণ অতনুর কারখানার বর্ত্তমান অস্থির পরিণতি। মিত্রার দাবার ঘুঁটি অবশ্য এখানেও অলক্ষ্যে থেকে চলাচল করছে।···

কে—মিত্রা যেন ভয় পেয়েছে এমনিভাবে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

আমি—সাড়া দিয়ে অতনু দৃঢ় পদক্ষেপে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কিন্তু তুমি অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন বল ত?

মিত্রা বিব্রতকণ্ঠে বলল, আপনি এত রাত্রে আমার ঘরে

বাধা দিয়ে শান্ত হেসে অতনু জবাব দিল, কত আর রাত হবে মিত্রা? এই ত সবে বারটা বাজল।

বা-র-টা · মিত্রার কণ্ঠে বিস্ময়, কিন্তু আপনি খুব অন্যায় কাজ করেছেন অতনুবাবু। আপনার স্ত্রীর চোখে পড়লে তিনি ভুল বুঝতে পারেন।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে অতনু জবাব দিল, খুবই স্বাভাবিক। তবে শুনে আশ্বস্ত হতে পার তিনি এখনও ফিরে আসেন নি। আর ফিরলেও তোমার কাছে আমাকে আসতেই হ'ত।

একটু থেমে, একটু হেসে সে পুনরায় বলল, ভেবে দেখলাম শত্রুই হউক, আর মিত্রই হউক, তাকে মুখোমুখি পাওয়াই শ্রেয়। তোমার কি মত?

অতনুর কথা বলার ধরনে ভিতরে ভিতরে মিত্রা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করলেও প্রকাশ্যে যথাসম্ভব সংযম রক্ষা করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ঠিক কথাই বলেছেন অতনুবাবু। তাতে সহজ জিনিস অকারণে ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে না।

অতনু হো-হো করে হেসে উঠে বলল, আমার মনের কথা

বলেছ তুমি। কথাটা বুঝতে পেরে আর এক মুহূর্ত দেরি করি নি। খোলাখুলি তোমাকে বলবার জন্য ছুটে এসেছি।

মিত্রা বিস্ময়ের ভান করে বলল, এত লোক থাকতে এ কথা আমাকে বলবার জন্য কেন ছুটে এসেছেন ঠিক বুঝলাম না অতনুবাবু!

বিচিত্র ধরনের খানিকটা হাসি অতনুর মুখে ফুটে উঠল। সে সহজ কণ্ঠে বলল, বুঝতে তুমি ঠিকই পেরেছ মিত্রা। আমি আমাদের এই এতদিন ধরে অভিনয় করে যাবার কথা বলছি। এবারে ওগুলো বাদ দিয়ে চললে কেমন হয়?

আলোচনার এই আকস্মিক পটপরিবর্ত্তনে মিত্রা মুহূর্ত্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়লেও অল্পেই সামলে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, কাকে আপনি অভিনয় বলছেন স্যার?

অতনু অম্লান হেসে পুনরায় বলতে লাগল, তোমার আমার লুকোচুরি খেলার কথা বলছি মিত্রা। তোমার একটু আগের কথাগুলোই যদি ধরা যায়—

মিত্রা ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, আপনার আজ কি হয়েছে বলুন ত অতনুবাবু? আপনি কি অসুস্থ?

অতনু প্রশান্ত হেসে বলল, অসুস্থ—না মিত্রা, বরং আজকের মত সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে এর আগে কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা বলি নি। তুমি মিথ্যা চেষ্টা করছ। আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি আমার বক্তব্যটা সহজ আর খোলা মনে গ্রহণ করতে দ্বিধা করছ। এইটেই স্বাভাবিক।

একটু থেমে সে পুনরায় বলল, ভাল কথা—না হয় আর একটু খোলাখুলি ভাবেই বলছি। শোন মিত্রা, অতনু যাকে একদিন দেখেছে তাকে কোনদিন ভোলে না। তোমাকেও আমি ভুলি নি। সামান্য একটু ভুল বুঝেছিলাম। তাই শুধরে নেবার চেষ্টা করছি।

অতনুবাবু! মিত্রা আর্ত্তনাদ করে উঠল।

অতনু হাসিমুখে বলতে থাকে, ভয় পেও না মিত্রা। যদিও

ইতিপূর্বে একদিনের জন্যও তোমাকে আমি মিত্র হিসেবে দেখিনি আর সব সময়ই তুমি আমার সজাগ প্রহরাধীনে ছিলে, তবুও আমি আজ বন্ধুর মতই তোমার কাছে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

একটু থেমে অতনু পুনরায় বলতে থাকে, চেয়ে চেয়ে দেখছ কি মিত্রা? সত্যি বলছি তোমার মত আমিও তোমাকেই আমার কার্য্যোদ্ধারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব বলেই আমার কারখানায় প্রবেশ অধিকার দিয়েছিলাম।

মিত্রা কম্পিত কণ্ঠে বলল, আপনার এসব কথার অর্থ?

অতনু স্নিগ্ধহেসে বলল, অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। তুমি কূটনীতির সাহায্যে দুর্জ্জনকে সায়েস্তা করবার ব্রত নিয়েছিলে। আর আমি তোমার সাহায্যে নিজের পথ পরিষ্কার করেছি। ডানকান আগর-ওয়ালার ওপর আমারও নজর ছিল। ছিল না প্রামাণ্য দলিলপত্র।

এর পরে আর গোপন করবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সত্যের মুখোমুখি সোজা হয়ে মিত্রা দাঁড়াল। দৃঢ়কণ্ঠে বলল, সেটা কি খুব অন্যায় করেছি অতনুবাবু?

অতনু সহজ কণ্ঠে বলল, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবার ইচ্ছে আর আমার নেই মিত্রা। আমি শুধু বলতে চাই যে, একই অস্ত্রে সকল শ্রেণীর পশুকে বলি দেওয়া যায় না। অস্ত্রের ধার এবং ভার দুই পরীক্ষা করে নিতে হয়। সেইখানেই তোমার ভুল হয়ে গেছে।

সহসা মিত্রা যেন ক্ষেপে উঠল, এভাবে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাসটা আপনি ছাড়ুন অতনুবাবু।

অতনু বলল, কিন্তু ঢিলটা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় তা হলে অন্ততঃ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে মিত্রা।

মিত্রা নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল, অভিনয় করতে আপনি নিষেধ করেছেন, আবার আপনিই নির্ব্বিবাদে অভিনয় করে চলেছেন।

অতনু হাসিমুখে বলল, তোমার কি সত্যিই তাই মনে হচ্ছে মিত্রা?

মিত্রা প্রতিবাদের সুরে জবাব দিল, মনে হচ্ছে না অতনুবাবু—যা সত্যি, সেই কথাই আপনাকে জানিয়েছি।

অতনু দৃঢভাবে প্রতিবাদ জানাল। তোমার কথা যে কত বড় মিথ্যে তা আমার চেয়েও তুমি বেশী জান। তোমার দোষ নেই মিত্রা। আমি হলেও তোমার পথেই চলতাম। কিন্তু আরম্ভ করতে পারাটা যত সোজা, থামতে পাবাটা তত সোজা নয়। তুমি হঠাৎ মাঝপথে থেমেছো—বার বার পিছন ফিবেও তাকাচ্ছ। আশেপাশের চেহাবা দেখে কতকটা দিশেহাবা হয়ে পড়েছ। অথচ কথাটা স্বীকার কবতে পারছ না। তোমার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। তবে যা তুমি খুইয়েছ তা ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। বড জোর কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে পারি। তাই জিজ্ঞেস কবেছিলাম মিত্রা, তোমার এই থেমে যাওয়াটা কি সত্যিই থামা না সাময়িক বিবতি মাত্র?

বহুক্ষণ মিত্রা আব কথা বলল না। নিঃশব্দে নতমুখে বসে কিছু চিন্তা কবে যখন সে মুখ তুলে তাকাল তখন সে মুখে ভয়-ভাবনার পবিবর্তে একটা দৃঢ সঙ্কল্পেব চিহ্ন ফুটে উঠল। সে স্থির-অবিচলিত কণ্ঠে বলল, আমার মুখের কথায় কি আপনি আস্থা রাখতে পারবেন অতনুবাবু? আর আমি থামলেও আপনাব পক্ষে থামা কি সম্ভব হবে?

অতনু বলল, তোমার নিজেব কথা বল মিত্রা।

বড় করুণ ভাবে একটু হেসে মিত্রা বলল, বুদ্ধির লডাইতে আমি হেরে গেছি। তা ছাডা আমার নিজের মনই আমাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে। আমার এগুবার শক্তি ত নেই-ই, পিছিয়ে যাবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। নিজেব বুদ্ধির অহঙ্কার অনেক দূরে আমাকে টেনে নিয়ে গেছে অথচ ফেবার পথ আমার জানা নেই। কোন রকমে আমায় সুকতে ফিরিয়ে আনতে পাবেন অতনুবাবু? বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে একবিন্দু মিথ্যে বলছি না।

অতনু বলল, তোমার স্পষ্ট স্বীকৃতির জন্য ধন্যবাদ। সেদিনে তুমি বাঁচবার জন্য পালাতে চেয়েছিলে, কিন্তু বাঁচতে পার নি, আর আজ মরবার জন্য ফাঁদে পা দিয়েও বেঁচে গেলে মিত্রা।

মিত্রা সহজ কণ্ঠে বলল, আপনার কথাগুলো ঠিক হ'ল না। আমাদের দু'জনের বেলায়ই ওটা সমান সত্য, কিন্তু আজ আর এসব আলোচনা থাক। অনেক রাত হয়েছে। আপনি এবারে যান।

অতনু বলল, এতক্ষণ ধরে শুধু বাজে কথা বলেই গেলাম। আসল কথা এখনও যে বলাই হয় নি মিত্রা।

মিত্রা অনুনয় করে বলল, এ আলোচনা একটি রাতের জন্য মুলতুবী রাখা কি কিছুতেই সম্ভব নয়?

অতনু বলে, আজকের প্রশ্ন কাল হয়ত সহস্র চেষ্টায়ও আর মনে আসবে না।

মিত্রা বলল, তা হলে ওটা একটা সমস্যা নয়। কিন্তু আপনি এবারে দয়া করে যান। আপনার স্ত্রী বহুক্ষণ ফিরে এসেছেন। আমাকে সম্ভ্রম দেখাতে না পারেন ক্ষতি নেই, তা বলে নিজের কথা ভেবে দেখছেন না কেন?

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলে, যে অপরকে সম্ভ্রম দেখাতে জানে না নিজের কথা তার মনেই আসতে পারে না। তবে বলছ যখন, যাচ্ছি। প্রশ্ন কালকের জন্যই তোলা থাক।

অতনু ধীরপদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

১০

মিত্রার ঘর থেকে বের হয়ে এসে আপন শয়নকক্ষের প্রবেশ-দ্বারে অতনুর শ্রীমতার সঙ্গে দেখা হ'ল। শ্রীমতা তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপক্রম করতেই অতনু তাকে আহ্বান জানিয়ে প্রশ্ন করল, এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে দয়া করে বলবে কি? রাত এখন ক'টা তা জান?

শ্রীমতী কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, আমি জানি।

শ্রীমতীর উত্তর দেবার ধরনে অতনুর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। সে শ্লেষ করে বলল, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী।

শ্রীমতী ভ্রূভঙ্গি করে জবাব দিল, তাই নাকি! খুব আশ্চর্য্য কথা ত!

অতনু চীৎকার করে উঠল, তোমার সাহস দেখছি দিন দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি এতবড় কথা বলতে পার

বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, বলবার দরকার কি যখন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই চুকে যায়।

অতনু অবাক-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ শ্রীমতীর মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে কথা ক'টি পুনরুক্তি করল, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই চুকে যায় তারপরেই ক্ষীপ্তকণ্ঠে বলল, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, সুচরিতা শ্রীমতী এই রাত একটা পর্য্যন্ত কার নিকুঞ্জে কাটিয়ে এইমাত্র ফিরে এলে?

এই অশ্লীল ইঙ্গিতে শ্রীমতীর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। সে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অতনুর পানে চেয়ে দেখে অবজ্ঞাভরে পিছন ফিরে দাঁড়াল। কোন জবাব দেবার প্রবৃত্তি তার হ'ল না। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে সে তখন কাঁপছিল।

অতনু পুনরায় গর্জ্জে উঠল, পিছন ফিরে দাঁড়ালেই ভেবেছ তুমি রেহাই পাবে? তা হলে আজও অতনুকে চেন নি?

শ্রীমতী তেমনি নীরব।

অতনু কুশ্রীভাবে হেসে বলল, আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গান তোমার কাছে নিষিদ্ধ হ'ল। আর সেই সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের অন্নও উঠল।

শ্রীমতী পুনরায় ফিরে দাঁড়াল। দৃপ্তকণ্ঠে বলল, তোমার আর কিছু বলবার আছে কি? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রলাপ শুনবার মত আমার সময় নেই।

অতনু ব্যঙ্গ করে বলল, অনেক দিন ধরেই তোমার সময়ের অকুলান হচ্ছে, তাই এখন থেকে যাতে প্রচুর সময় পাও তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বলেই অতনু টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডায়েল ঘোরাতে সুরু করল।

শ্রীমতীর সারা মুখে কালি ঢেলে দিল। অতনু বলছিল, হ্যাঁ আপনাকেই আমার দরকার ডাক্তারবাবু। কাল থেকে আপনাকে আর দরকার নেই, আমার লিখিত চিঠি এবং আপনার প্রাপ্য কালই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সশব্দে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে অতনু সোজা হয়ে দাঁড়াল।

শ্রীমতী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল। অপরিসীম ব্যথায় আর লজ্জায় সে একেবারে নুয়ে পড়ল।

অতনু হিংস্র উল্লাসে হেসে উঠে বলল, আমার কথায় আর কাজে কোন তফাৎ নেই, বুঝলে?

শ্রীমতী ফেটে পড়ল, অর্থাৎ—

অতনু কটু কণ্ঠে বলল, সেটা কাল সকাল থেকেই জানতে পারবে। তবুও শুনে রাখ—ঘরের বাইরে পা বাড়াবার চেষ্টা ক'র না। বাধা পাবে। আর সেটা কোন তরফেরই সম্মানের হবে না।

শ্রীমতীর মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। সে অবজ্ঞাভরে বলল, হুকুম তুমি একটা কেন একশ'টা দিয়ে রাখতে পার, কিন্তু সে হুকুম মেনে চলা না চলা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছে, এ কথাটাও তাহ'লে জেনে রাখ।

বলেই আর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

মিত্রার ঘরের দরজার পাল্লা দু'টাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুজে গেল।

অতনু পাগলের মত খানিক একলা একলা হাসতে থাকে। তার-পর এক সময় নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তার পাইপে অগ্নি

সংযোগ করে উপর্য্যুপরি ধূম উদগীরণ করতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে অতনু নিজেকে এক নতুন মূর্ত্তিতে দেখতে পেল। এ তার আর এক রূপ। অপরিসীম ক্লান্তিতে সে যেন ভেঙে পড়েছে। মুখের হাসিটাও অত্যন্ত বিষণ্ণ। এত দুর্ব্বলচিত্ত অতনু কোনদিন ছিল না। অতনু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছে—এ তার উত্থান না পতন।

নিঃশব্দ চিন্তার অবকাশে ধূম্রজাল অপসারিত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তার নুয়ে-পড়া মনটাও অনেকখানি সজাগ হয়ে উঠেছে। নিজের চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে অতনু জাগিয়ে তুলল। দেয়াল-আলমারির একটা গোপন অংশ থেকে সে হুইস্কির বোতল বের করল। ভেঙে পড়লে তার চলবে না। তাকে আরও দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। আরও ঢের বেশী দৃঢ়! ঘরে-বাইরে নিজেকে সে হাস্যাস্পদ করে তুলতে পারবে না।

খানিকটা নির্জ্জলা হুইস্কি অতনু গলায় ঢেলে দিল। তার রক্তের মধ্যে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল।

একবার সে শ্রীমতীর রুদ্ধদ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্ত্তে শ্রীমতী কি করছে তার ঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু কিছুই বোঝার উপায় নেই। অতনু পুনরায় খানিকটা হুইস্কি তার গলায় ঢেলে দিল। নিজেকে সে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছে না। ঘুরে-ফিরে শুধু একটা কথাই বারে বারে তার মনে হচ্ছে। কাজটা হয়ত সে ভাল করে নি। বড্ড বেশী এগিয়ে গেছে সে। এবং সম্ভবত নিতান্ত অকারণে।

অতনু পুনরায় হুইস্কির বোতলটা তুলে নিল।

আর পাশের ঘরে শ্রীমতী তখন তার দু'হাতের মধ্যে নিজের মাথাটা চেপে ধরে চুপ করে বসে আছে। তার মনের মধ্যে ক্ষণ-পূর্ব্বের ঘটনাগুলি একের পর এক আনাগোনা করছে। কিন্তু কোন চাঞ্চল্য নেই। নিজেকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে সামলে নিয়েছে। তার ভবিষ্যৎ-কর্ম্মপন্থাও স্থির করে ফেলেছে। এমনি

এক চঞ্চল প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে ঘর-করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনকে গলা টিপে মেরে দেহের প্রয়োজন মেটাতে সে পারবে না। এখানকার সোনার খাঁচার মোহ আর তার নেই। সে মুক্তি চায়। অতনুর সন্তানকে শ্রীমতী গর্ভে ধারণ করেছে—তার দেহের রক্তমাংস দিয়ে তাকে পালন করে ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ তাকে দিতেই হবে। তারপব · হ্যাঁ তাবপর না হয় ভেবে দেখবে—না হয় সন্তানেব দাবীও সে ছেড়ে দেবে।

অতনু সত্যই কৃপার পাত্র। নইলে তাকে উপলক্ষ্য করে ডাক্তাববাবুর মত একজন যথার্থ শুভানুধ্যায়ীব সঙ্গে এমন অভদ্রোচিত ব্যবহার করতে তাব আটকাত। যে লোক তার ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তায় অধীর হয়ে শ্রীমতীকে ডেকে পাঠিয়ে এতক্ষণ ধরে নানা জল্পনা-কল্পনা করে স্থিরলক্ষ্যে পৌঁছিলেন তাঁকেই কিনা · শ্রীমতী আর ভাবতে পারে না। ভাবতে সে চায় না। শুধু দুঃখে আর লজ্জায় সে মরমে মরে গেল।

শ্রীমতী একটি অ্যাটাচি কেসেব মধ্যে তাব বাবার দেওয়া সোনার গহনা ক'খানি ভবে বাখল। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকা নিতেও সে ভুল করল না। যদিও টাকাটা নেবার আগে সে বার বার ইতস্ততঃ করেছে। কিন্তু অতনুব সন্তানের জন্য যে, গুরুদায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে তাব জন্য টাকার প্রয়োজন হবে। সুতরাং টাকা তাকে নিতেই হ'ল এবং কিছু বেশী পরিমাণেই নিল। অবশ্য এ টাকাটা অতনুব তহবিল থেকে তাকে নিতে হয় নি। তাকেই উপহাব দেওয়া হয়েছিল আর শ্রীমতী খবচ না করে তা তুলে রেখে ছিল।

এ নিয়ে অতনু বহুবার তাকে ঠাট্টা কবেছে। বলেছে, জমিয়ে রাখাটাই বড় কথা নয়, ব্যয় কবতেও জানতে হয় শ্রীমতী। নইলে টাকার কোন দাম থাকে না।

উক্তিটি মেনে নিয়ে শ্রীমতী সেদিন হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল, খুব সত্যিকথা বলেছ। গরীবের মেয়ে কিনা, তাই অকারণে খরচ

করতে দ্বিধা করি না। আজ কিন্তু তার প্রয়োজনের কথাটা ভাবতে হচ্ছে। সুতরাং টাকাটা তাকে নিতে হ'ল।

কত বড় নির্লজ্জ। রাত দুপুরে মিত্রার ঘর থেকে বের হয়ে এসে তার কাছে কৈফিয়ত চায় দেরি করে ফিরে আসবার জন্য। অবাধ্য ঘোড়াকে তিনি নাকি চাবুক মেরে সায়েস্তা করেন। মানুষ যে ঘোড়া নয় এ কথাটা ভাববার মত ঔদার্য্য তার নেই। ঠাকুর-দাদার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল, তাই সময় মত জমিদারী বিক্রি করে নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। জমিদার হলেন শিল্পপতি কিন্তু সাবেক দিনের তোগলকি মেজাজ সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন। অভ্যাস ত্যাগ করা সম্ভব হ'ল না। তাই পদে পদে এত মতবিরোধ আর গোলযোগের সৃষ্টি। তাব উপব আবার শত্রুপক্ষ অদৃশ্য থেকে ঘুঁটি চালছে।

শ্রীমতীর সখেদ অনুযোগের উত্তরে ডাক্তারবাবু কথাক'টি তাকে বলেছেন। উত্তেজিত না হতে উপদেশ দিয়েছেন—অতনুর শুভাশুভ নিযে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ডাক্তারবাবু ওকে প্রাণপণে আগলে বাখতে চান। এই বিস্ময়কর আসক্তির পবিচয় শ্রীমতী তাঁর বহু কাজের এবং ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পেতে দেখেছে। অবাক্ হয়েছে কিন্তু কোথায় যে এর প্রকৃত রহস্য তার সন্ধান আজও পায় নি।

আগামী প্রভাতেব পূর্ব্বেই তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। যাবার পূর্ব্বে একবার ডাক্তাববাবুব সঙ্গে দেখা করবার কথাটা মনে এল। শুধু একটিবাব তাঁব পায়েব ধুলো মাথায় নেবার জন্য। কিন্তু দেখা কবতে গেলে তার আর এখান থেকে চলে যাওয়া হবে না। তিনি বাধা দেবেন। শুধু বাধাই দেবেন না, পথ আগলে দাঁড়াবেন। কথাটা শ্রীমতী স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে।

শ্রীমতী উঠে গিয়ে খোলা জানালার কাছে দাঁড়াল। চাপ চাপ অন্ধকার যেন বাড়ীখানাকে ঢেকে রেখেছে। কৃষ্ণ পক্ষ। এই

নিরেট অন্ধকারের সীমাহীন সমুদ্রের পানে সে তার দৃষ্টি মেলে ধরল। কোথাও কি একবিন্দু আলো চোখে পড়ছে! তার মনের সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির একটা অবিশ্বাস্য মিল রয়েছে। অন্ধকার আর অন্ধকার! দুর্বিষহ!

শ্রীমতীর বাবা হয়ত এই কারণেই ভয় পেয়েছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। পিছিয়ে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। নিজের আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শ্রীমতীর মুখ থেকে শুনবার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী পারে নি। মার উৎফুল্ল একাগ্রতা আর নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল ছবি তার মনেও রং ধরিয়েছিল। তার উপর শ্রীমতীর বিবাহ নিয়ে তার মা এবং বাবার মতান্তর এমন এক পর্য্যায় এসে উপস্থিত হয়েছিল যার জন্য মাকে মেনে নিয়ে বাবাকে সঙ্কটমুক্ত করা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। আজ তার জীবনের এই চরম সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে কে তাকে বুদ্ধি দেবে—কে দেবে তাকে সঠিক পথের সন্ধান? বাবাকে গিয়ে সে কি বলবে? মার কাছেই বা সে কি জবাবদিহি করবে···

অন্ধকার · যতদূর দৃষ্টি যায় সব অন্ধকার!

১১

বাড়ী ঘর, আসবাবপত্র, হুইস্কির বোতলটা, এমন কি যাকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও অতনু এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল সেই শ্রীমতীও এক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। অতনু তার শয্যায় উপর পড়ে আছে। অকাতরে ঘুমাচ্ছে। শ্রীমতীরও সাড়া নেই। কেষ্ট বারকয়েক এসে ফিরে গেছে। সাহস করে ডাকে নি।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কেষ্টর দেখা পাওয়া গেল। তার চোখেমুখে খানিকটা শঙ্কা আর খানিকটা সংশয়। গত-রাত্রের বাদানুবাদের সেও একজন অদৃশ্য শ্রোতা। শেষ পর্য্যন্ত কেষ্ট ডাক্তারবাবুকে খবর দিল।

ডাক্তারবাবু কেষ্টর কাছে গতরাত্রের সংবাদ শুনে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তিনি কেষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বৌদিরাণী ঘরে আছেন কিনা সে খবর নিয়েছ?

কেষ্ট ঘাড় নেড়ে জানায়, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ বলেই ত মনে হ'ল।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি এখন চলে যাও কেষ্ট, দরকার হলে আমি পরে যাবার চেষ্টা করব।

কেষ্ট বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল।

কেষ্ট চলে যেতে ডাক্তারবাবু বহুক্ষণ ধরে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করে একসময় থামলেন। নিজের সঙ্গেই তিনি কথা কয়ে উঠলেন। ডাক্তার তুমি আর কি করবে? কতটুকু এগুলে তোমার সম্মান থাকবে? যার স্ত্রী কিছু করতে পারল না—উল্টো অপমানিত হ'ল সেখানে তোমার আর কতখানি সাধ্য? অতনু খেয়ালী, সে বেপরোয়া আর উদ্ধত কিন্তু, এতবড় নির্ব্বোধ এ তিনি কেমন করে জানবেন? কেষ্ট না এলেও ডাক্তারবাবুকে একবার যেতেই হ'ত। অতনুর জন্যও বটে আর শ্রীমতীর জন্যও বটে। গতরাত্রে শ্রীমতীকে বড় বেশী উত্তেজিত মনে হয়েছিল। নিজের বিষয় কিছু বলতে গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত অতনুর কারখানা সম্বন্ধে আলোচনা করেই চলে গেল। ·· · ·

টেলিফোন বেজে উঠেছে। ডাক্তারবাবু রিসিভারটি তুলে নিলেন, হ্যালো · হ্যাঁ আমি ডাক্তারবাবু বলছি, কিন্তু তুমি কে মা? ও তুমি মিত্রা · কি বলছ? অতনুর স্ত্রী তাঁর ঘরে নেই? খোঁজ করে দেখ, নিশ্চয়ই কোথাও আছেন আর এ খবর আমাকে দিয়ে লাভ কি? তুমি বরং অতনুবাবুকেই জানিয়ে দাও। ব্যবস্থা যদি কিছু করবার প্রয়োজন থাকে তিনিই করবেন।

শেষের দিকে ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল। তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা না করে রিসিভারটি নামিয়ে রাখলেন। গত-রাত্রে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে এমন কি ঘটনা ঘটল যার

ফলে শ্রীমতী এভাবে কাউকে কিছু না বলে চলে যেতে পারে, তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তবে কোথাও যে অসম্মানজনক কিছু ঘটেছে এ বিষয় তাঁর সন্দেহ নেই। নইলে যে মেয়ে রাত বারটা পর্য্যন্ত অতনুকে ভরাডুবির হাত থেকে কেমন করে কোন্ পথে বাঁচান যায় তাই নিয়ে আলোচনা এবং কর্ম্মপন্থা স্থির করে গেল, সেই মেয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার পরেই অতনু তাকে কর্ম্মচ্যুতির নির্দ্দেশ দিল কেন? শ্রীমতীর এই চলে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কথাটা বার বাব তাঁর মনে হচ্ছে। অতনু তাকে ছাড়াতে চাইলেও তিনি তাকে ত্যাগ করতে পারেন না। তাঁর নিজের প্রয়োজন আজও শেষ হয় নি। শ্রীমতীর চলে যাওয়া কিংবা অতনুর ব্যবহার তাঁকে যত না বিস্মিত করেছে মিত্রার ব্যবহার তার কাছে তার চেয়েও বিস্ময়কর। অতনুর চতুর্দ্দিকে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তার পিছনে ডানকান-আগরওয়ালার যেমন হাত আছে মিত্রাও যে নিষ্ক্রিয় নেই এ কথাও তাঁর জানা। অতনুও এ খবর রাখে। তবুও অতনু কেন যে এই বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছে আর মিত্রা যে কেন এমন নাটকীয়ভাবে তাঁর স্মরণাপন্ন হতে চাইছে এ রহস্যের সন্ধান ডাক্তারবাবুকে কে দেবে। অতনুর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তার শত্রুও যেমন আছে মিত্রও তেমনি আছে কিন্তু অতনু···

চিন্তায় বাধা পড়ল। টেলিফোন পুনরায় বেজে উঠল। এবারে মিত্রা না—অতনু। অত্যন্ত উত্তেজিত তার কণ্ঠস্বর। সে বলছিল, সবকথা টেলিফোনে বলা যায় না। আপনি এখুনি একবার আসুন। বড় দরকার।

ডাক্তারবাবু চুপ করে থাকেন। কৌতূহল ক্রমশঃই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শ্রীমতী এদের ভাবিয়ে তুলেছে।

পুনরায় অতনুর কথা শোনা গেল, আমার গাড়ী এখুনি আপনাকে আনতে যাবে। অতনু রিসিভার রেখে দিল।

ডাক্তারবাবু তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। অতনুর তাঁকে

বড্ড দরকার। শ্রীমতী রাগ করে চলে গেছে। তাঁর কাছে না এসে অন্যত্র চলে গেছে। কোথায় সে যেতে পারে তা ডাক্তারবাবুর জানা। নিশ্চয় সে তার বাপের কাছে গেছে। এর বেশী সাহস তার নেই। ডাক্তারবাবু তাকে ভাল করেই চেনেন।...

অতনুর ড্রাইভার এসে সেলাম করে সম্মুখে দাঁড়াতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর এতদিনের এত আয়োজন কিছুতেই ব্যর্থ হতে তিনি দেবেন না। অতনুর চলার এই মারাত্মক গতিকে সংযত করতেই হবে। নইলে তাঁর স্বপ্ন আর সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে এসে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী দ্রুত-গতিতে ছুটে চলল। ডাক্তারবাবুর মাথার মধ্যেও গতরাত থেকে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলি বিদ্যুৎ গতিতে পাক খেতে লাগল।

গাড়ী এসে বাড়ীর কম্পাউণ্ডে উপস্থিত হতেই সর্ব্বপ্রথমে ছুটে এল মিত্রা। অত্যন্ত আগ্রহভরে সে বলল, আপনি এসেছেন, তার পরেই কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদু করে পুনবায় বলল, অতনুবাবুর সঙ্গে কাজ শেষ করেই আপনি চলে যাবেন না যেন ডাক্তারবাবু—আমারও বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে তার আকস্মিকতায় তিনি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবু একটু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, আমার সঙ্গে তোমার কি দরকার থাকতে পারে ঠিক বুঝতে পারলাম না ত মিত্রা?

মিত্রা ডাক্তারবাবুর কথার ধরনে ক্ষুণ্ন হলেও প্রকাশ্যে শান্তকণ্ঠে বলল, সব কথা শুনলেই আপনি বুঝবেন। সহসা আলোচনার ধারা পাল্টে সে পুনবায় বলল, অতনুবাবুও এসে পড়েছেন। আপনি যান, আমি আপনার চায়ের ব্যবস্থা করিগে।

ডাক্তারবাবুকে নিয়ে অতনু সোজা তার শয়নকক্ষে এসে উপস্থিত হ'ল। মুহূর্ত্তের জন্য একটু সঙ্কোচবোধ করে অল্পেই সে ভাব কাটিয়ে উঠে ধীরে ধীরে বলল, সব খবরই বোধ হয় শুনেছেন—

ডাক্তারবাবু বললেন, সর্ব খবর বলতে কি শ্রীমতীর চলে যাওয়ার খবরের কথা বলা হচ্ছে?

অতনু মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল আপাততঃ তাই।

ডাক্তারবাবু মৃদু শান্তকণ্ঠে বললেন, ওটা খবর নয়। খবব হচ্ছে শ্রীমতীব চলে যাওয়াব কারণগুলি। এই বাড়ীর এবং পবিবাবেব অমঙ্গল আশঙ্কায যে মেয়ে গতরাত্রে আমাব কাছে গিয়েছিল, আমি ত ভাবতেই পারি না সে এখানে ফিরে আসবার পর এমন কি ঘটতে পারে যার জন্য সেই রাত্রেই এ বাড়ী ছেড়ে তাকে চলে যেতে হ'ল অতনুবাবু? তাছাডা এখন মনে হচ্ছে অপবেব পাবিবাবিক ব্যাপারে আমি একটু বেশী মাথা ঘামাতে সুরু করেছিলাম—তাব পুবস্কাবও আমি পেযেছি। আব নতুন কবে নিজেকে জডাতে চাই না। তাছাডা আমাদেব মধ্যেব সম্বন্ধ ত চুকেই গেছে।

অতনু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, সম্বন্ধ যদি চুকে গিয়েই থাকে তা হলে আবার এলেন কেন?

ডাক্তারবাবু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমাব কথা সকলে বুঝবে না অতনুবাবু। আমার কথা থাক, কিন্তু শ্রীমতী যে এ বাড়া থেকে অন্যত্র চলে গেছেন তা কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হযেছে?

অতনু জবাব দিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডাক্তাববাবু খানিক চুপ থেকে বললেন, কিন্তু আমাকে কেন ডেকে পাঠান হয়েছে সে কথা এখনও জানতে পাবি নি আমি।

অতনুর ঝিমিযে-পডা ভাবটা মুহূর্তের জন্য কেটে গেল। তার মুখেব ভাব কঠিন হযে উঠল। বলল, আপনি কোন খবর বাখেন কিনা সেইটে জানবার জন্য।

তার মুখের ভাব এবং কণ্ঠস্বরের এই পবিবর্ত্তন লক্ষ্য করেই ডাক্তারবাবু বললেন, এ প্রশ্নেব জবাব টেলিফোনেও আমি জানাতে পারতাম।

তা হয়ত পারতেন—অতনুব কণ্ঠস্বরে পুনরায় সংযম ফিরে

এল। মৃদু শান্তকণ্ঠে সে বলতে লাগল, কিন্তু আমার কি জানি কেন বিশ্বাস ছিল যে, এ বাড়ীর মানসম্মান আর শুভাশুভর দিকে আপনারও দৃষ্টি আছে। এ বাড়ীব সুখ-দুঃখের আপনিও একজন অংশীদার।

ডাক্তারবাবু প্রাণহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, খুবই আশ্চর্য্যের কথা। কথাটা কি আজ সকাল থেকেই ভাবতে সুরু করা হয়েছে?

অতনু এতবড় আঘাতেও কিন্তু রাগ করল না। বরং একটুখানি হাসবার চেষ্টা করেই জবাব দিল, আপনিও মিথ্যে বলেন নি আমিও মিথ্যে বলিনি। আমাদেব মধ্যেব সম্বন্ধটা প্রভু-ভৃত্যেব সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু এ নিয়ে কোনদিন একটি কথাও বলা হয় নি। আমি নির্ব্বিবাদে সম্বন্ধেব চেয়ে আপনাব বয়েসকে সম্মান দিয়ে এসেছি। কেন দিয়েছি তা আমি জানি না—তবে দিয়েছি এ কথা সত্য। আর তার জন্য কোনদিন নিজেকে আমার ছোট মনে হযনি।

ডাক্তাববাবু একটুখানি হাসলেন—কথা বললেন না।

অতনু থামতে পাবল না। বলে চলল, আমাব এই অকাবণ দুর্ব্বলতায় আমি নিজেও বড কম আশ্চর্য্য হই নি। কাল রাত্রের কথা ভাবুন আব আজ সকালের দিকে তাকান। শ্রীমতী চলে গেছে শুনে চমকে উঠলাম। মাথাব মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। ভাবতে বসে কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আপনাব কথাই মনে হ'ল। আপনাকে মিথ্যে বলব না। গতরাত্রে আমি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। তাব উপব শ্রীমতী আমাকে অন্যায়ভাবে কুৎসিত আক্রমণ কবে বসল। আমিও তাকে ওজন করে ফিরিয়ে দিযেছি।

ডাক্তাববাবু তথাপি নীরব। কোন প্রকাব মতামত প্রকাশ করলেন না।

অতনু যেন নেশাব ঘোরে কথা বলে চলেছে এমনি ভাবে বলতে থাকে, কিন্তু আমার চাকর-বাকব আর কর্ম্মচাবীদের কাছে এই যে আমাকে ছোট করা হ'ল এ আমি ভুলতে পারব না। আপনাব সঙ্গে তার দেখা হলে বলে দেবেন যে, এভাবে এ বাড়ীর

চৌকাঠ ডিঙোলে আর কোনদিন প্রবেশ অধিকার পাওয়া যাবে না। আমি জানি, যেখানেই থাক আপনার কাছে একদিন সে আসবেই।

এতক্ষণে ডাক্তারবাবু কথা বললেন, সে না এলেও আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। এ বাড়ীর দোর তার কাছে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেলেও আমাব দরজা চিরদিনই শ্রীমতী মায়ের জন্য খোলা থাকবে অতনুবাবু। আমার মন বলছে, শ্রীমতী খুব সামান্য কারণে চলে যায় নি। কিন্তু এ নিয়ে মিথ্যে বাদানুবাদ করে আর কি হবে।

ডাক্তারবাবু সহসা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি প্রস্থানোদ্যত হতেই অতনু পুনরায় বলল, কারণ যত বড়ই হোক তার জন্য ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, কার্য্য আর কারণের বড় নিকট সম্বন্ধ অতনুবাবু। যে কারণে তাকে চলে যেতে হয়েছে সেই একই কারণে তার ফিরে আসার পথ সব সময় খোলা থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বলেই ডাক্তারবাবু দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। রাস্তায় এসে প্রথমেই সম্মুখে যে ট্যাক্সি পেলেন তাতে উঠে বসলেন। মিত্রার সঙ্গে তিনি ইচ্ছা করেই দেখা করলেন না।

কিন্তু তিনি না করলেও মিত্রা চুপ করে থাকতে পারল না। ঝোঁকের মাথায় যে "সময় বোমা" এদের ধ্বংস করবার জন্য সে লুকিয়ে স্থাপন ক'রেছিল, বিস্ফোরণের সময় নিকটবর্ত্তী হয়ে আসতে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে এখন পিছিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। ভয় পেয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে। অতনুকে সব কথা খোলাখুলি বলে কোন লাভ হবে না। তা ছাড়া সে যে কিছু জানে না এ কথা ভাববারও কোন যুক্তি নেই। অতনুর বুদ্ধির চেয়ে অহঙ্কার বেশী, ধৈর্য্য কম— যা তাকে বাঁচাতে পারবে না বরং ধ্বংসকে আরও ত্বরান্বিত করবে। তাই সে ছুটে এসেছে ডাক্তারবাবুর কাছে।

ডাক্তারবাবুকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে মিত্রা ক্লান্ত গলায় বলল, আমাকে মাপ করবেন এভাবে না বলে-কয়ে বিরক্ত করতে আসার জন্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় নেই। দয়া করে আমায় ভুল শোধরাবার সুযোগ দিন।

ডাক্তারবাবু একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, আমি তোমার ভুল শুধরাবার সুযোগ দেবার কে···কতটুকু আমার শক্তি ·তাঁর কণ্ঠে এমন একটা আর্তস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল যে, মিত্রা নিরতিশয় বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে খানিক তাঁর চিন্তিত মুখের পানে চেয়ে থেকে পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল, আপনি কে তা আমি জানি না, কিন্তু কারখানার শ্রমিকদের উপর আপনার প্রভাব কতখানি সে খবর আমার অজানা নেই। আর অতনুবাবুর যে আপনি কতবড় শুভানুধ্যায়ী সে খবরও আমি রাখি।

ডাক্তারবাবু সহসা সোজা হয়ে বসে মিত্রার মুখের পানে তাকালেন। বললেন, তাই যদি তোমার বিশ্বাস তা হলে সময় থাকতে এলে না কেন মা? তুমি ফিরে যাও মিত্রা। সব কথা অতনুকে গিয়ে বল। সে তোমাকেও জানুক নিজেকেও চিনুক। হয়ত কোন নতুন পথের সন্ধান পাবে। তোমার শুভবুদ্ধি জয়যুক্ত হোক। মনে হচ্ছে এখনও সময় বয়ে যায় নি।

খানিক চুপ করে থেকে মিত্রা বলল, এ পথে বিস্ফোরণ ঠেকানো সম্ভব হলে আমি আপনার কাছে আসতাম না। আমাকে আপনি বাঁচান।

ডাক্তারবাবুর মুখে বড় সুন্দর একটুখানি হাসি দেখা দিল। তিনি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, তোমার বাঁচার পথ ত তুমি নিজেই দেখতে পেয়েছ মিত্রা। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেলে তুমি নিজেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। আমার সাহায্যের দরকার হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে থেকে তিনি নিজের মধ্যে তলিয়ে গেলেন। তারপর এক সময় চোখ খুলে বললেন, তা ছাড়া

কাকে বাঁচাবার জন্য তুমি এত উতলা হয়েছ মিত্রা আমি এখনও বুঝতে পারছি না।

মিত্রা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আপনাকে মিথ্যে বলব না। অতনুবাবুর জন্য আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি কারখানার শ্রমিকদের জন্য। শেষ পর্য্যন্ত মরবে যে ওরাই ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, তোমার অনেক ক্ষতি হয়েছে আমি জানি। যা হারিয়েছ তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সম্ভবও নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় বস্তু তুমি আয়ত্ত করতে পেরেছ মিত্রা। অতনুর সর্ব্বনাশ যে শুধু তার একলার সর্ব্বনাশ নয় এ কথা দেরিতে হলেও যে তুমি বুঝতে পেরেছ এতে সত্যিই আমি খুশী হয়েছি।

মিত্রা নীরব।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, তুমি মাথা নীচু করে আছ কেন মা? তোমার ত লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। লজ্জা তাদের যারা মানুষকে সৎপথে চলার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বলতে থাকেন আমি এখানে থাকতে পারব না। শ্রীমতাকে ফিরিয়ে আনতে দু'এক দিনের মধ্যেই আমাকে যেতে হবে। এদিকের দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে।

মিত্রা হতাশ স্বরে বলল, এতবড় দায়িত্ব কি একলা আমি বহন করতে পারব?

ডাক্তারবাবু ভরসা দিয়ে বললেন, যে বুদ্ধি দিয়ে তুমি এতবড় একটা ঝড়ের সৃষ্টি করতে পেরেছ সেই বুদ্ধিই তোমাকে তা প্রতি-রোধ করবার উপায় বাতলে দেবে। তা ছাড়া তোমার কাজ আমি অনেকটা এগিয়ে রেখেছি মিত্রা। তুমি শুধু প্রকৃত পথটা দেখিয়ে দিতে পারলে বাকী কাজটুকু ওরা নিজেরাই করতে পারবে।

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে বলল, আমার আর কিছু বলবার নেই। আপনার কথামত চলবার চেষ্টাই আমি করব।

মিত্রা ধীরে ধীরে চলে গেল।

ডাক্তারবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তারবাবুর ওখান থেকে ফিরে এসে মিত্রা সোজা তার নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বহুদিন পরে আবার সে তার অতীত জীবনের পানে দৃষ্টি ফেরাল—যে অতীত এই সামান্য কয়েক মাসের তাণ্ডবে তার জীবন-পথ থেকে প্রায় মুছে যেতে বসেছিল। বাবার আদর্শ শিক্ষা জীবনের স্বপ্ন রাজনৈতিক দাবা খেলায় যেদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সেইদিন থেকেই তার মধ্যে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দেয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তিত আদর্শহীন চলার গতি তাকে কতটুকু শান্তি দিতে পেরেছে—এই কথাটা কিছুদিন ধরে তার মনকে নাড়া দিচ্ছে। যে দুর্ব্বার গতিতে সে ভেঙেচুরে এগিয়ে এসেছে তা আজ থেমে গেছে। ক্ষয়-ক্ষতির পানে চোখ পড়তে নিজেই সে চমকে উঠেছে। চলতে আর পারছে না। পারবেও না। আবার তাকে গোড়া থেকে সুরু করতে হবে।

শ্রীমতীর আকস্মিক উপস্থিতিতে আনন্দের পরিবর্ত্তে একটা বিস্ময় আর সন্দেহের ঝড় বয়ে গেল প্রণবের সংসারে। প্রণব কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখতে লাগলেন। বহুক্ষণের মধ্যে কেউই একটা সাধারণ কুশল প্রশ্ন পর্য্যন্ত করতে পারল না।

শ্রীমতী নত হয়ে মা ও বাবার পায়ের ধূলা নিল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, অনেক দিন তোমাদের দেখি নি তাই চলে এলাম বাবা

প্রণবের মুখভাব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কিন্তু রাণীর চোখেমুখে সন্দেহের একটা কুঞ্চন লেগে রইল। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, এসেছিস তা ভাল কথা, কিন্তু আগে থেকে একটা খবর দিয়ে এলি নে কেন?

চিঠি দেবার আর সময় পেলাম কোথায়—শ্রীমতী বলল, কাল রাত্রে ঠিক হ'ল আসব। আর আজ সকালে গাড়ী চড়েছি।

রাণী বলেন, কিন্তু জামাই এল না কেন?

শ্রীমতী একটু যেন কুণ্ঠিত হয়ে বলল, তার আমি কি জানি?

অরুণ এসে খানিক হৈ চৈ করে বলল, কথা নেই বার্তা নেই তুই যে হঠাৎ? বড়লোকটি বুঝি আসে নি? একলাই এসেছিস, না চাকর বাকর কাউকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস?

বাবা, বাবা শ্রীমতী ককিয়ে উঠল, তোমরা যেন কি! এসে দাঁড়াতেই খালি প্রশ্ন আর প্রশ্ন। ধূলো-পায় তোমাদের এত প্রশ্নের জবাব দিতে আমি আর পারছি নে দাদা।

প্রণব বললেন, ঠিক কথা। সারাদিন গাড়ীতে কেটেছে। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দে তোরা। এসে অবধি কথাটা শেষ না করেই তিনি অন্য কথা বললেন, আমি আমার ঘরেই আছি সুবিধে মত একবার যেও মা।

প্রণব চলে গেলেন।

এমনি বহু অবাঞ্ছিত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এ কথা শ্রীমতীর জানা ছিল। সে সব প্রশ্নের জবাবগুলোও সে ঠিক করে রেখেছে, কিন্তু যে লোকটিকে ফাঁকি দেওয়া সবচেয়ে সোজা তাঁকে কি করে সত্য ঘটনাটা জানাবে এই ভয়েই শ্রীমতী দিশেহারা হয়ে পড়ল। তার নির্ব্বিরোধী সরল প্রকৃতি বাবাকে নিয়েই যত ভয়।

শ্রীমতী ঠিক বুঝতে পারছে না কতখানি তার বাবার কাছে প্রকাশ করা সঙ্গত হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল বাবাকে কিছুই বলতে হ'ল না। তার মা চেঁচামেচি করে এমন এক কাণ্ড বাধালেন যে, শ্রীমতী মুখ লুকাতে পথ পায় না। অরুণ মাকে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে আরও ক্ষেপিয়ে তুলে শেষ পর্য্যন্ত নিজেই পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। শুধু প্রণব একটি কথাও বললেন না। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় কন্যার হাত ধরে আকর্ষণ করে নিজের ঘরে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ। কারুর মুখে কোন কথা যোগাল না। শ্রীমতী ভাবছিল তার বাবাকে সে কি বলবে—আর প্রণব ভাবছিলেন যে, কতবড় অপমানের জ্বালা জুড়াতে মেয়েটা একলা একলাই তার বাবার কাছে ছুটে এসেছে।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একসময় শ্রীমতী উঠে এসে তার বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত হেসে বলল, তুমি যে কোন কথা জিজ্ঞেস করছ না বাবা?

প্রণব ধীরে ধীরে জবাব দেন, কি আর জিজ্ঞেস করব মা—

শ্রীমতী স্তিমিত গলায় বলল, কেন এভাবে চলে এলাম? এই সব আর কি

স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রণব বললেন, এই কি তার সময়? তা ছাড় জিজ্ঞেস করে কি হবে মা? আমি কি বুঝি না যে, কতবেশী উত্যক্ত হলে আমার মেয়ে এভাবে চলে আসতে পারে?

শ্রীমতী বলল, মা কিন্তু খুব রাগ করেছেন।

প্রণব একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, ওটা রাগ নয় শ্রী—দুঃখ, আশা ভঙ্গের বেদনা।

শ্রীমতী প্রশ্ন করে, তুমি কি একটুও দুঃখ পাও নি বাবা?

প্রণব চমকে উঠলেন। ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, দুঃখ পাই নি এমন কথা বলি কি করে মা। কিন্তু তা এভাবে চলে আসার জন্য নয়। তোমার পরাজয় স্বীকার করবার জন্য।

শ্রীমতী একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে বলল, একে তুমি পরাজয় ভাবছ কেন বাবা? আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। জয়-পরাজয়ের কথা এখনই উঠতে পারে না।

প্রণব একটুখানি করুণ হেসে বললেন, তুমি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছ এ কথাটা ত মিথ্যে নয় শ্রী।

শ্রীমতী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, অপর পক্ষকে দুর্ব্বল করবার উদ্দেশ্য

নিয়ে যে একাজ করা হয় নি তা কেমন করে তুমি বুঝলে। তোমরা মিথ্যে ভয় পাচ্ছ—অকারণে দুশ্চিন্তা করছ বাবা।

প্রণব বার বার মাথা নেড়ে বলতে থাকেন, সংসারের রণনীতি কোনদিনই আমি ভাল বুঝি না মা, তাই ঘরে-বাইরে কোথাও আমল পাই না। তবুও আমার মন বলে যে, মতবাদের লড়াইয়ের নীতি আরও ঢের বেশী জটিল। যার জীবনে এ যুদ্ধ দেখা দেয় সে-ই শুধু জানে এর ভয়াবহতা। তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম। দু' পা এগুতে গিয়ে দশ পা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। দাঁড়াতে গিয়ে টের পেলাম আমার একখানা পা ভেঙে গেছে।

শ্রীমতা চঞ্চল হয়ে উঠল, তার স্বল্পভাষী বাবার মুখে এ ধরনের সংসারতত্ত্বের আলোচনা সে ইতিপূর্ব্বে আর শোনে নি। তিনি যে কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে উদ্যত হয়েছেন একথা বুঝেই শ্রীমতা স্নিগ্ধ হেসে বলল, ভাঙা পা ত চিরদিন ভাঙা থাকে না বাবা।

প্রণব মাথা নেড়ে বলেন, তা হয় ত থাকে না শ্রীমতী, কিন্তু এই হাডমাংসের আড়ালে যে বস্তুটি আত্মগোপন করে আছে তাকে তুমি কোন্ দাওয়াই দিয়ে জোড়া লাগাবে মা? ওখানে ত তোমার ডাক্তার বদ্যি পৌঁছুতে পারবে না।

বাবার কথায় শ্রীমতী শুধু বিস্মিতই হ'ল না কতকটা বিব্রত বোধ করল। তথাপি সে চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, এত কথা তুমি কবে থেকে ভাবতে সুরু করেছ বাবা?

প্রণব ছেলেমানুষের মত বলেন, তোদের সব দেখেশুনে মা। কিন্তু এই পথে চিন্তা করতে আমার ভাল লাগে না।

শ্রীমতা গভীর কণ্ঠে বলে, তা হলে আর ভেব না বাবা। এসব তোমার জন্য নয়—তোমাকে মোটেই মানায় না। বড় গোলমেলে মনে হয়।

প্রণব সহসা জোরে জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, তুই ঠিক

বলেছিস শ্রী। আমার নিজের কানেও বড় বিশ্রী লাগছিল। জোর করে মানুষের স্বভাব পাল্টানো যায় না। ঐ কথা তোর মা বোঝেন না।

একটা জবাব দিতে গিয়ে শ্রীমতীকে থামতে হ'ল। মা খেতে ডাকছেন। ভাত দেওয়া হয়েছে।

মার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভিজে ভিজে মনে হ'ল শ্রীমতীর। সে সাড়া দিয়ে জানাল যে, এখুনি যাচ্ছে।

সবদিক দিয়ে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে শ্রীমতী বদ্ধপরিকর। কিন্তু এমনি ভাবে সকলে মিলে তাকে যদি একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করে তা হলে

অরুণ এসে পুনরায় আহ্বান জানাল, কই রে আয়। তোর জন্যে বসে আছি যে।

শ্রীমতী উঠে দাঁড়াল।

প্রণব বললেন, খেয়ে-দেয়ে আবার আমার কাছে একবার আসিস মা।

শ্রীমতী বলল, আসব বাবা।

বাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসতেই ক্ষাবিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। ও কথা বলল না, মুচকি হাসল। ইতিপূর্ব্বেও বারকয়েক ঠিক এমনি করেই হেসেছে, কথা বলে নি। ও হয়ত একলা পাবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। শ্রীমতী মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল। অরুণ পুনরায় তাগিদ দিল।

খেতে বসে অরুণ বলল, একসঙ্গে বসে খাওয়া প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম মতি।

শ্রীমতী একটু হাসল।

অরুণ পুনরায় বলল, শুধু নাড়াচাড়া করছিস—খাচ্ছিসনে কেন?

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে শ্রীমতী ঝোলমাখা ভাতে অম্বল ঢেলে নিল।

অরুণ বিস্মিত কণ্ঠে বলল, ও-কি রে খোলের সঙ্গে অম্বল···

শ্রীমতী এবারেও একটু হাসল। কোন জবাব দিল না। তার হাসিটা অন্য ধরনের। রাণীর মুখভাব সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অরুণ লক্ষ্য না করলেও শ্রীমতী মায়ের এই ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছে। তার সারামুখে খানিক রক্ত ছুটে এল। মা ধীরে ধীরে উঠে গেলেন। তোরা খা আমি এখুনি আসছি, বলে, তিনি সোজা প্রণবেব ঘরে এসে উপস্থিত হলেন।

প্রণব শূন্যে দৃষ্টি মেলে গভীর চিন্তায় মগ্ন। স্ত্রীর উপস্থিতি টের পেলেন না।

রাণী ডাকলেন, শুনছ—

প্রণব আত্মস্থ হলেন, আমাকে কিছু বলছ?

বাণী হাসিমুখে বলেন, কথার ছিরি দেখ! তোমাকে নয়ত এখানে আর কে আছে? একটু থেমে কণ্ঠস্বর আরও অনেকটা খাদে নামিয়ে তিনি পুনবায় বলেন, বুঝলে, এ সময় মেয়েরা মায়ের কাছেই থাকে। এসেছে ভালই করেছে, কিন্তু গোলমাল করে না এলেই পাবত।

প্রণব খুব মনোযোগ দিয়ে স্ত্রীর কথাগুলি শুনে মৃদুকণ্ঠে বললেন, তুমি অল্পেই বড় উতলা হয়ে ওঠো রাণী। এতটা ভাল নয়।

রাণী চলে যাচ্ছিলেন, প্রণব তাঁকে পিছু ডেকে বললেন, আমাব একটা অনুবোধ বাণী, শ্রীমতাকে দিন কয়েক তোমবা উত্যক্ত ক'র না।

রাণী বলেন, আমি বুঝি শুধু উত্যক্ত কবতেই জানি!

প্রণবের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। রাণীর তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি সহসা অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন, সংসারে এতবড় বন্ধন আব মেয়েদের নেই।

প্রণব বার বার মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, সেইজন্যেই আমি আরও ভয় পেয়েছি, এতখানি এগিয়ে গিয়েও শ্রীমতী আবার

পিছু হটে এল কেন ? তুমি যাও রাণী···আমাকে আরও ভাবতে, দাও···ভাল করে বুঝতে দাও।

রাণীর চোখেমুখে কিন্তু কোনপ্রকার চিন্তার প্রকাশ ঘটল না। তিনি পরম নিশ্চিন্তে স্বামীর দুর্ভাবনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পুনরায় রান্নাঘরে ফিবে এলেন।

ভাই-বোনে তখনও খাওয়া নিয়ে বচসা চলছিল। অকারণেই অরুণ বিস্তব হৈ-হৈ করছে। কিছু পূর্ব্বের গুমোট আবহাওয়াটাকে সে হয়ত হাল্কা করে নিতে চায়।

মা ফিবে আসতে অরুণ আব এক দফা চীৎকার করে নিয়ে বলল, দাও ত মা আর একবাটি অম্বল মতিকে।

শ্রীমতী পুনরায় সিন্দুব বাঙা হয়ে উঠল। সেইদিকে চেয়ে মা মনে মনে খানিক হাসলেন। এবং সত্যি সত্যিই তিনি আর এক বাটি অম্বল শ্রীমতীব পাতেব গোডায ধরে দিলেন।

অরুণ হেসে উঠল।

মা ধমক দিলেন, গাধাব মত হাসিস নে অরুণ।

শ্রীমতী বলল, তুমিও মা দাদার কথা শুনে—

বাধা দিয়ে রাণী বলেন, পেটে কিছু দিতে হবে ত। যদি অম্বল দিয়ে দুটো খেতে পাবিস তাই খা, নইলে এ অবস্থায় শরীব টিকবে কেমন কবে।

শ্রীমতী চুপ করে থাকে। আব অরুণ হয়ত মনে মনে ভাবে, তাব সম্বন্ধে মা একেবাবে মিথ্যে বলেন নি।

পবদিন শ্রীমতীকে একলা পেয়ে ক্ষীরিযা একগাল হেসে চোখ টিপে বলে, মা বলছিল তোব ছেলে হবে দিদি—মনেব মিল হ'ল না, আর ছেলে হবে, এটা আবাব কেমন কথা গো···

শ্রীমতী ধমক দেয, তোব কি তাতে হতভাগী—

ক্ষীরিয়া হেসে চলে যায়।

অতনুর জীবনে এতবড় পরাজয় বুঝি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নি। কিছু দিন ধরেই চলছিল ঝড়ের তাণ্ডবলীলা। ভেঙেছে বিস্তর—ধূলা উড়েছে প্রচুর। এমন কি তার আত্মাভিমানকে পর্য্যন্ত ধূলিশয্যা নিতে হয়েছে। তার মাথার উপরকার আচ্ছাদন-টুকুও আর অবশিষ্ট নেই। অতনু তাই আবার নতুন করে ভাবতে বসেছে। তার জীবন-পথের ভিৎ প্রস্তুত করতে যে মালমসলা সে ব্যবহার করেছিল তাব কতটুকু ছিল খাঁটি আর কতটুকু ভেজাল। অতনু পর্য্যটন কবে দেখছে তাব অতীত জীবনের প্রত্যেকটি স্তর। কেন এই বিপর্য্যয়? তার বিবাহিত স্ত্রী পর্য্যন্ত তাকে পবিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। শ্রীমতীকে সে স্বেচ্ছায় বিবাহ কবে এনেছিল। কিন্তু স্ত্রীকে যে একটা আলাদা সম্মান দিতে হয় এ কথাটা একদিনের জন্যও তার মনে হয় নি। দরিদ্র পিতার কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করে সে তাদের কৃতার্থ করেছে এই কথাটাই তাব ব্যবহাবে মাঝে মাঝে উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাই মানুষ শ্রীমতীকে সে জয় করতে পারে নি। সে চলে গিয়েছে।

মিত্রা বলে, যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে সেটুকু না দিলে নিজের পাওনা আশা করা যায় না। ভয় দেখিয়ে দেহটা হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু মন চলে যায় বহুদূরে। আমাকেই দেখুন না কেন অতনুবাবু। কিছুদিন আগেও আপনার অনিষ্ট কববার জন্য কত আয়োজন না কবেছি আবার আজ সেই আমিই আপনাকে অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছি যাতে কোন ক্ষতি আপনাকে না স্পর্শ করতে পারে।

অতনু বলে, আমি কিন্তু তোমার এ পরিবর্ত্তনের কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাই না মিত্রা।

মিত্রা জবাব দেয়, আপনার সে চোখ নেই বলেই দেখতে পান নি। সঙ্গত কারণেই পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

ক্লান্ত হেসে অতনু বলে, আমার চোখ নেই বলেই হয়ত দেখতে পাচ্ছি না—অন্ধের মত খুঁজে বেড়াচ্ছি। তবুও তোমার ব্যক্তিগত কোন কিছুই আমি জোর করে জানতে চাইব না। তবে ডাক্তার-বাবু সম্বন্ধে যদি তোমাকে কোন প্রশ্ন করি মিত্রা? ও লোকটিকে আজও আমি বুঝলাম না।

মিত্রা হেসে বলে, এত বছরে আপনি যাঁকে বুঝলেন না তাঁর সম্বন্ধে আমি আবার কি বলব। তবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি যথার্থই আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

অতনু জিজ্ঞেস করে, এতবড় বিশ্বাসের কারণও নিশ্চয় আছে।

মিত্রা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল, এতবড় প্রবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে আমি ছোট-বড় কাউকেই উপেক্ষা করি নি। ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করেই নেমেছিলাম অতনুবাবু।

অতনু প্রশ্ন করে, তাহলে থামলে কেন মিত্রা?

মিত্রা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে বলল, আপনি কিন্তু সেই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েই আবার প্রশ্ন করছেন।

ভুল হয়ে গেছে মিত্রা, অতনু বলে।

মিত্রা বলে, আপনি ত অনায়াসে ধরে নিতে পারেন যে, হেরে যাবার ভয়ে মিত্রা পিছিয়ে গেছে।

অতনু একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, আগে হলে তাই ভাবতাম, কিন্তু শ্রীমতী আমাকে বদলে দিয়েছে। নিজের সম্বন্ধে যতই ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে এতদিন শুধু চোখ বুজে আত্মবঞ্চনা করেছি। যাকে জয় ভেবে গর্ব্ববোধ করেছি তা আমার জয় নয় পরাজয়।

মিত্রা হেসে বলে, আপনার এ শ্মশান-বৈরাগ্য কতদিন স্থায়ী হবে অতনুবাবু?

অতনুর মুখেও হাসি দেখা দিল। সে শান্ত হেসে বলল, একথা আমারও মনে হয়েছে মিত্রা। কিন্তু এই শ্মশান-বৈরাগ্যও আমার মধ্যে কোনদিন এর আগে দেখা দেয় নি। আমার মধ্যের ষড়রিপুর

গুটিকয়েক সব সময় মাথায় চড়ে থাকত। তা ছাড়া কোন কাজ করে পিছন ফিরে তাকানোকে আমি দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে জানতাম না।

মিত্রা তিরস্কারের সুরে বলল, আপনার এই শক্তির দম্ভই আপনার প্রধান শত্রু। অপরের শক্তিকে আপনি সব সময়ই লঘু করে দেখেন। নইলে মিত্রার পক্ষে এতখানি অগ্রসর হওয়া কিছুতেই সম্ভব হ'ত না অতনুবাবু।

অতনু বলল, মিত্রার কথা থাক। তার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ পরে হবে—

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল, এখনও আপনার অহঙ্কার?

অতনু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে জবাব দিল, একে আমি অহঙ্কার বলি না। ব্যবসায় "স্পেকুলেসান" বলে একটা কথা আছে জান ত?

মিত্রা বলে, যাকে বোকা লোকগুলো জুয়াখেলা বলে?

অতনু জবাব দেয়, হতেও পারে—

মিত্রা গম্ভীর হয়ে বলল, ঠিক তাই, আর এই খেলাই আপনি ঘরে-বাইরে একসঙ্গে শুরু করেছিলেন। যার ফলে ঘর এবং বা'র দুই ভাঙনের মুখে এসেছে।

অতনু কোন জবাব না দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে মিত্রার মুখের পানে চেয়ে রইল।

মিত্রা বলতে থাকে, অথচ যাকে আপনার দ্বিধাহীন চিত্তে বন্ধুর মত বিশ্বাস করা উচিত ছিল, তাকেই করলেন মর্ম্মান্তিক উপেক্ষা আর যে মিত্রাকে গলাধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেওয়া আপনার উচিত ছিল তার সঙ্গে বসলেন পরামর্শ করতে—দিলেন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে।

অতনু কেমন একপ্রকার হেসে বলল, ঐজন্যেই ত "স্পেকুলেসান" কথাটা ব্যবহার করেছি মিত্রা। তুমিই বল দেখি এতে কি আমি ঠকেছি?

মিত্রা বলল, এ প্রশ্নের উত্তর আপনার ভবিষ্যৎ দেবে অতনুবাবু। তবে এমন মারাত্মক খেলা আর কোনদিন খেলবেন না। মানুষের জীবন নিয়ে এ ধরনের ফাটকা খেলা বিপজ্জনক। এর পরিণাম কোনদিন ভাল হয় না জানবেন।

তুমি কি সুযোগ পেয়ে আমাকে উপদেশ দিতে সুরু করলে মিত্রা ?

মিত্রা খানিক চুপ করে থেকে কোমল কণ্ঠে বলল, না অতনুবাবু, এতবড় ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি শুধু তৃতীয় পক্ষের মনের উপর প্রতিক্রিয়ার কথাটাই বলতে চেয়েছি। তার বেশী নয়। যে ব্যবহার শত্রুর মতিগতি বদলে দিতে পারে সেই ব্যবহার দিয়ে নিজের স্ত্রীকে আরও কত বেশী কাছে টেনে নিতে পারতেন এ কথাটা কেন আপনি বুঝতে চাইছেন না। আপনার স্ত্রীর মনের দিকে চোখ মেলে চাইলেন না। জাঁক করে স্কুলমাষ্টারের মেয়ে বলে খোঁটা দিলেন। বিয়ে করে কৃতার্থ করেছেন এই কথাটাই—

কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে অতনু বলল, শ্রীমতী তোমাকে এই সব কথা বলেছে বুঝি ?

অতনুর মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে দুঃখিত ভাবে মিত্রা জবাব দিল, খুব দুর্ভাগ্যের কথা। এতদিন কাছে কাছে থেকেও তার সম্বন্ধে আপনি এ কথা ভাবতে পারলেন কি করে বুঝি না। মানুষ গরীব হলেই ছোট হয় না। এতবড় অসম্মানের কথা মরে গেলেও তিনি কাউকে বলবেন না। আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর যথার্থ সম্বন্ধটা এ বাড়ীর চাকর-বাকরও জানে। আর আপনিই তা জানতে দিয়েছেন।

অতনু একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে স্তিমিত গলায় বলল, অথচ আমি জানতে পারি নি।

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, নিজে চোখ বুজে কাজ করে যাঁরা মনে করে তার কাজের বুঝি কেউ সাক্ষী রইল না। এমনি করেই তাদের ক্ষতিপূরণ করতে হয় অতনুবাবু।

অতনু ম্লানকণ্ঠে জবাব দেয়, কিন্তু একটা কথা আমি বুঝি না মিত্রা। অন্যায় যদি আমি করেই থাকি তার প্রতিবিধান ত আর পাঁচটা অন্যায় দ্বারা হবে না!

মিত্রা বলল, যারা ভাল কথায় বোঝে না তাদের এমনি করেই বোঝাতে হয় অতনুবাবু। গান্ধীজীর হত্যাকারীকেও তাই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছে।

অতনু অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, শ্রীমতী কোথায় গেছে তুমি জান মিত্রা?

মিত্রা বলল, না জানলেও আন্দাজে বলতে পারি। চেষ্টা করলে আপনিও জানতে পারেন।

অতনু ম্লানহেসে বলল, তা হয়ত পারি।

মিত্রা বলল, আজ এতদিন পরে শ্রীমতীর খোঁজ করছেন কেন জানতে পারি কি? এ বাড়ীর দরজা ত তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে গেছে বলে শুনেছি।

অতনু একটু যেন অন্যমনস্কভাবে বলল মিথ্যে কথা শোন নি মিত্রা।

মিত্রা প্রশ্ন করে, তা হলে খোঁজ করে লাভ?

নিছক কৌতূহল, অতনু জবাবে বলল।

মিত্রা বলল, ডাক্তারবাবু বললেন, তিনি তাঁর বাবার কাছে চলে গেছেন।

অতনু সহসা শ্রীমতার কথা বাদ দিয়ে ডাক্তারবাবু সম্বন্ধে প্রশ্ন করল, শ্রীমতী চলে যাবার পর তিনি বোধ হয় আর আসেন নি?

মিত্রা বলল, আপনি ডেকে পাঠাতে সেই যে একবার এসেছিলেন তারপরে আর আসেন নি।

অতনু শুধায়, তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায়?

মিত্রা সংক্ষেপে জবাব দিল, তাঁর বাড়ীতে।

অতনু বলল, তোমরা সকলেই ইচ্ছামত চলা-ফেরা করছ, কিন্তু আমার উপর এত বিধিনিষেধ কেন বলবে কি মিত্রা?

মিত্রা বলল, যতদিন আপনার কারখানার ঘুণ্ধরা খুঁটিগুলো পালটে ফেলতে না পারি ততদিনই আমার প্রত্যেকটি কথা আপনাকে মেনে চলতে হবে।

অতনু বলল, আর আমি যদি তোমাদের কথা অগ্রাহ্য করি মিত্রা ?

মিত্রা একটু চমকে উঠলেও মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হেসে জবাব দিল, আপনি তা পারেন না অতনুবাবু। কারণ আপনি কথা দিয়েছেন।

অতনু ক্লান্ত হেসে জবাব দিল, আমি ভিতরে ভিতরে খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি মিত্রা। নইলে এভাবে আমাকে নিয়ে তোমরা মজা কবতে পারতে না। কিন্তু আমার একটা কথার স্পষ্ট জবাব দেবে।

মিত্রা বলে, দেব।

অতনু মৃদু শান্তকণ্ঠে বলল, আমার অসুস্থতাব সুযোগ নিয়ে এই যে কাণ্ডটি করে যাচ্ছ এতে সত্যি সত্যি বাঁচবে কে ? শুধুই কি আমি ?

মিত্রা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল, শুধু আপনি হতে যাবেন কেন।

অতনু হেসে বলল, তা হলে বেছে বেছে আমার মাথায় ঘুণধরা খুঁটি ভেঙে পড়বে কেন বলতে পার মিত্রা ?

মিত্রা বলল, বড় গাছকেই বড় ঝাপটা সইতে হয়।

অতনু জবাব দিল, তাতে সব সময় গাছ ভেঙে পড়ে না।

মিত্রা বলল, কিন্তু যে গাছের শেকড় মাটি থেকে আলগা হয়ে গেছে তার বেলায় ও যুক্তি টেকে না অতনুবাবু।

মিত্রাব এ যুক্তি অতনু মানতে চায় না। সে মাথা নেড়ে বলে, তোমার এ যুক্তি আমাব জন্য নয় এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। তোমার ঐ তথাকথিত খুঁটিতে যারা ঘুণ ধরায় তারা কি একবারও ভেবে দেখে না যে কারা ঐ ঘুণধরা খুঁটি চাপা পড়ে মারা যায় ? ঐ মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি অন্ততঃ আমার শ্রেণীর

যারা তারা কোনদিন করে না। যারা আজীবন খেটে খায় মরতে তারাই শেষ পর্য্যন্ত মরে।

মিত্রা মৃদুমৃদু হাসতে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

অতনু বলে, খুব কি হাসির কথা হ'ল এটা?

অন্য কারণে হাসছিলাম, মিত্রা বলল, আচ্ছা অতনুবাবু, যে দুর্ভাগাদেব কথা একটু আগে বললেন, ক্ষতিটা যদি শুধু তাদেরই একতরফা হয় তা হলে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটে যেতে চাইছেন কেন? ডানকান-আগরওয়ালাকেই বা কিসের জন্য তাড়ালেন?

অতনু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, আর যাদের কথা ইচ্ছে তুমি বলতে পার আমি বাধা দেব না, কিন্তু ওদের নাম আমার কাছে তুলো না।

মিত্রা বলল, আপনি যদি না চান তবে আর বলব না। কিন্তু আপনার অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বিষয় যদি কিছু বলি? তাদের অভাব-অভিযোগ জানাবার একটি মাত্র স্থান ছাড়া ত আর নেই অতনুবাবু।

অতনু বলল, আমার দেবার ক্ষমতার চেয়ে বেশী যদি তারা দাবী করে সেক্ষেত্রে আমার করণীয় কি বলতে পার মিত্রা?

মিত্রা জবাব দেয়, সেক্ষেত্রে দায় এবং দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিন। প্রকৃত সত্য অবস্থাটা জানতে পারলে ওরা আপনিই থেমে যাবে।

শান্তকণ্ঠে অতনু বলল, কাজ করা আর কাজ করানো কি এক কথা মিত্রা?

মিত্রা চুপ করে থাকে।

অতনু বলতে থাকে, তোমার যুক্তি ভ্রান্ত এমন কথা আমি বলতে চাই না, কিন্তু আমাদের দিকটাও একবার ভেবে দেখতে বলি।

মিত্রা বলে, করতে আমি কিছুই বলছি না। আমি শুধু যাচাই করে দেখার কথা বলছিলাম। ব্যবসায় এটাও একধরনের "স্পেকুলেসান" নয় কি? একবার পরখ করে দেখুন না কেন।

অতনু সহসা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আর কেউ পারবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি এ কাজ মরে গেলেও পারব না। তার চেয়ে বরং নিজের হাতে সব ধ্বংস করে ফেলব।

তবুও এই পথে চলতে পারবেন না? মিত্রা বলে, অতনুবাবু পুরানো দিনের সবই যখন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে তখন পুরাতন আর নতুনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে না চলতে পারলে যে অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

অতনু বলল, কার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে? পুরাতনপন্থাদের না আধুনিকপন্থীদের। মিত্রা তুমি আমাকে পুরাতন ভিতের উপর নতুন ইমারত তোলবার বুদ্ধি দিচ্ছ—তার পরমায়ুর কথাটা একবারও ভেবে দেখছ না। বাইবে থেকে রং পালিশ করে যতই দৃষ্টিশোভন করে তোলা হোক না কেন ভিৎটা কিন্তু নোনাধরাই থেকে যাবে। তুমি যা বলছ তাকে আমাব দালদা-মেশান ঘি বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। অর্থাৎ ওটা ঘি-ও নয় দালদাও নয়। এই মধ্যপন্থাকে আমার ভাল লাগে না মিত্রা।

মিত্রা হাসতে থাকে।

অতনু দুঃখিত হয়ে বলে, এটাও বুঝি একটা হাসির কথা বলেছি?

মিত্রা বলল, আপনি বেশ মজাব মজার কথা বলতে পারেন। শুয়ে শুয়ে এই সবই আজকাল ভাবেন বুঝি? আপনার জন্য সত্যিই এতদিন পরে আমার ভাবনা হচ্ছে। কোথায় চাবুক আর কোথায় স্নেহপদার্থ ঘি। সত্যি সত্যিই আপনি খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। এবারে বাড়ীর দরজা, জানালা আর চৌকাঠগুলি একে একে তুলে ফেলুন দেখবেন জীবনটা কত সহজ আর সুন্দর হয়ে উঠেছে অতনুবাবু।

অতনু গম্ভীর হয়ে উঠল।

মিত্রা তার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে নরম গলায় বলল, আপনাকে দুঃখ দিলাম কি অতনুবাবু? বিশ্বাস করুন আমার উদ্দেশ্য মোটেই খারাপ নয়।

অতনু এ কথারও কোন জবাব দিল না।

মিত্রা থামতে পারে না। বলতে থাকে, আর একটু সহজ হয়ে উঠুন···আর একটু নেমে এসে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান—ডাক্তারবাবু গুছিয়ে দেবেন আপনার কারখানা। আমি গুছিয়ে দেব আপনার ঘর—

সহসা অতনু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, হঠাৎ সকলে মিলে আমার ভাল করবার জন্য এমন উঠে-পড়ে লেগেছ কেন বলতে পার মিত্রা দেবী? আমি ত কোনদিন তোমাদের এতটুকু উপকার করেছি বলে মনে পড়ে না।

মিত্রার মুখের চেহারা বদলে গেল। সে করুণ হেসে বলল, অপরের কথা জানি না। আমি কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে চাইছি।

অতনু একজোড়া সন্ধানী দৃষ্টি মেলে মিত্রার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে এক সময় হা-হা করে হেসে উঠে বলল, তোমার এ কথাটাও কি আজ আমাকে বিশ্বাস করতে বল মিত্রা?

মৃদুকণ্ঠে মিত্রা জানাল, হ্যাঁ।

অতনু মিত্রার দৃষ্টি এড়িয়ে একটি নিঃশ্বাস মোচন করে বলল, বিশ্বাস করলাম। জান মিত্রা মানুষের মন বড় বিচিত্র বস্তু। একদিন যা ছিল নিছক অভিনয় আজ তাই হ'ল সত্য। তোমাকে কোনদিন কোন কারণে আমি বিশ্বাস করতে পারব এ কথা যদি দৈববাণীও হ'ত আমি সে দেবতাকে কৃপার চোখে দেখতাম।

মিত্রার কণ্ঠস্বর প্রায় বুজে এল। সে ফিসফিস করে বলল, আশ্চর্য্য! এই একই কথা আমিও যে সব সময় ভাবি। ভয় হয়··হাসিও পায়। এ কেমন করে সম্ভব হ'ল বলতে পারেন? এর কি সত্যিই কিছু দরকার ছিল···অথচ

কেষ্ট দেখা দিয়েছে।

মিত্রা একটু নড়েচড়ে অকারণে কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে স্থির হয়ে বসল।

কেষ্ট ঘরে প্রবেশ করে বলল, দাদাবাবুর খাবারটা কি এখন

তৈরী করবেন ? বলেন ত আমিও ব্যবস্থা করতে পারি। পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

অতনু বলল, তুমিই যা হয় কর কেষ্ট।

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল, খাবারটা আমিই করব। চল কেষ্ট।

ওরা একসঙ্গেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

২৪

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিত্রা ফিরে এল। সঙ্গে কেষ্ট এসেছে ট্রে নিয়ে।

মিত্রা বলল, খানকয়েক পেষ্ট্রি শুধু এনেছি। চা আর এখন দেব না। কোকো খান। কথায় কথায় আজ আপনাব বড্ড দেরি হয়ে গেল।

কেষ্ট টিপয়ের উপর ট্রে রেখে নিঃশব্দে চলে গেল।

অতনু বলল, সেজন্য তুমি দায়ী মিত্রা।

মিত্রা একটু হেসে কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বলল, আমার দোষ হয়ে গেছে মেনে নিলাম। এবারে দয়া করে আপনি আরম্ভ করুন।

অতনু খেতে খেতে বলল, আচ্ছা, কেষ্ট হঠাৎ তোমার এমন ভক্ত হয়ে উঠল কেমন করে বলতে পার মিত্রা ?

জবাব না দিয়ে পাল্টা পশ্ন করে মিত্রা, হয়েছে নাকি ?

অতনু বলল, কেন, বুঝতে পার না তুমি ?

পারি। মিত্রার কণ্ঠস্বর সহসা গাঢ় হয়ে উঠল। বলল, সত্যিকারের প্রভুভক্ত বলেই শত্রুমিত্র চিনতে ভুল করে না।

অতনু সহাস্যে বলল, এক সময় কিন্তু তোমাকে চোখে চোখে রাখত আর সুযোগ পেলেই চীৎকার করত।

নিতান্ত সহজ কণ্ঠে মিত্রা জবাব দিল, আজ আর বলতে বাধা নেই অতনুবাবু। চীৎকার করে কিছু অন্যায় করত না। আপনার

আশেপাশে জনকয়েক লোক সব সময় জেগে ছিল. আর আছে বলেই আজও আপনাব মাথা উঁচু করে চলবাব পথ আছে। আর আমিও নিজেকে শুধরে নেবাব সুযোগ পেয়েছি।

অতনু পুনবায় গম্ভীর হযে উঠল। বলল, সুযোগ কে কাকে দিয়েছে ওটা তর্কেব বিষয়। কিন্তু মাথা উঁচু করে চলার অর্থটা ঠিক বোঝা গেল না মিত্রা। তুমি কি আমাকে আঘাত করবার চেষ্টা করছ?

মিত্রা উত্তাপহীন কণ্ঠে বলল, আমার দুর্ভাগ্য যে, আঘাত কবার কথাটা আপনি ভাবতে পাবলেন। অবস্থাব গুরুত্বটা বোধ হয় আপনি বুঝতে পাবেন নি, তাই এ কথা বলতে পাবলেন।

অতনু বলল, অবস্থাব গুরুত্ব বুঝেও আমি সূতো ছেড়েছি মিত্রা। এত খেলেও তাই মুখ থেকে তুমি বঁড়শি খুলতে পারছ না।

একটুখানি চুপ কবে থেকে মিত্রা জবাব দিল, তা হয়ত পারি নি, কিন্তু শিকারীকে জলেও নামিয়েছি আর ল্যাজের ঝাপটাও মেরেছি। এ কথা নিশ্চয় স্বীকাব কববেন।

তবে প্রাণে মারতে পাব নি। অতনু পরিহাস কবে বলল।

মিত্রাও রহস্য করে বলল, হতমান করতে পেরেছি ত?

তা পেবেছ। অতনু জবাব দিল, আব এইটেই ত আমারও প্রশ্ন, কিন্তু তোমাব আজ কি হয়েছে বল দেখি মিত্রা? একবার বলছ মাথা উঁচু কবে চলতে পারছি আবার বলছ হতমান হয়েছি, তোমাব কোন্ কথাটা সত্যি?

মিত্রা সহজ গলায বলল, দুটোই সত্যি অতনুবাবু। যে আপনাকে জলে নামিযেছে আপনি তাকে ডাঙায় তুলেছেন। আপনারই সেবায় সে দিযে বসল তাব প্রাণ। যে জানে আপনার জলে নামাব ইতিহাস তাব মুখ ত চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

অতনু মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, মেয়েদেব চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, এটা ঋষি বাক্য। ও জানবার আমার আগ্রহ নেই তাই বলে

কথাগুলো এমন দুর্বোধ্য হবে কেন? আমার মাথায় একেবারেই ঢোকে না।

মিত্রা গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলল, সেইজন্যেই মুঠো ভক্তি পেয়েও তা গ্রহণ করতে জানেন না। মূল্য দিতে পারেন না।

অতনু বলল, মুঠো ভক্তি ছাই পেলেও তাকে মূল্য দিতে হবে মিত্রা?

মিত্রা গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবার আগে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে দোষ কি? ছাইয়ের তলায় মণি-মুক্তাও পাওয়া যেতে পারে।

অতনু বলল, এত ঘুরিয়ে কথা বল কেন মিত্রা? আর একটু সহজসরল ভাষায় বলতে পার না?

মিত্রা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, পারি। তবে সকলে যে সহজসরল কথা সহ্য করতে পারে না অতনুবাবু। আপনিও পারবেন না।

খানিক মিত্রার মুখের পানে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অতনু বলল, আর একটু সহজ করে বল।

মিত্রা বলল, রাতদুপুরে একজন যুবতী সুন্দরী স্ত্রীলোকের ঘর থেকে স্বামীকে বের হয়ে আসতে দেখলে কোন স্ত্রীই চুপ করে থাকতে পারে না। কিন্তু তারই অভিযোগের পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে সেই স্ত্রীর চরিত্রের উপর অকারণে যদি দোষারোপ করে ব্যঙ্গ করা হয় তা হলে—

থাম মিত্রা—অতনু ধমকের সুরে চীৎকার করে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সে যেন অনেকখানি বদলে গেল।

মিত্রা জবাব দিল, সত্য কথা সহজভাবে বললে আপনার ভাল লাগবে না বলায় অনুযোগ দিয়েছিলেন না অতনুবাবু?

অতনু ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছে।

মিত্রা কিন্তু থামতে পারল না। বলে চলল, আপনি অনেক বোঝেন, অথচ এই অতি সাধারণ কথাটা কেন বুঝতে চান না আমি

জানি না। মানুষ সব সময়ই মানুষ। গ্রহের ফেরে আপনি আজ ওখানে আর আমি এখানে। তারই জোরে আপনি আমাকে গরু-ছাগল মনে করতে পারেন না। মনে করা উচিত নয়।

অতনু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, শ্রীমতী কি তোমাকে উকিল নিযুক্ত করে গেছে মিত্রা দেবী?

মিত্রা শান্তভাবে জবাব দিল, এ আপনার অশ্রদ্ধার কথা অতনুবাবু। মনটাকে আর একটু উদার করবার চেষ্টা করুন। দেখবেন অনেক সমস্যাই কত সহজ হয়ে যাবে।

একটু ইতস্তত: করে অতনু বলল, শ্রীমতী পুরোপুরি মেয়ে নয়—

মিত্রার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। বলল, এমন উদ্ভট কথা কখনও শুনি নি আমি। একজন মেয়ের সম্বন্ধে অপর একটি মেয়ের কাছে এই ধরনের কথা আর কোনদিন আপনি বলবেন না। আপনার আসল বক্তব্যটা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি শুধু খেলাতেই ভালবাসেন না—খেলেও আনন্দ পান। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে ঐ একটি বিশেষ বিন্দুতে সীমাবদ্ধ নয় অতনুবাবু।

অতনু চুপ করে আছে।

মিত্রা বলে চলেছে, আপনার স্ত্রী অত্যন্ত স্পষ্ট। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে এই ধরনের খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিকে সম্ভবত: কোনদিন আমল দিতে পারেন নি, তাই পুরোপুরি পেয়েও আপনার মন ভরে নি।

অতনু তথাপি নীরব।

মিত্রা বলতে থাকে, আগের দিনে মেয়েরা স্বামীর কাছ থেকে সন্তান পেলেই ভালবাসার চরম পুরস্কার পেয়েছে মনে করতে দ্বিধা করত না, কিন্তু আজ আর এইখানে এসেই তারা থামতে পারে না। দেহ এবং মন দুটোই তাদের সজাগ হয়ে উঠেছে। এর কোনটাকেই আর উপেক্ষা করা চলে না।

এতক্ষণে দ্বিধাভরে অতনু থেমে থেমে জবাব দিল, তোমার কথাগুলো কি নিতান্তই একতরফা হয়ে যাচ্ছে না মিত্রা?

মিত্রা দ্বিধাহীনকণ্ঠে জানাল, না অতনুবাবু। এটা হ'ল নিছক পরস্পর পরস্পরকে বোঝাপড়ার প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে দরদ দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে দেহ আর মন কোনটাই উপবাসী থাকে না।

অতনু ধীরে ধীরে বলে, তোমাব বক্তব্যগুলি কিছু কিছু বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে। আরও একটু সহজ করে বলবে কি?

মিত্রা একটু হেসে বলল, মিথ্যা বাদপ্রতিবাদ করে সবকিছুকে লঘু করে দেখবার চেষ্টা করেন বলেই সহজটাও আপনার কাছে সহজ মনে হয় না। কথাটা আপনিও জানেন আর আপনার স্ত্রীকেও জানিয়ে দিয়েছেন আপনাদেব মধ্যের প্রকৃত ব্যবধানটা। তাই তিনি চাইলেও আপনি সম্পূর্ণ এগিয়ে যেতে পারেন নি। আপনার অহঙ্কার আপনাকে এগোতে দেয় নি। উপরন্তু খোঁচা দিয়ে তাঁর উপবাসী মনটাকে রক্তাক্ত করে ছেড়েছেন—

অতনু যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল, মিত্রা—

মিত্রা থামতে পারে না। কতকটা যেন নেশার ঝোঁকে সে বলে চলেছে, অস্বীকাব কবতে পাবেন এসব কথা? অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে, একদিন আপনিই তাঁকে উপযাচক হয়ে বিয়ে কবেছেন।

অতনু উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠল, তুমি কি চাও মিত্রা—

অতনুকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মিত্রা বলতে থাকে, আপনার চোখে না পড়লেও আমার দৃষ্টিকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নি। আপনার এই ধরনের ব্যবহারকে তিনি সুরুতে উপেক্ষা করে চলবার চেষ্টাই করেছেন। মিথ্যে বলব না—প্রথম প্রথম আমি অবাক্ হয়ে ভাবতাম এ তিনি করছেন কি? কেন তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন না এতবড় অসম্মানজনক অন্যায়ের বিরুদ্ধে?

অতনু ক্লান্ত গলায় বলল, তোমাব মতে আমি আগাগোড়া শুধু ভুল আর অন্যায়ই করেছি?

মিত্রা জবাব দিল, গোড়ার কথা আমি জানি না অতনুবাবু।

আমার যতটুকু চোখে পড়েছে সেইটুকুই আপনাকে বললাম। আপনিই ভাবুন দেখি, কতবড় অন্যায় আর নোংরা কথা স্বামী হয়ে স্ত্রীকে বলেছেন? এর পরে কোন্ স্ত্রী মুখ বুজে থাকতে পারে?

অতনু ধীরে ধীরে বলে, তুমি ত স্বামীর স্ত্রী নও মিত্রা!

মিত্রা খানিকটা ধমকের সুরে বলল, থামুন অতনুবাবু। মা হয়েই মেয়েরা মায়ের পেট থেকে জন্মায় না। তাই বলে তাদের পুতুল খেলায় মায়ের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয়কে নিছক অভিনয় মনে করার পিছনেও কোন যুক্তি নেই।

কাতরকণ্ঠে অতনু বলল, তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর মিত্রা।

মিত্রা তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু জ্ঞানপাপী নই অতনুবাবু।

অতনু মৃদুস্বরে বলল, যত কথা আজ তুমি আমাকে শোনালে তা আমার মনে থাকবে মিত্রা। কিন্তু শ্রীমতীকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবার যে তোমার কি উদ্দেশ্য তা আমি এখনও বুঝলাম না।

মিত্রা বলল, একটুও বাড়িয়ে বলি নি। যা আমার মনে হয়েছে আমি অকপটে তা প্রকাশ করেছি। তা ছাড়া এতে আমার লাভ কি?

অতনু এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মিত্রার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে এক সময় মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, সেটা তুমিই ভাল জান। কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশ্যটা সত্যিই বুঝতে পারি নি।

মিত্রা বলল, এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে—আমার যা মনে এসেছে বলে গেছি। যদি মনে করেন এসব ভিত্তিহীন কথা, তা হলে ভুলে যাবেন। আমরা ইতর জন, চাকরিটি বজায় থাকলেই সুখী হব।

মিত্রা মুহূর্তের জন্য থেমে পুনরায় অন্য প্রসঙ্গে এল, বলল, আচ্ছা অতনুবাবু, আপনার স্ত্রী যদি এখন ফিরে আসেন তা হলে কি করবেন?

অতনু ধীরে ধীরে বলে, শ্রীমতী খুব সহজে আসবে বলে আমার মনে হয় না।

মিত্রা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তাঁর সম্বন্ধে এতবড় একটা সিদ্ধান্ত কোন্ যুক্তিতে করে বসেছেন আমি বুঝি না অতনুবাবু ?

অতনু বলে, ওটা আমার বিশ্বাস।

মিত্রা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আপনার ভুল—আপনার স্ত্রীকে আসতেই হবে। তাঁর নিজের জন্য না হলেও অন্ততঃ সন্তানের মঙ্গলের জন্য—

অতনু বসে ছিল। সহসা সোজা উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কি পাগলের মত বকছ মিত্রা—

মিত্রার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। সে বোকার মত খানিক অতনুর মুখের পানে চেয়ে থেকে হতাশ ভাবে বলল, আপনাকে আমার আর বলবার কিছু নেই। আপনি আমার চেয়েও দুর্ভাগা অতনুবাবু।

অতনু জবাব দিতে পারে না। তার কথা হারিয়ে গেছে।

২৫

অকস্মাৎ ঠাকুরদার উপর অতনুর মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। মিত্রার উক্তিগুলি যুক্তি-বিচার দিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে বারে বারেই তার মন বলছে যে, সে হয়ত মিথ্যে বলে নি। তার জীবনের এতগুলি বছর যে পথ বেয়ে এগিয়ে এসেছে তার দু'পাশে অতনু অনেক ফুল ফোটাতে পারত। কিন্তু তা সে করে নি। করবার কথা একবারও মনে হয় নি। আত্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিল। যে চিন্তা শুধু দেহকে কেন্দ্র করেই বাস্তব রূপ নিয়েছে। ভেঙেছে অনেক, ছিঁড়েছে প্রচুর। এ পথে যে আনন্দ সে পেয়েছে তা শুধু তাকে উদ্দাম করে তুলেছে। ঠাকুরদা তাকে দু'হাত ভরে নিতে শিখিয়েছিলেন, দিতে নয়। চিরদিন পেয়ে পেয়ে অতনুর মনের একটা দিক প্রায় মরে যেতে বসেছিল। শ্রীমতীই তার জীবনে প্রথম

মেয়ে যার হাতের সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে সে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে বলেছিল, আমাকে গ্রহণ কর। শ্রীমতী নিলে —নিজেকেও উজাড় করে দিলে। এত দিনের ঘুম-জড়ান চোখে সে চিনতে করল ভুল। শ্রীমতী কল্পনার রাজকন্যা নয়। একজন নারী। তার রূপ আছে, শক্তি আছে। অতনু স্বল্প সময়ের জন্য নিজেকে আদর্শ পুরুষরূপে ফিরে পেল। যে পুরুষ নারীর কাছে ধরা দেয় নিজেকে নবরূপে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায়।

ছন্নছাড়া অতনু শ্রীমতীকে ঘরে নিয়ে এল গৃহলক্ষ্মীরূপে।

কিন্তু লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন মন আবার নতুন করে অন্ধকারে বিপথগামী হ'ল। আবির্ভাব ঘটল মিত্রার। আবির্ভাব বললে ভুল বলা হবে। একলা বিপদাপন্ন অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেবার নাম করে অতনুর দুটো পোষা নেকড়ে তাকে নিয়ে এল তার বিশ্রামকুঞ্জে। অতনুর চোখে তখন উন্মাদ নেশা। ঘরের মধ্যে মিত্রা একলা। আর দোরগোড়ায় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ডানকান আর আগরওয়ালা। অতনু চোখ তুলে তাকাল। মেয়েটা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে, কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছে। অতনু চমকে উঠল। তার মনের অসংযত মত্ততা কেটে গেছে। আশ্চর্য্য! ঐ দুটো অদ্ভুত জ্বলন্ত চোখের মধ্যে শ্রীমতী এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার সেদিনের সেই সোনার কাঠি, মুখে বিচিত্র একটুকরো হাসি। অতনু আর একবার চমকে উঠল। ওর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অন্ধকারের কাল যবনিকা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে আলোয় আলো হয়ে গেছে। সে আবার নতুন চোখে দেখল মিত্রাকে, দেখল নিজেকে। অতনুর সমস্ত সত্তা কেঁপে উঠেছিল সেদিন। আর এক পা সে এগোতে পারে নি। একটা মিষ্টি সঙ্কোচ আর দ্বিধা তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। অতনু ইঙ্গিতে মেয়েটিকে মুক্তি দেবার আদেশ জানাল। ডানকান-আগরওয়ালা দূরে দাঁড়িয়ে মিত্রার বিব্রত আর বিপর্য্যস্ত অবস্থা উপভোগ করছিল। হঠাৎ তারাই ত্রাণকর্ত্তার ভূমিকায় এগিয়ে এল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

অতনু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কি সুন্দর আর স্নিগ্ধ মনে হয়েছিল সেই আলোটকু যে আলোতে সে দেখতে পেয়েছিল মানুষ অতনুকে। কিন্তু কোথায় শ্রীমতী! তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অতনুর জীবনযাত্রার এই অন্ধকার পথের সন্ধান কেমন করে সে পেল? কেমন করে ঘটল তার আবির্ভাব? কে দিল এখানকার সন্ধান?

অতনুর দ্বিধাবিভক্ত মনের আর একদিক বিদ্রোহী হয়ে উঠল তার জীবনের এই গোপন মহলে শ্রীমতীর প্রবেশ করবার দুঃসাহস দেখে, কিন্তু অপরদিক খুশী হ'ল আনন্দের আর একটি সহজ-সুন্দর পথের সন্ধান পেয়ে।

অতনুর চলার পথে এই ধরনের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে আর হয় নি। অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা করে অতনুর। একটা অনাস্বাদিত পরিতৃপ্তির স্বাদ পেয়ে সে যেন জেগে উঠেছে। নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছেটা আবার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখানে মিত্রা নয়, চিত্রা নয়, হেনা কিংবা সুচিত্রাও নয়—কাঁটাবনে চলতে-ফিরতে তার দেহ থেকে অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে, বিন্দু বিন্দু তাজা রক্ত। ফিরে সে কিছুই পায় নি। শুধু মনের কোণে জড়িয়ে আছে খানিকটা স্মৃতি। অতৃপ্ত আনন্দের চঞ্চল অনুভূতি-মাখান স্মৃতি। ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার দেহ। জর্জ্জরিত হয়েছে মন। তবুও অতনু থামতে পারে নি। থামার কথা সে মনেও স্থান দেয় নি।

নতুন সম্ভাবনার চিন্তায় অতনু চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অনুরণিত হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব্ব সুর! যে সুরে তাল আছে, মান আছে, লয় আর ছন্দ আছে।

অতনু ফিরে এল ঘরে, খুলে দিল স্বামী-স্ত্রীর দুই শয়ন কক্ষের মাঝের দরজাটা। তাজা ফুলের মধুর মদির সৌরভে ভরে গেছে তার মন। কোথাও এতটুকু অন্ধকারের মালিন্য নেই। অতনু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আশে পাশের সবকিছু। কাঁটা নেই—সৌরভ

আছে। নরম একরাশ তাজা ফুল। তুলে নিল বুকে। প্রাণ ভরে খেলা করল। ডুবে গেল গভীর থেকে আরও গভীরে।

কিন্তু তার মনের আর একটা দিক মেনে নিতে পারল না এই নতুন ব্যবস্থাকে। সুযোগ মত আবার ঐ খোলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে কানে তার বিপরীত বুদ্ধির বিষ ঢেলে দিল। অতনু চমকে ওঠে। যে ফুল বুকে তুলে নিয়েছিল তাকেই সে ধূলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। পা তুলে মাড়িয়ে দিতে উদ্যত হ'ল। ফুলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে সাপ। দংশন করে না। শুধু দু'চোখের বিষাক্ত দৃষ্টি দিয়ে একবার অতনুর সর্ব্বাঙ্গ লেহন করে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সেই থেকেই অতনু ছটফট করছে অন্তরে। দৃষ্টিতে যে এত বিষ থাকতে পারে ইতিপূর্ব্বে ঠিক এভাবে সে কোনদিন অনুভব করে নি। এর চেয়ে দংশন ঢের ভাল ছিল।

অতনু আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ অসুস্থতা তার মনের। মিত্রা অনুযোগ দিয়ে বলে, আপনি দেখছি খুব ভেঙে পড়েছেন।

একটি নিঃশ্বাস ফেলে অতনু ম্লানকণ্ঠে বলল, মিথ্যে বল নি মিত্রা। কথাটা আমিও প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করছি। একের পর এক আমার সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে।

মিত্রা মোলায়েম স্বরে বলে, ইচ্ছে করলেই সে ভাঙন আপনি রোধ করতে পারেন।

বাধা দিয়ে অতনু বলল, না মিত্রা, ইচ্ছে করলেই মানুষ তা পারে না। অন্ততঃ আমি যে পারছি না তা ত দেখতেই পাচ্ছ। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও মচকাতে পারছি না।

মিত্রা কোমলকণ্ঠে বলে, দয়া করে কয়েকটা দিন অন্ততঃ আপনার এই চিন্তাগুলো ছাড়ুন। শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিন।

অতনু বলল, বিশ্রাম কি কিছু কম নিচ্ছি মিত্রা? কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে সে বিশ্রাম উপভোগ করা আমার ভাগ্যে নেই, তোমরা সকলে মিলে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে বল দেখি। বেশ ছিলাম আমি।

মিত্রা নরম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কোন জবাব দিতে পারে না

অতনু স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে, অতনু কোনদিন তার অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎকে পাশাপাশি রেখে চিন্তা করে নি। করতে সে জানত না।

মিত্রা ভিজে গলায় জবাব দেয়, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন অতনুবাবু।

একটুখানি হেসে অতনু বলে, ক্ষমা কে কাকে করবে আমি বুঝি না মিত্রা। নিতে হলে কিছু দিতে হয়, এই চিরদিনের সত্যটা তুমি আমাকে শিখিয়েছ। শ্রীমতীও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার হাতের মুঠি দৃঢ় ছিল না। আমার গতিবেগ তাই আয়ত্তাধীনে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

মাথা নেড়ে মিত্রা বলল, ভুল বললেন। আসলে শ্রীমতীই আপনার বেপথু মনটাকে তৈরি করে দিয়েছেন, নইলে মিত্রার দ্বারা কিছুই হ'ত না। কিন্তু এসব কথা আপনার কাছে কে শুনতে চাইছে? আপনি এবারে চুপ করুন।

অতনুর কণ্ঠস্বর গাঢ় শোনাল। সে বলতে থাকে, আমাকে বাধা দিও না। কথা বলতে দাও। জান মিত্রা, আজ ক'দিন ধরেই আমি তোমার মধ্যে শ্রীমতীকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি। অথচ আমার জীবনপথে তুমিই একমাত্র মেয়ে যে অন্যায় আঘাতে ভেঙে পড়ে নি বরং নিঃশব্দে বুক বেঁধেছে সেই আঘাতকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। যে দেহটাকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দ্দিকে এত জঞ্জাল জড়ো হয়েছিল সেই দেহকে পন করেই জঞ্জাল সাফ করতে লেগে গেল। মনে মনে বললাম, সাবাস! অথচ এমনি মজা যে, তোমাকেই জব্দ করবার জন্য সেই জঞ্জালের মধ্যে সঙ্গোপনে ছড়িয়ে দিলাম প্রচুর ভাঙা কাচ। তখন কি একবারও ভাবতে পেরেছি যে, সেই ভাঙা কাচগুলি একদিন আমার বুকেই এ ভাবে বিঁধবে!

মিত্রা কাঁপা গলায় বলল, আমিও রেহাই পাই নি অতনুবাবু। আমারও সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। খেলাটা সব সময় খেলা থাকে না বলেই সংসারে এত দুঃখ অতনুবাবু। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যে শুধু বেদনা নেই বলেই এ খেলা থেমে যায় না।

অতনু বলে, তোমার এ কথার মানে ?

মিত্রা হঠাৎ অনেকখানি সাবধান হয়ে উঠল। বলল, কেন আবার—মানুষের দুঃখে কখন মানুষকে উল্লাস করতে কি আপনি দেখেন নি ? সেও ত এক ধরনের আনন্দ।

অতনু চুপ করে থাকে।

মিত্রা বলতে থাকে, এই দেখুন না—নিছক খেলা করবার জন্যই মিত্রাকে আপনি এ বাড়ীতে দিলেন আশ্রয়। শ্রীমতী কিন্তু এসেছিলেন সহধর্ম্মিণীর পদমর্য্যাদা নিয়ে—তিনি থাকতে পারলেন না। কিন্তু যাকে খেলার পুতুল হিসেবে—

কথাটা শেষ না করেই মিত্রা থামল।

অতনু গম্ভীরভাবে বলল, থামলে কেন, বল।

মিত্রা মৃদু কণ্ঠে বলল, তার পরের কথা আপনার অজানা নেই অতনুবাবু।

অতনু বলল, অর্থাৎ তোমাকে খেলিয়ে পেতে চেয়েছিলাম আনন্দ। কিন্তু শ্রীমতীকে দুঃখ দিয়ে কি পেতে চেয়েছিলাম বলবে কি ?

মিত্রা সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, উভয়ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই ছিল। হয়ত ধরনটা ছিল আলাদা।

অতনু বলে, হয়ত তোমার কথাই ঠিক। খেলা সব সময় খেলা থাকে না বলেই এত দুঃখ, এত আনন্দ। শ্রীমতীকে দুঃখ দিতে আমি চাই নি। কিন্তু সে পেল দুঃখ। তোমাকে নিয়ে এলাম দুঃখের আঘাতে ভেঙে গুঁড়ো করতে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। হয়ত এমনি করেই মানুষকে শিখতে হয়। নইলে শ্রীমতীর জন্য আমার মনের এ আকুলতা কেন, আবার তোমার কথা ভেবেই বা এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছি কিসের জন্য ?

অতনুর কথা বলার ধরনটা আজ এলোমেলো। মিত্রা সাবধানে এগোতে চাইছে। সে মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার কথা ছেড়ে দিন,

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনার স্ত্রীর আর একটু তলিয়ে দেখা উচিত ছিল। আর খানিক ধৈর্য্য ধরলে ভাল করতেন।

অতনু সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, না মিত্রা, তাতে অতনুর কোন দিন চৈতন্য হ'ত না। তার অহঙ্কার আরও বেড়ে যেত। বড় আঘাতেই বড় পরিবর্ত্তন ঘটে।

মিত্রা বলল, এত ভালবেসেও তাকে ধরে রাখতে পারলেন না।

অতনুর মুখে সুন্দর খানিকটা হাসি দেখা দিল। বলল, ওখানেও সন্দেহ ছিল মিত্রা। শ্রীমতীরও ছিল, আমারও ছিল। শ্রীমতীর জন্য আজ আমি আর ভাবছি না, আমার ভাবনা এখন তোমাকে নিয়ে। এই ভাবনাগুলি সত্যিই আমাকে দুঃখ দিচ্ছে—

সহসা খিল খিল করে হেসে উঠল মিত্রা। হাসির শব্দে অতনু চমকে উঠে। তার মনের আচ্ছন্ন ভাব কেটে যায়। বিব্রত-বোধ করে।

মিত্রা বলে, হঠাৎ আপনার দুঃখের সাগব এমন করে উথলে উঠল কেন অতনুবাবু। আপনি এমন ত কোনদিন ছিলেন না?

অতনু ম্লান হেসে জবাব দেয়, নিজে দুঃখ না পেলে অপরেব দুঃখ অনুভব করা যে সম্ভব নয় মিত্রা—

মিত্রা কতকটা রহস্যের ছলে বলল, আজকাল তা হলে অনুভব করতে পারছেন? কিন্তু সত্যিই কি এটা আপনার মনের কথা অতনুবাবু?

অতনু ম্লান হেসে বলে, তোমার কি সন্দেহ হয়?

মিত্রা স্পষ্টভাবে বলল, হয়।

অতনু বলল, আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই সন্দেহের কারণটা বলবে মিত্রা?

মিত্রা সহসা যেন একেবারে বদলে গেল। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, কারণটা ত সামনেই পড়ে আছে। আপনি চোখ বুজে থাকলে কেমন করে আর দেখতে পাবেন।

একটু থেমে সে পুনরায় বলতে থাকে, আপনার সান্নিধ্যে এসে

কতটুকু পেলাম আর কতখানি খোয়ালাম তার হিসেব আজ আর করবেন না। তাতে কোন পক্ষেরই দুঃখ ঘুচবে না। তার চেয়ে আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে, মাথা উঁচু করে চলতে সাহায্য করুন অতনুবাবু। হায় ভগবান! নিজের স্ত্রীকে অকারণে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে উনি এসেছেন আমাব মত একটা অপবিত্র মেয়ের দুঃখ ঘোচাতে। এ ধবনের চিন্তা আপনি কেমন করে করেন আমি বুঝি না।

অতনু বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মুখে তার কথা যোগায় না।

মিত্রার দু'চোখ সজল হয়ে উঠেছে। তাই লুকাতে সে দ্রুত ঘব ছেড়ে চলে গেল।

২৬

বেশীক্ষণ না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মিত্রা পুনরায় ফিবে এল। অতনু তখনও দু'হাতেব মধ্যে মাথাটা চেপে ধরে চুপ করে বসে আছে। মিত্রা ঘরে ঢুকে খানিক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার আনত অন্যমনস্ক মুখের পানে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার কাঁধেব উপব একখানি হাত রেখে মোলায়েম কণ্ঠে ডাকল, অতনুবাবু—

অতনু মুখ তুলে তাকাল। কথা বলল না।

মিত্রা পুনরায় বলল, এত কি ভাবছিলেন?

অতনু বলল, আত্মসমর্পণের মধ্যে যে এতবড আনন্দ আছে তা আমি জানতাম না—

মিত্রা আরও একটু ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল, আপনাকে একেবারেই মানাচ্ছে না অতনুবাবু। এসব কথা আপনার মুখে সত্যিই বড় বেমানান লাগছে। আপনি বরং আগের মত ধমক দিন। অকারণে দুঃখের কারণ হোন, তবুও কারণে এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যাবেন না।

অতনু যেন শুনতে পায় নি এমনি ভাবে বলল, তুমি যদি গ্রহণ কর আমি তোমাকে আমার কারখানাটা দিতে পারি।

মিত্রা হেসে ফেলে বলল, কি বললেন? আমাকে দেবেন আপনার কারখানা? কিন্তু আপনি দিতে চাইলেও আমি কি নিতে পারি? সেইজন্যই বুঝি দুঃখ দূর করবার কথা বলছিলেন? সত্যি করে বলুন দেখি অতনুবাবু, এতে আমার দুঃখ দূর করা হবে না শত্রুতা করে আরও ঢের বেশী বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে? তার চেয়ে বরং ডানকান আর আগরওয়ালাকে ডেকে দান করুন।

মিত্রা পুনরায় হেসে উঠল।

অতনু গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি কি আমাকে পাগল ঠাউরেছ মিত্রা?

মিত্রা হালকা সুরে জবাব দিল, তার বড় বাকীও নেই। নইলে মিত্রাকে নিয়ে এই ধরনের পরিহাস করতে অতনুবাবুর আটকাত।

অতনু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, তোমাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়েছি বলেই কি আমাকে এভাবে আঘাত করছ মিত্রা?

মিত্রা স্নিগ্ধ হেসে জবাব দেয়, শুধু প্রশ্রয় পেলে এতখানি এগোতে ভরসা পেতাম না অতনুবাবু। এ সাধারণ কথাটা আপনার বোঝা উচিত ছিল।

অতনু গাঢ়কণ্ঠে বলল, এই কথাই এতক্ষণ ধরে তোমার কাছ থেকে আমি শুনতে চেয়েছিলাম। বলতে পার মিত্রা, এতবড় অসম্ভব কি করে সম্ভব হ'ল?

মিত্রা ভিতরে ভিতরে সঙ্কুচিত হলেও প্রকাশ্যে সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

অতনু বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হ'ল না।

মিত্রা শান্তকণ্ঠে বলল, এই সব আজেবাজে চিন্তাই বুঝি আজকাল আপনি করেন?

অতনু কথাটা একপ্রকার স্বীকার করে নিল।

মিত্রা গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, তারপর বোধ হয় মিত্রাকে নিয়ে

মনে মনে এক নাটক সৃষ্টি করেন? তাই না? হাতের কাছে এমন উপযুক্ত নায়িকা পেয়ে ছাড়বেন কেন?

অতনু বলল, তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন মিত্রা?

মিত্রা বলল, গম্ভীর না হয়ে কি করি বলুন ত? মিত্রা সত্যি-সত্যিই আপনার কেউ নয়। ভাগ্যদোষে সে সম্ভ্রম হারিয়েছে বলেই না তাকে নিয়ে এই ধরনের ঠাট্টা—

বাধা দিয়ে অতনু বলল, না মিত্রা, ঠাট্টা তোমাকে আমি করি নি। ভাগ্য তোমার সম্ভ্রম নষ্ট কবতে পাবলেও তোমার মনকে স্পর্শ করতে পারে নি।

মিত্রা জবাব দিল, দেহটাই যদি না বাঁচল মন বাঁচবে কাকে আশ্রয় করে অতনুবাবু? দেহের বিষে মনটা যে নীল হয়ে গেছে।

অতনু বলল, তোমার কথার মধ্যে যুক্তি থাকলেও অনুভূতি নেই। বলতে পার মিত্রা—যাকে কেন্দ্র করে তোমার জীবনে এতবড বিপর্যায়, তারই মঙ্গল চিন্তায় সেই তুমি এতখানি উতলা হয়ে উঠেছ কিসের প্রেরণায়?

মিত্রা এতক্ষণে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সে সহজ কণ্ঠে বলল, এক কথা আপনাকে আমি কতবার বলব? ভুল আপনিও যেমন করেছেন আমি নিজেও তেমনি কবেছি। ভুল করে সে ভুল শুধরে নেওয়ার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। তা ছাড়া আপনি ভুল করতে গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত করেন নি। কিন্তু আমি ভুল করে আপনার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি।

অতনু চুপ করে থাকে।

মিত্রা বলে চলে, প্রশস্ত করে দিয়েছি এ কথাই বা বলি কেন? আপনার অনেক ক্ষতিই করেছি। আপনাব এত অনুগ্রহের আমি উপযুক্ত নই অতনুবাবু। আপনি অনেক দিয়েছেন, অনেক দিতেও চেয়েছেন। অনেক আমি নিয়েছি আরও হয়ত নিতে হবে, কিন্তু তার আগে আমাকেও কিছু দেবার সুযোগ দিন। আমার সর্ব্বনাশা কাজের ফলে যত আপনার ভেঙেছে তার কিছুও যদি আমি গড়ে

দিতে না পারি তা হলে নিজেকেও যে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।

এতক্ষণে অতনু মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, তুমি আর আমাব কতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছ?

করেছি—করেছি অতনুবাবু—মিত্রা ধৈর্য্য হারিয়ে বলল, যেখানে যতকিছু অঘটন ঘটেছে তার মূলে রয়েছে আমার প্রতিহিংসা নেবার দুষ্টবুদ্ধি।

অতনু অবিচলিত কণ্ঠে বলল, আর আমার আত্মবিশ্বাসেব মিথ্যা দম্ভ। যে দোষ কবে তার চেয়ে যে দোষ করবার সুযোগ কবে দেয় সে কম অপরাধী নয় মিত্রা। কিন্তু তোমার এতবড় সর্ব্বনাশা বুদ্ধি হঠাৎ এমন মঙ্গলময় হয়ে উঠল কিসের ছোঁয়া লেগে?

মিত্রার কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু ভিতরের আবেগ বাইরে প্রকাশ পেল না। যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠেই সে বলল, সবকথা বলতে নেই অতনুবাবু। তবে পারেন যদি ডাক্তারবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। আপনি অন্যায়ভাবে তাঁকে মর্ম্মান্তিক অপমান করেছেন। অথচ অমন লোক হয় না।

শ্রীমতীও একথা বহুবার আমাকে শুনিয়েছে। অতনু বলল, তুমিও বলছ। কিন্তু আমি তোমাদের কারুর কথাই পুরোপুরি বিশ্বাস করি না।

মিত্রা বলল, আপনার দুর্ভাগ্য। আপনাব সে চোখ নেই বলেই দেখতে পান না। ভদ্রলোকের একটি চোখ আর একখানি কান সব সময় আপনাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। আপনাকে বেশী বলে লাভ নেই, কিন্তু একটা অনুরোধ—বিশ্বাস করতে না পারলেও তাঁকে অবিশ্বাস করবার দুর্ব্বুদ্ধি যেন আপনার কোনদিন না হয়।

অতনু বলে, তোমার কথা ভবিষ্যতে মনে রাখবার চেষ্টা করব।

মিত্রা বলল, আপনাদের মধ্যে এসে পড়ে কি পেলাম

আর কি হারালাম তার হিসেব করতে আজ আর ভাল লাগে না অতনুবাবু। কিন্তু একটা কথা খুব ভাল করে বুঝেছি যে, মানুষের ভাল করা শক্ত অথচ মন্দ করাটা কত সহজ। কত অল্প চেষ্টায় আপনার কতবড় ক্ষতি করে বসলাম।

অতনু বলল, সেই থেকেই শুধু মন্দ আর ক্ষতি ক্ষতি করে তুমি চীৎকার করছ মিত্রা। কিন্তু আমার মনে হয় অতনুর ক্ষতি করতে গিয়ে তার যথেষ্ট উপকারই করেছ।

মিত্রা দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দেয়, না অতনুবাবু, মিত্রা স্বেচ্ছায় আপনার কোন উপকার করে নি। ডাক্তারবাবুর ইচ্ছাশক্তিই রক্ষাকবচের কাজ করেছে। আমি নিমিত্তমাত্র। আচ্ছা, ভদ্রলোককে আপনি জোটালেন কোথা থেকে?

অতনু বলল, জোটাতে হয় নি। আপনি এসে জুটেছেন। ঠাকুরদার অ্যাটর্নীর পরিচয়-পত্র নিয়ে তিনি এসেছিলেন। সেই থেকেই আছেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে নিয়ে যতই বড় বড় কথা বল না কেন ওঁর প্রত্যেক ব্যাপারে অনাবশ্যক মাথা গলান আমার ভাল লাগে না। যদিও সোজাসুজি কোনদিনই তাঁকে অবজ্ঞা করি নি।

মিত্রা বলে, প্রথম প্রথম আমিও তাই ভাবতাম। আজ কিন্তু কথাটা ভুলেও মনে আসে না। বরং অভিভাবক বলে মনে করতে ভালই লাগে। শ্রীমতী রাগ করে চলে গেলেন। আপনি বোতল নিয়ে বসলেন। ভয় পেয়ে ছুটে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। বললাম সব কথা অকপটে। বুদ্ধি চাইলাম।

বললেন, জল অনেক দূর গড়িয়েছে দেখছি, কিন্তু তোমাকে যদি কেউ সাহায্য করতে পারে সে তুমি নিজেই। কল্যাণের পথটা যখন তোমার চোখে পড়েছে তখন নিজেই তুমি বাকী পথটুকু এগিয়ে যেতে পারবে। একের জন্য বহুর দুঃখের কারণ আর হতে পারবে না।

অতনু নিঃশব্দে শুনতে থাকে।

মিত্রা বলতে থাকে, কারুর দুঃখ দূর করবার ক্ষমতা নেই আর এতগুলি লোকের দুঃখের কারণ হয়ে বসলাম। আশ্চর্য্য! এই সহজ সত্যটা এতদিন আমার চোখে পড়ে নি। একবারও ভেবে দেখি নি যে, যাকে চূর্ণ করবার জন্য আমার এমন নিষ্ঠুর আয়োজন। তার কতটুকু যাবে কিন্তু যারা মাসের শেষ দিনটির পানে চোখ রেখে দিন গোনে তাদের এমন করে সর্ব্বনাশ করতে চলেছি আমি কোন্ বুদ্ধিতে? আমাকে থামতে হ'ল, আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলাম। ডাক্তারবাবু আমার দ্বিধাগ্রস্ত মনকে শক্তি যোগালেন।

মিত্রা থামতেই অতনু বলল, তারপর—

মিত্রা একটুখানি হেসে বলল, কিন্তু পিছু হঠতে গিয়ে দেখি যাদের সঙ্গে নিয়ে এতদিন ধরে কাজ করেছি তারা আমাকে মানতে চায় না। আবার ছুটে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। তিনি ধৈর্য্য ধরে আমার সব কথা শুনে সস্নেহে বললেন, আমি জানি মা, কিন্তু তাই ভেবে পিছিয়ে পড়লে ত চলবে না। ওদের এগোবার পথটা আরও সহজ করে দাও। বাধা দিয়ে বুদ্ধিহীন করে তুল না।

বললাম, তাতে কি ওদের গতিরোধ হবে ডাক্তারবাবু?

তিনি বললেন, সামনে থেকে বাধা না পেলে তবেই না ওরা ডাইনে, বাঁয়ে আর পিছন ফিরে তাকাবার কথা ভাববে না। বাধা সব সময়ই যোগায় বিপরীত বুদ্ধি আর উদ্দীপনা। যা সব সময় কল্যাণকর হয় না।

অতনু বলল, শ্রীমতীও ঠিক এই কথাই বলেছিল। তার মতে ওরা যা দাবী করে তা দেবার যদি যথার্থ শক্তি নাও থাকে তবু দেব না এ কথা বলো না।

আমি জবাবে বলি, আমার বক্তব্যটাও তাই। কিন্তু কথার মধ্যে আমি কোথাও ফাঁকি রাখতে চাই না, স্পষ্ট করেই বলতে চাই যে, শুধু বর্ত্তমান নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে

পারে না—বর্ত্তমানের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কথাটাও ভাবতে হবে। কিন্তু এই কথাটাই কেউ বুঝতে চায় না।

মিত্রা বলল, কেমন করে বুঝবে বলুন অতনুবাবু। আপনাদের আর ওদেব জীবনধারণেব মান এর জন্য দায়ী। কিন্তু আমাব কথা থাক, আপনার স্ত্রী আর কি বলেন শুনি—

শ্রীমতী বলে, ওদের প্রয়োজন আছে এ কথা যদি স্বীকার কর তা হলে এতদিন ধরে যা তুলে নিয়েছ তার থেকে কিছু দিয়ে দাও। ওরাও বাঁচুক, তুমিও বাঁচ।

আমি বলেছিলাম, এর নাম কি বাঁচা? তার চেয়ে কারখানার দবজা বন্ধ কবে দিয়ে আলু পটলের ব্যবসা করব।

শ্রীমতী জবাব দিয়েছিল, ওটাও নাকি আমাব ছেলেমানুষের মত কথা হ'ল। দরজা বন্ধ কবায় যুক্তি নেই—ওতে সন্দেহকেই বাড়িয়ে তোলা হবে, তাব চেয়ে ওদের ডেকে বলা হোক এভাবে কোন প্রতিষ্ঠান বড হতে পারে না। ওদের এতদিনেব পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থা। একে রাখতেও ওরাই পারে, ভাঙতে হলেও ওরাই ভাঙুক

আমি জিজ্ঞেস কবেছিলাম, তারপর? কিন্তু শ্রীমতী এর পরে আর কোন জবাব দিতে পাবে নি। শুধু এড়িয়ে যাবার ছলে বলেছিল, এব আর তাবপর নেই

মিত্রা বলল, সব আরম্ভেরই শেষ আছে অতনুবাবু। আসলে সর্ব্বত্র আমাদের ঘটেছে নৈতিক অধঃপতন। কেউ কাউকে আজ আব বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তারবাবু বলেন, গান্ধীজীর নাম করে যাঁরা যত চীৎকাব করছেন তাঁরাই ওঁর পথ থেকে বেশী সরে গেছেন। তাই কেউ কারুর কথা শুনতে চাইছে না। আপনি আচরি ধর্ম্ম পবেরে শিখাও, নইলে অপরে শিখবে কেন? কিন্তু এসব আলোচনা থাক।

অতনু বলে, থাকবে কেন মিত্রা? অপবের কথা আমি জানি না, কিন্তু নিজে আমি সঙ্কল্প করেছি আবর্জ্জনা পরিষ্কার

করবার। আমার সীমানার মধ্যে যত জমেছে তা নিজে হাতে সাফ করে আবার নতুন করে আরম্ভ করব।

মিত্রা বলল, এটাও কি আপনার সেই পুরাতন বাড়ীতে নতুন করে বালির পলেস্তারা দেওয়া হবে না?

অতনু বলে, শ্রীমতী কিন্তু আশার কথা শুনিয়েছিল। তার মতে মানুষের মনটা শুধুমাত্র কয়েক বিঘা জমি নয়। বিশাল তার পরিধি। পুরান থাক না একপাশে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে। নতুন করে নতুনের জন্ম হ'ক সময়ের সঙ্গে সমতা রেখে। তাতে হয়ত পুরাতনও বাঁচবে, নতুনও এগোবার পথ পাবে। পুরাতন ছিল বলেই না নতুনের আবির্ভাব।

মিত্রা নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

অতনু একটু হেসে বলে, শ্রীমতীকে কোনদিনই আমল দিই নি, পরিহাস করে সব সময় হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া স্ত্রীর কাছ থেকে এই ধরনের উপদেশ শোনবার মত আমার মন তৈরী ছিল না। উপেক্ষা করে তাই উপহাস করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার এতদিনের চলার পথে কোথাও ফাটল ছিল, আজ সেই ফাটল হাঁ করে আমাকে গ্রাস করতে বসেছে। জান মিত্রা, জীবনে আমি অনেক জুয়া খেলেছি। খেলায় হার-জিত দুইই আছে। আর একবার না হয় নতুন পথে খেলা স্থুরু করে দেখি, নইলে, যে পরস্পর-বিরোধী চিন্তা আমাকে শত পাকে জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে মারবার চেষ্টা করছে তার হাত থেকে আমি বাঁচতে পারব না।

মিত্রা ধীরে ধীরে জবাব দিল, আপনার কাছে ত ধারাল অস্ত্রের অভাব নেই অতনুবাবু।

অতনু প্রশান্ত হেসে বলল, এতদিন সেই কথাই ভেবে এসেছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি তা পারি না। সে শক্তি আজ আর আমার নেই। হাত কেঁপে উঠবে। যে অস্ত্রে বন্ধন ছিন্ন করতে যাব তা আমাকেই শেষ পর্য্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করবে। বলতে পার মিত্রা কেন এমন হ'ল?

মিত্রা কোন জবাব দেয় না। তার চোখেমুখে খানিক স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে। অতনুর তা দৃষ্টি এড়ায় না। সে বলে, তুমি হাসছ—ভাবছ বোধ হয় এ আমার পরাজয়? কিন্তু তবুও আজ আমাকে তুমি ব্যথা দিতে পারবে না। দুঃখের চেয়ে আজ আমার আনন্দই হচ্ছে বেশী, ভারী হাল্কা লাগছে নিজেকে। কোথাও আজ আর গ্লানি নেই।

মিত্রা খোঁচা দেবার লোভ সংবরণ করতে পারল না। সে বলল, বড় চমৎকার আপনার মন ত?

অতনু রাগ করে না, কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বলে, সত্যিই তাই—বিচিত্র এব গতি আর প্রকৃতি। শ্রীমতী এখান থেকে চলে গেছে বলেই একটা দিক এমন করে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। নইলে হয়ত আরও সময় নিত।

মিত্রা খানিক চুপ করে কিছু ভেবে নিয়ে বলল, তা হলে রুদ্ধ দুয়ার আবার নিজের হাতেই খুলে দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাবেন বলুন?

অতনু প্রশান্ত দৃষ্টিতে খানিক মিত্রার মুখের পানে চেয়ে থেকে হাসিমুখে জবাব দিল, বন্ধ করতে গিয়েই না সর্ব্বপ্রথম বুঝতে পাবলাম অজ্ঞাতসারে আমার হাত দু'খানা কত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সেইজন্যেই এত গলাবাজী আর বিতর্কেব ঝড় তুলেছিলাম।

মিত্রা বলে, মনের দুর্ব্বলতা ঢাকবার জন্য বুঝি?

অতনু বলল, আজ আর অস্বীকার করতে পারব না মিত্রা। কিন্তু শ্রীমতী সম্বন্ধে আর আমি ভাবতে চাই না। আমি তোমার কথা ভেবেই শান্তি পাচ্ছি না।

মিত্রা সাগ্রহে অতনুর মুখের পানে তাকাল। বলল, আমাকে নিয়ে আবার কিসের চিন্তা অতনুবাবু। আমি ত নতুন করে আর কোন জট পাকাই নি।

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলে, ডাক্তারবাবু কোথায় গেছেন তুমি জান মিত্রা?

মিত্রা জবাব দেয়, জানি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

অতনু বলল, কেন গেছেন তাও জান নিশ্চয়?

মিত্রা বলল, না জানলেও আন্দাজ করতে পারি। তিনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন বলেই গেছেন।

অতনু বলল, সেইজন্যই আমাকে ভাবতে হচ্ছে।

মিত্রা অবাক্ হয়ে বলল, তাঁর বাড়ীতে তিনি আসবেন, এতে ভাববার কি আছে?

অতনু মৃদু গলায় বলল, আছে মিত্রা। আর ভাবনাটা আজ তোমার জন্যেই।

একটু হাসবার চেষ্টা করে মিত্রা বলল, আমার জন্য একটু কম করে ভাবলেই আমি বেশী খুশী হব অতনুবাবু। অনেক বড় লজ্জার হাত থেকে আমি বাঁচতে পারব।

অতনু চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে, আমি সবই বুঝি মিত্রা—

মিত্রা সহসা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এই কথা বলতে চান বুঝি?

অতনু ধীরে ধীরে জবাব দেয়, তাই মিত্রা—

মিত্রা পুনরায় গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, এ ভাবনাটাও আমার উপর ছেড়ে দিন অতনুবাবু। দেখবেন, কত সহজে আপনার সব সমস্যার মীমাংসা করে দেব।

অতনু প্রশ্ন করে, কোন্ পথ মিত্রা?

মিত্রা সহজভাবে জবাব দিল, যে পথে শ্রীমতী আসবেন সেই পথেই—

একটু হাসবার চেষ্টা করে অতনু বলল, শ্রীমতী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তাঁর রয়েছে আইনসম্মত অধিকার, কিন্তু তোমার ত কোন অধিকার নেই মিত্রা? তার পথে তোমার—

মিত্রা কিছুটা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এমনি ভাবে বলল, থামুন অতনুবাবু—তার পরেই আকস্মিক ভাবে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে দৃষ্টি মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছিল

অনন্ত উদার নীল আকাশ। নাকে এল বাগানের সদ্য-ফোটা রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধ। চোখের কোণে হয়ত অকারণেই খানিকটা জল এসে পড়েছে · অপরিসীম ঘৃণা আর প্রাণভরা প্রীতি। এক-দিনেব সত্য আর একদিন কি ভাবে মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।

মিত্রা নিজেকে নিজে শাসন করল।

ইতিমধ্যে কখন যে অতনু উঠে এসে মিত্রার পাশে দাঁড়িয়েছে তা সে টের পায় নি। সহসা তার আহ্বানে সে ঘুরে দাঁড়াল।

মিত্রার মুখের পানে চোখ পড়তেই অতনু বিস্মিত ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, তোমাব কি হ'ল মিত্রা? কোন অসম্মান কবেছি কি তোমায়?

মিত্রা হাসতে লাগল—চোখে যদিও জল ছিল তখনও। নিজেকে গোপন করবাব বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ পেল না। শান্তভাবে সে বলল, নিজের অবস্থার কথা ভেবে চোখে জল এসে পডেছিল অতনুবাবু। নইলে যাকে বাডীতে স্থান দিতে ভয় পান তাকেই অন্যভাবে সাহায্য কববার কথা মুখেও আনতে পারতেন না। আমার জন্য আপনাব এত বেশী চিন্তা কবাও যেমন অশোভন আপনাব কাছ থেকে কিছু হাত পেতে নেওযাও তেমনি অপমানকব—

বলেই মিত্রা চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতনু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইল। সাধাবণ ভাবে একটা প্রতিবাদ কববাব মত ভাষাও তার মুখে যোগাল না।

২৭

পিত্রালয়ে শ্রীমতী অনেকদিন হ'ল এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে নিজেও যেমন কারুব কোন খবরাখবর নেয় নি ও-তরফও তেমনি নীরব। ক্ষীরিয়া বাবকয়েক চুপি চুপি জিজ্ঞেস করতে এসে ধমক খেয়েছে। রাণী একেবারে বিস্ময়করভাবে থেমে গেছেন। শুধু বাবার সঙ্গেই যাহোক ছুটো মন খুলে কথা হয়—আর দাদার

সঙ্গে পুরানো দিনের মত ঝগড়াঝাটি। কিন্তু এ অবস্থাও বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

শ্রীমতী নিজেই ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে এনেছে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বড় একটা ঘবের বাইরে যেতে চায় না। দশজনার দশ রকমের প্রশ্নকে সে সযত্নে এড়িয়ে চলতে চায়।

প্রণব অনুযোগ দিয়ে বলেন, এভাবে চললে শেষ পর্য্যন্ত যে একটা শক্ত অসুখে পড়বি মা।

শ্রীমতী বলে, ভয় নেই বাবা—আমার অসুখ-বিসুখ হবে না।

প্রণব বলেন, না হলেই ভাল, কিন্তু ক্ষীরিয়াকে নিয়ে রোজ বিকেলে একটু ঘুবে আসতে দোষ কি? ওতে শরীরটাও ভাল থাকবে, মনটাও প্রফুল্ল হবে মা।

শ্রীমতী জবাবে বলে, এবাব থেকে যাব বাবা।

প্রণব খুশী হয়ে বলেন, তাই যেও—

বাবার কথা শ্রীমতী ঠেলতে পারে নি। বোজই ক্ষীবিয়াকে নিয়ে সে নদীর পাবে বেড়াতে যায়। দূবে ঘন বনানীব পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অতীতের দিনগুলি নতুন করে তার চোখে ধরা দেয়। একদিন ওবা তাকে তুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করত। বাঙ্ময় হয়ে উঠত গাছপালা, লতাপাতা। আজ কিন্তু শ্রীমতীব কাছে ওরা সব বোবা। শুধুই একরাশ মৃত স্মৃতি—মাধুয্য নেই। গাছকে শুধু গাছই মনে হয় আর পাতাকে নিছক পাতা।

ক্ষীরিয়া বলে, যাবে দিদি ঐ বনে? নিয়ে আসব তীর আর ধনুক?

শ্রীমতী অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়, নিয়ে আয়—

ক্ষীবিয়া চলে যায়। কাছেই তার ঘর।

শ্রীমতী চুপ কবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পায় পায় এগিয়ে চলে। কোন কিছুতেই সে আর তেমন উৎসাহ পায় না। মন এবং দেহেব উপর একটা অপরিসীম ক্লান্তি নেমে এসেছে। এর কাবণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে হতাশ হয়। তার বিবাহিত

জীবনের মধ্যে অতনুর কাছ থেকে এমন কিছুই সে পায় নি যার জন্যে পিছন ফিরে তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হবে। তবু সে অতনুকে তার চিন্তার বাইরে সরিয়ে রাখতে পারে না। তার গর্ভের সন্তান বাবে বাবে ঐদিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে। শ্রীমতী অবাক্ হয়ে যায়। মুখে কেমন এক প্রকারের বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। তার জীবনে এটা একটা চবম পবিহাস—একটা প্রকাণ্ড দুর্ঘটনা।

ক্ষীরিয়া ফিরে এসেছে। শ্রীমতী তাকে আসতে দেখে দাঁড়াল। কাছে আসতে বলল, বেশী দূরে কিন্তু যাব না ক্ষীরিয়া।

ক্ষীবিয়া মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। কথা বলে না। এমন অদ্ভুত কথাব কি জবাব সে দেবে।

দু'জনাই ধীবে ধীবে এগিয়ে চলল। কারুর মুখে কথা নেই। এক সময় ক্ষীবিয়াই এই নীববতা ভঙ্গ করে কথা কয়ে উঠল, তোমাব মন ভাল নেই দিদি। চল, ঘরে ফিরে যাই। ফিবে যাবার প্রস্তাবেও শ্রীমতীব কোন আপত্তি নেই। সে মৃদুকণ্ঠে বলল, তাই ববং চল ক্ষীরিয়া।

ক্ষীরিয়াব মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। জামাইবাবুব জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?

শ্রীমতী অন্য কথা বলে, আমি চলে যাবার পর আব একদিনও বোধ হয় তীর-ধনুক ব্যবহাব করিস নি ক্ষীরিয়া?

ক্ষীরিয়া জবাব দিল, না। তোমার জন্য তুলে বেখেছিলাম। আজ নদীর জলে ফেলে দিয়ে যাব।

শ্রীমতী আশ্চর্য্য হয়ে যায়। নরম গলায় বলে, হঠাৎ ফেলে দিতে যাবি কেন?

ক্ষীরিয়া ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দেয়, রেখে দেব আর কাব জন্যে?

ওর রাগ দেখে শ্রীমতী একটুখানি হাসল। বলল, তুই শুধু শুধু বাগ কবছিস ক্ষীরি। আমি কেমন করে এ অবস্থায় যাই বল দেখি—

ঝারিয়া বিস্মিতভাবে খানিক চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কি সরম দিদি—আমাব মনেই ছিল না তুমি যে পোয়াতী।

শ্রীমতী একটু হাসল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ওরা ফিবে এসেছে। বাড়ীতে এসে প্রথমেই শ্রীমতী তাব বাবার কাছে উপস্থিত হ'ল। তিনি যেন অপেক্ষা করে আছেন এমনি ভাবে আহ্বান জানালেন, আয় মা। আজ বুঝি নদীর পারে গিয়েছিলি?

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে শ্রীমতী জবাব দিল, হ্যাঁ বাবা।

প্রণব খুশী হয়ে বললেন, বেশ করেছ মা। সাধ্যমত কাজের মধ্যে থেকো। মনও ভাল থাকবে শবীবও সুস্থ থাকবে।

শ্রীমতী খানিক চুপ করে থেকে একটু ইতস্ততঃ কবে বলল, কথাটা আমিও ভেবেছি বাবা। তুমি যদি রাগ না কব তবে বলতে পারি।

প্রণব স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

শ্রীমতী বলল, তোমাব অনুমতি পেলে আমি একটা কাজে হাত দিতাম। প্রফেসার কাকাব সঙ্গেও এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। এখন তুমি বললেই এগুতে ভরসা পাই বাবা।

প্রণব হেসে বললেন, কিন্তু আসল কথাটাই যে এখনও জানতে পারলাম না মা?

শ্রীমতী বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলল, তোমাদেব মেয়ে-স্কুলে একটা চাকরি নেব ভেবেছিলাম বাবা।

প্রণব সহসা সোজা হয়ে বসে খানিক কন্যাব মুখের পানে চেয়ে থেকে একটু হেসে বললেন, তোমার প্রফেসাব কাকা বুঝি তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছেন মা?

না বাবা, শ্রীমতী জবাব দেয়, তিনি বলবেন কেন—আমারই সময় কাটতে চাইছে না। তা ছাড়া আমি কি কিছুই বুঝি না?

প্রণব বললেন, হঠাৎ বোঝাবুঝির কথা বলছ কেন মা?

একটু ইতস্ততঃ করে শ্রীমতী বলল, আমি এখানে চলে আসবার ফলে তোমাকে আর একটা নতুন টুইসানি নিতে হয়েছে বাবা। অথচ আমার ও-বাড়ী থেকে নিয়ে আসা টাকা তুমি ছোঁবে না।

প্রণব একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, সে টাকা যদি না ছুঁতে পেরে থাকি তা হলে তোমাব রোজগারেব টাকা যে নিতে পারব তা তোমায় কে বললে শ্রীমতী? টুইসানি তুমি না এলেও নিতে হ'ত। তা ছাড়া আজ তোমার বিয়ে হয়ে গেছে বলেই ত এ কথা ভাবতে পারছ মা।

শ্রীমতী কথাটা স্বীকার করে নিয়েই বলল, তোমার অনুমান সত্যি বাবা।

প্রণব বললেন, তোমার যদি বিয়ে না হ'ত?

শ্রীমতী জবাব দিল, তা হলে হয়ত এ চিন্তা মনেই আসত না।

প্রণব সহসা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, কেউ তোমাকে কিছু বলছে কি শ্রী?

শ্রীমতী সবেগে মাথা নেড়ে বলল, তুমি অকাবণে সন্দেহ কবছ। এসব আমার নিজের কথা। তা ছাড়া আজকের দিনে মেয়েদেরও এই পথে চিন্তা করবাব সময় এসেছে বাবা।

প্রণব বললেন, তোমার এ কথা আমিও স্বীকাব করি। আমার কাছে অরুণ আব শ্রীমতীব মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু এ যুক্তি তোমার বিয়েব আগে চললেও বিয়ের পবে চলতে পারে না! চলা উচিত না। সেইজন্যেই তোমায় বাধা না দিয়ে আমার উপায় নেই।

একটা জবাব দেবার জন্যই শ্রীমতী মুখ তুলেছিল—সহসা দাদার চেঁচামেচিতে তাকে থামতে হ'ল। বলল, অত চীৎকার করছ কেন—আমি বাবার কাছে আছি।

অরুণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। রাণীও ছেলেব পিছু পিছু ঘরে প্রবেশ করেছেন। শ্রীমতীর হাতে একখানি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে সে সরে পড়ল। ছেলের সঙ্গে সঙ্গেই মাও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রণবের সম্মুখেই শ্রীমতী চিঠিখানি খুলে পড়তে শুরু করল। লিখেছেন ডাক্তারবাবু।

শ্রীমা—

তুমি কোথায় যেতে পার তা আমাকে জানিয়ে না গেলেও আমি জানি। আর জানি বলেই একটুও ব্যস্ত হই নি। তুমি ঠিকই করেছ। আমি হলেও এই কাজই করতাম। প্রতিবাদ না করে যারা অন্যায়কে মেনে নেয়, ধৈর্য্যের পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হলেও অন্যায়কে যে প্রশ্রয় দেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেক আগেই তোমাকে চিঠি দিতাম। দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাওয়ার গতি কোন্ দিকে ঘুরে যায় সেই দিকেই একাগ্রভাবে চেয়ে ছিলাম। তোমার চলে যাওয়া সকল দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে, এ কথাটা বুঝতে পেবে আব একটি মুহূর্ত্ত দেরি কবি নি। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। সন্ধ্যা হলেই মনটা কেমন উতলা হয়ে ওঠে। অতনুবাবুর কাবখানা আমাকে ধরে রেখেছে। ওর জন্যে নয় মা। ঐ কারখানাকে উপলক্ষ্য করে যারা তু'মুঠো খেতে পায় তাদেরই জন্য। বড় গোলমাল। একদিকে আড়াল থেকে ডানকান আব আগবওয়ালা চাকা ঘুরাচ্ছে আর কোথাকার কে এক শিলাদিত্য বিশ্বাস ভিতবে বসে ইন্ধন জোগাচ্ছেন—বুদ্ধি দিচ্ছেন। বন্ধুব ছদ্মবেশে ওদের যে কতবড় সর্ব্বনাশ তিনি করে চলেছেন এ কথা বুঝিয়ে বলবার একটা লোকও নেই। এ অবস্থায় কেমন কবে আমি দূরে সবে যাই বল দেখি?

তুমি এখান থেকে চলে যাবার দিনকয়েক পর থেকেই অতনু-বাবু কাবখানায় যাওয়া বন্ধ কবেছে। বন্ধ কবে ভালই করেছে। নইলে সহজটা জটিল হয়ে পড়ত। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে শিলাদিত্য একসঙ্গে প্রচুর কাঠ গুঁজে দিয়েছেন। প্রথমে ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় চতুর্দ্দিক ঢেকে ফেলেছিল। এখন ধোঁয়া নেই—আগুন জ্বলছে। কাঠগুলি সব পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে। ভবিষ্যতের জন্য কিছুই শিলাদিত্য মজুত রাখেন নি। আমি এই সুযোগের

অপেক্ষায়ই ছিলাম। হাতের কাছে আর কাঠ না পেয়ে নিজেকেই সে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। দুঃখ হয়, কিন্তু উপায় নেই।···

এইমাত্র খবর পেলাম, ছেলেটির আসল নাম শিলাদিত্য নয়—সূর্য্য বিশ্বাস। আর, একদিন নাকি সে তোমাদের পরিবারের একজন ছিল। তোমাব বাবার প্রিয় ছাত্র আর দাদার বন্ধু। তাই আমাকে থামতে হয়েছে। নতুন করে ভাবতে হচ্ছে কি করা যায়। শিলাদিত্যকে যেভাবে সরাতে চেয়েছিলাম সূর্য্যকে ত সেভাবে সরানো সম্ভব হবে না!

মনে হচ্ছে, এসব কথা তোমাকে না জানালেই বোধ হয় ভাল করতাম। দূরে বসে তুমি ত আমার কোন উপকার করতে পারবে না মা! তার চেয়ে বল দেখি কেমন আছ তুমি? আচ্ছা, এই বুড়োই না হয় নানা ঝঞ্ঝাটে তোমার খোঁজ করতে পারে নি, কিন্তু তুমিও ত একবার এ বুড়োকে স্মরণ করলে না মা।

এদিকের কথা নিয়ে তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের শরীরের উপর দৃষ্টি রেখো। বহুদিন তোমাকে দেখি নি। মন আমার ব্যাকুল হয়ে আছে। অনেক আগেই ছুটে যেতাম, কিন্তু তোমাদের সকলেব মঙ্গল চিন্তাই আমাকে থামিয়ে রেখেছে।

এখুনি একবার উঠতে হচ্ছে। মিত্রা এইমাত্র ফোন করে একবার দেখা করবার অনুরোধ জানিয়েছে। মেয়েটিকে যতই দেখছি বিস্ময় আমার উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবকথা একদিন তোমাকে মুখে বলব।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ আর মা বাবাকে নমস্কার জানিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

কাকাবাবু

চিঠিখানি পড়া শেষ করেও শ্রীমতী একই ভাবে বহুক্ষণ বসে রইল। ভাবছিল সে সূর্য্যদাব কথা। আর ভাবছিল মিত্রার কথা। সূর্য্যদা আজ শত্রুর ভূমিকায় আর মিত্রা মিত্রর ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়েছে। সূর্য্যদাকে সে বুঝতে পারে, কিন্তু মিত্রার এই রূপান্তর অবিশ্বাস্য।

যে মেয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে ছোবল দেবার জন্য—যার চোখে সে সাপের মত হিংস্র আর কুটিল চাহনি ছাড়া অন্যকিছু একদিনের জন্য দেখে নি, সেই মেয়ে রাতারাতি তার স্বভাব-ধর্ম্ম ত্যাগ করে বদলে যেতে পারে এ সে—

শ্রীমতী আপন অজ্ঞাতে কথা কয়ে উঠল, না এ হতেই পারে না।

প্রণব অনেকক্ষণ ধরেই শ্রীমতীকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বললেন, কি হতে পারে না শ্রী? চিঠিতে কোন খারাপ খবর নেই ত মা?

শ্রীমতী ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। একটু হাসবার চেষ্টা করে সে জবাব দিল, কাকাবাবু এখানে আসবেন লিখেছেন। তাই

প্রণব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তাঁর এখানে আসা কেন হতে পারে না শ্রীমতী?

বাবার প্রশ্নে শ্রীমতী লজ্জা পেল। বলল, সূর্য্যদা সম্বন্ধে কতগুলো কথা লিখেছেন কিনা—

প্রণব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কে—সূর্য্য গিয়ে আবার ওখানেও উৎপাত সুরু করেছে?

হ্যাঁ বাবা। শ্রীমতী জানাল, ওঁদের কারখানায় নাকি কি সব গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে।

তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে প্রণব পুনরায় বললেন, আমি নিজে সেখানে যাব। শয়তানকে জেলে পাঠিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।

তিনি চেয়ার ছেড়ে সহসা উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে পাশের ঘর থেকে অরুণ এবং তার মা ছুটে এলেন।

শ্রীমতী তার বাবার একান্তে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে বাবা! যেতে যদি হয় অবশ্যই যাবে, কিন্তু তার আগে সব কথা ভালভাবে জেনে নেবে ত? আমি বরং কাকা-বাবুকে এখানে আসবার জন্য লিখে দিচ্ছি। তাঁর মুখে সব শুনে তারপরে যেতে হয় যেও। আগে থেকেই—

তাকে বাধা দিয়ে প্রণব বললেন, সব কথা তুই আজও জানিস নে বলেই নইলে হতভাগা একটা কালসাপ। আমি আদর করে দুধ-কলা দিয়ে পুষেছিলাম। তারই প্রতিদান দিচ্ছে।

শ্রীমতী সহসা কঠিন কণ্ঠে বলল, জানব না কেন বাবা? সাপের যা স্বভাব সেইভাবেই সে চলবে—আর আমরা মানুষের মতই বাধা দেব। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ব্যবস্থা কাকাবাবুই করবেন। আমি বরং তাঁকে এখানে আসবার কথাই লিখে দিই।

খানিক চুপ করে থেকে প্রণব বললেন, তাই দাও শ্রীমতী—চিঠি পেয়েই যেন তিনি চলে আসেন।

২৮

ঘরে মিত্রা আর বাইরে সূর্য্য। চিঠি লিখতে বসে নতুন করে কথাটা শ্রীমতীর মনে হ'ল। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে মেয়েটা যে কেমন করে হাত করল এ রহস্য তার কাছে অজ্ঞাত। তিনি অতনু নন। তাঁর বয়েস হয়েছে। চতুর্দ্দিকে প্রখর দৃষ্টি তাঁর। তা ছাড়া কেষ্ট সর্ব্বদা মেয়েটাকে পাহারা দিচ্ছে। এসব তার নিজের চোখে দেখা।

শ্রীমতী আশ্চর্য্য হ'ল তার চিন্তাধারাকে এই পথে পাক খেতে দেখে। যে ঘরকে সে ছেড়ে এসেছে তারই প্রতি এই অকারণ মমতা কেন! কেন সে আজ এতখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী জোর করে এই চিন্তার আবর্ত্ত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখতে সুরু করল।

কাকাবাবু—

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। এই চিঠি অনেক আগেই পাবার আশা নিয়ে আমি রোজ পথের পানে চেয়ে থাকতাম। ভেবেছিলাম আপনি আমাকে কিছুতেই ভুল বুঝবেন না। আমার চলে আসার কৈফিয়ৎ হিসেবে এ কথা লিখছি না। আজ বড় আনন্দ হ'ল যে, আমার সে ধারণা মিথ্যে হয় নি। আপনি আমাকে ভুল বোঝেন নি।

শুনে দুঃখিত হলাম যে, চতুর্দ্দিকের গোলমালের সব ঝক্কি একলা আপনাকেই পোহাতে হচ্ছে। কিন্তু এত লোক থাকতে কেন যে আপনি এইসব মিথ্যা ঝামেলা পোহাচ্ছেন এর কোন সত্য কারণ খুঁজে পেলাম না। কিসের জন্য আপনি নিজেকে এ ভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। এর কি যথার্থ কোন প্রয়োজন আছে কাকা-বাবু? তা ছাড়া যাঁর জন্যে আপনি এত ভাবছেন তিনি ত আপনাকে চান না। তবুও কেন এই মিথ্যে বোঝা আপনাকে বইতে হবে?

সূর্য্যদা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আমি গোটাকয়েক কথা বলা একান্ত আবশ্যক মনে করছি। তাঁর সম্বন্ধে আপনি কতটুকু জানতে পেরেছেন লেখেন নি, কিন্তু আমি যতটুকু জানি শুনুন। এক সময় তিনি বাবার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। দাদার অকৃত্রিম বন্ধু বলেও জানতাম। আমি নিজেও তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আমার বিয়ের পরে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা করা ত দূরের কথা তাঁর সঙ্গে এক সময় আমাদের পরিচয় ছিল এ কথা স্বীকার করতেও লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়।

তখন দেশ বিভক্ত হয় নি। আমাদের প্রজা হরি বিশ্বাসের ছেলে সূর্য্য বিশ্বাসকে বাবা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন লেখাপড়া শেখাবার জন্য। লেখাপড়ায় ওঁর আগ্রহ দেখে, আর হরি বিশ্বাসের একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাবা তাকে নিয়ে এসেছিলেন। লেখাপড়া শিখলেও তিনি মানুষ হলেন না। আমার বিয়ের

পরেই তাঁর শিক্ষার মুখোস খসে পড়ল। তারপরে যে পথে তিনি চলতে সুরু করলেন তাকে প্রত্যেক শিক্ষিত আর সভ্য মানুষই বিপথ বলে থাকেন।

সংক্ষেপে এই হ'ল সূর্য্য বিশ্বাসের কাহিনী। এর পরেও যদি তাকে এই পরিবারের একজন বলতে চান তা হলে আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে আমি বাবার হয়ে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, শিলাদিত্যের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সূর্য্য বিশ্বাসের বেলায়ও তার কিছুমাত্র তারতম্য করা হলে আমরা দুঃখিত হব। আর সেই সঙ্গে আপনার কথাটাই আর একবার বলব—অন্যায়কে যাঁরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন তাঁরা অন্যায়-কারীকেই প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। আমার একান্ত অনুরোধ আপনার নিজের কথার অন্যথা যেন আপনি নিজেই করবেন না।

আপনি চলে আসুন কাকাবাবু। আমার নিজের ইচ্ছেমত দু'দিন আপনাকে সেবা করবার সুযোগ আমাকে দিন।

সূর্য্য বিশ্বাসের কথা আমি বাবাকে বলেছি। তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি নিজেই ওখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমি বাধা দিয়েছি। এতে কোন লাভ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। বরং দুষ্টকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দেওয়া হবে।

ওখানকার কথা মনে হলেই সবার আগে আপনার কথা মনে হয় কাকাবাবু। ঐ আকর্ষণহীন প্রাসাদে আপনাকে না পেলে আমি হয়ত দম বন্ধ হয়ে মারা যেতাম।

আমার জন্য ভাববেন না। আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। ইতি—

স্নেহধন্যা

শ্রীমতী

চিঠিখানি সেই রাত্রেই শ্রীমতী পোষ্ট অপিসে পাঠিয়ে দিল।

চিঠি পেয়ে আর দেরি করেন নি ডাক্তারবাবু। তুফান এক্সপ্রেস তাঁকে সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে দিয়ে গেল। খবর দিয়ে আসেন নি তিনি। কিন্তু প্রণব মাষ্টারের বাড়ী খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয় নি।

শ্রীমতী সেইমাত্র ক্ষীরিয়ার সঙ্গে ফিরে এসেছে। ইদানীং রোজই সে ওর সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে যায়। বাড়ীর প্রাঙ্গণে সর্ব্বপ্রথম শ্রীমতীর সঙ্গেই ডাক্তারবাবুর দেখা হ'ল। হেসে পায়ের ধূলা নিতেই তিনি মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন, চেহারাটা ত তোমার ভাল দেখাচ্ছে না মা?

শ্রীমতী একটুখানি হাসল, কোন জবাব দিল না।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন, হাসির কথা নয় মা। ডাক্তারের চোখকে তুমি অত সহজে ফাঁকি দিতে পারবে না। নিশ্চয় শরীরের উপর যত্ন নিচ্ছ না। এটা ভাল কথা নয়—

শ্রীমতী স্মিত হেসে বলল, আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন সব ঠিক হয়ে যাবে কাকাবাবু। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর একটি কথাও আপনার শোনা হবে না। সারাদিন আপনার গাড়ীতে কেটেছে। ঘরে চলুন। খানিক বিশ্রাম করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে যতখুশী কথা কইবেন আমি না করব না।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে হাসলেন।

ইতিমধ্যে বাবা এবং তাঁর পিছু পিছু মা এসে উপস্থিত হয়েছেন। মা মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রণব কতকটা যেন হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখে একটা সাধারণ ভদ্রতাসূচক কথাও যোগাল না। বাবার এই বিভ্রান্ত ভাব লক্ষ্য করে শ্রীমতী রীতিমত বিস্মিত হলেও সে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে একটু হেসে বলল, ইনিই ডাক্তারবাবু—আমার কাকাবাবু, বাবা।

প্রণব এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন। ডাক্তারবাবুর মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি এগিয়ে এসে প্রণবের একখানি হাত ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, এতদিনের দীর্ঘ অদর্শন আর একমুখ দাড়ি একমাত্র তোমাকেই দেখছি ঠকাতে পারে নি নব।

প্রণব হা-হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, কি মুস্কিল—তুমি নালু মুন্সীই হলে আমাব শ্রীব কাকাবাবু! তুমি তা হলে আজও—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে তিনি বললেন, বেচে আছি হে নব—আজও বেঁচে আছি। কিন্তু আমাদের এখন থামতে হচ্ছে। দেখছ না, তোমার মেয়েটা কেমন কবে তাকাচ্ছে! ওকে আমি চটাতে চাই না ভাই।

প্রণব কন্যার মুখের পানে সস্নেহে চেয়ে দেখে বললেন, তোমার কাকাবাবুকে নিয়ে আমার ঘরে যাও মা। আমি এলাম বলে। তিনি আপন মনে বিড়বিড় কবতে কবতে স্ত্রীব উদ্দেশে চলে গেলেন।

ডাক্তারবাবু একটি বেতের আরাম কেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন। শ্রীমতী পাখা হাতে তাঁকে বাতাস কবছে।

শ্রীমতীই প্রথমে কথা কইল, খবর দিয়ে এলেন না কেন কাকাবাবু? আপনাব মনের মত দু'চারটে খাবাব তৈরী করে বাখতাম।

ডাক্তাববাবু চোখ বুজেই জবাব দিলেন, সেইজন্যেই খবর দিয়ে আসি নি, আগে মা-ব্যাটাব মধ্যে বোঝাপড়া তারপর খাওয়া।

শ্রীমতী স্নিগ্ধ হেসে বলল, ঝগড়া কোথায় যে বোঝাপড়ার কথা বলছেন, কাকাবাবু?

প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে ডাক্তারবাবু বললেন, কথাটা মনে থাকে যেন।

শ্রীমতীও হেসে জবাব দিল, ভুলে গেলে মনে করিয়ে দেবেন, কাকাবাবু। ঐ যে, বাবা আসছেন। আবার যেন গল্পে মেতে উঠবেন না। আমি এখুনি আপনার মুখ-হাত-পা ধোবার জলের ব্যবস্থা করে আসছি।

শ্রীমতী দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শ্রীমতী চলে যেতে ডাক্তারবাবু প্রণবকে উদ্দেশ করে বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও নব। তোমার মেয়েটা ফিরে আসবার আগেই দুটো গোপন কথা সেরে নি।

প্রণব দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, নালু মুন্সী যে মরে নি তা আজ জানলে তুমি আর জানেন তার অ্যাটর্নী। কথাটা আপাততঃ আর কাউকে জানতে দিও না।

প্রণব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, তুমি যে রহস্য-উপন্যাসকেও হার মানিয়ে দিলে হে নালু মুন্সী! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই!

ডাক্তারবাবু একটু হেসে জবাব দিলেন, এতদিন যখন না বুঝেও তোমাদের চলে গেছে তখন আর ক'টা দিন না বুঝলেও কোন ক্ষতি হবে না নব, কিন্তু দোহাই ভাই, তোমার ঐ উকিল মেয়েটাকে যেন কিছু ব'ল না। তাকে যা বলবার আমিই বলতে চাই। যাও, এবারে দরজাটা খুলে দাও।

তা দিচ্ছি। আর বলছ যখন তখন গিন্নীকেও সাবধান করে দিয়ে আসছি।

প্রণব দ্রুত চলে গেলেন। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে পুনরায় বললেন, তোমার আদেশ জানিয়ে এলাম।

দু'জনেই একসঙ্গে হাসতে থাকেন।

হাসি থামিয়ে প্রণব সহসা অন্য প্রসঙ্গে এলেন, সূর্য্য নাকি তোমাদের খুব বেগ দিচ্ছে?

ডাক্তারবাবু কথাটা তেমন গায়ে না মেখে উত্তর দিলেন, তা একটু দিচ্ছে কিন্তু, ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমরা মা-ব্যাটাতে সহজেই তাকে সায়েস্তা করতে পারব।

ডাক্তারবাবু ভুলেও শ্রীমতীর চলে আসা নিয়ে কোন কথা বললেন না। প্রণবও তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না।

শ্রীমতী পুনরায় ফিরে এসেছে। ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, আমি প্রস্তুত মা।

এ কথার জবাব শ্রীমতী কথায় দিল না—দিল মধুর হেসে।

৩০

হাত-মুখ ধুয়ে কিছু জলযোগ সমাপ্ত করে ফিরে আসতে ডাক্তাববাবুব আধ ঘণ্টাও লাগে নি। তাঁর বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্রীমতী বলল, এবারে একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন, আমি আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে যাব।

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বললেন, এটা ত তোমার বাড়ী নয় মা। যাদের বাড়ী এসেছি ব্যবস্থাটা তাদের করতে দিয়ে তুমি বরং আমার কাছে বসে গল্প কর। তা ছাড়া তোমার কাছে খাওয়া ত আমার একটি রাত্রেই ফুরিয়ে যাবে না, মা।

শ্রীমতী ছেলেমানুষের মত জবাব দিল, ফুরিয়ে যেতে আমি দিলে ত।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে বললেন, কথাটা সময়মত ভুলে যেও না কিন্তু।

ভুলব না কাকাবাবু। শ্রীমতী জবাব দিল।

ডাক্তারবাবু বললেন, শুনে খুশী হলাম। ভাল কথা, তোমার বাবা গেলেন কোথায়?

শ্রীমতী বলল, বোধ হয় বাজারেব দিকে গেছেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, ভালই হয়েছে। এই সুযোগে আমার বক্তব্যটা শেষ করে ফেলি। সময় আমার হাতে অত্যন্ত কম মা। মাত্র একটি দিন। এরই মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্য স্থির করে নিতে হবে।

শ্রীমতীর মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল কথাটা সে ঠিক বুঝতে পারে নি। ডাক্তারবাবুরও তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি পুনরায়

বললেন, সূর্য্য বিশ্বাসকে নিয়ে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়েছি—কোথা দিয়ে আবার নতুন করে কি জট পাকিয়ে বসবে তার ঠিক নেই—নইলে দু'-চারদিন থেকে যেতে আমার আপত্তি ছিল না।

শ্রীমতী গম্ভীর কণ্ঠে বলল, একটা অতি সাধারণ লোককে আপনারা বড় বেশী মূল্য দিচ্ছেন কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তোমার কথাটা ঠিক হ'ল না মা। শত্রুকে ছোট করে ভাবতে নেই তাতে শেষ পর্য্যন্ত ঠকতে হয়।

শ্রীমতী কতকটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কিন্তু এই ঠকা-জেতায় আপনার ত কোন লাভ-লোকসান নেই কাকাবাবু!

ডাক্তারবাবু স্মিত হেসে বললেন, কি যে আছে আর কি যে নেই সে প্রশ্ন থাক। তা ছাড়া জান ত মা, ভাগ্যবানের বোঝা সবসময় দুর্ভাগারাই বয়ে থাকে। কি কুক্ষণেই যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

শ্রীমতী অভিমানভরা কণ্ঠে বলল, আপনার কথা শুনে দুঃখ পেলাম। কিন্তু ভাগ্যবান আপনি কাকে বলছেন?

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, যদি বলি তোমাকে, আর তোমার জন্যই আমার সব দুর্ভাবনা?

শ্রীমতী বলল, তা হলে আমাব জন্য দুর্ভাবনা করতে নিষেধ করব।

ডাক্তারবাবু তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বললেন, অবশ্য সবটাই যে ঠিক তোমার জন্য এ কথাও বলা চলে না। আংশিক সত্য বললেই ঠিক হবে।

শ্রীমতী ধীরে ধীবে বলতে থাকে, ওদের ভাল-মন্দর বাইরে চলে এসেও কি আমার সম্বন্ধে দুর্ভাবনা থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারি নি কাকাবাবু?

ডাক্তারবাবু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দেন, একবিন্দুও না, শ্রীমতী। বরং আমার দুর্ভাবনা বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া মুক্তি যে আমি নিজেই চাই না মা। কিন্তু তোমার রাগ দেখছি আজও ষোল আনাই আছে।

শ্রীমতী মাথা নেড়ে অস্বীকার করে বলল, না কাকাবাবু এটা রাগ-অভিমানের কথা নয়।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা হলে একে আমি কি বলব মা?

আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠল। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, সে-সব কথা আপনার না শোনাই ভাল।

ডাক্তারবাবুর মধ্যে কিন্তু এতটুকু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তিনি তেমনি হাসিমুখেই বললেন, কথাটা কিন্তু আমাকে শুনতেই হবে। অবশ্য তুমি যদি অধিকারের প্রশ্ন না তোল।

শ্রীমতী অনেকখানি দমে গেল। সে আর্ত্তকণ্ঠে বলল, আপনি এভাবে আমাকে বলতে বাধ্য করবেন না কাকাবাবু—

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। বললেন, তোমার অনিচ্ছা থাকলে আমি আর জোব করব না মা। তবে তোমার কাকাবাবুকে যদি সত্যিসত্যিই তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনে কর তা হলে সবকথা তাঁকে অকপটে বলতে পার।

শ্রীমতীর দু'চোখ ছলছলিয়ে উঠল। ডাক্তারবাবুর তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েছেন মনে হ'ল। কথা না বলে অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্রীমতী বলল, সব কথা জানেন না বলেই—

তাকে বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, জানলে পরে তোমাকে প্রশ্ন করব কেন মা? ভুল কিছু জেনেছি কিনা সেইজন্যেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম। তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য নয়।

সহসা খানিকটা উত্তেজিত হয়ে শ্রীমতী বলতে সুরু করল, রাত বারোটায় মিত্রাব ঘর থেকে বার হয়ে আসতে দেখেও আমি তেমন গুরুত্ব দিতাম না যদি···শ্রীমতী কথাটা শেষ না করেই থামল।

ডাক্তারবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন, ভাল বুঝলাম না মা।

শ্রীমতী পুনরায় বলতে লাগল, একটি মেয়ের ঘর থেকে বেশী

রাত্রে বার হয়ে আসার কারণ শুধু একটা ছাড়া অন্য কিছুও থাকতে পারে। এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু সেটা তখনই সন্দেহজনক বলে মানুষ মনে করে যখন সেইটেকেই উপলক্ষ্য করে আর পাঁচটা জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। কাকাবাবু, এতবড় অপমানকেও হয়ত আমি মুখ বুঁজে সহ্য করে যেতাম, যদি তা শুধু আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। আমাকে মাপ করুন এর বেশী আর একটা কথাও আমি বলতে পারব না। আমি মুক্তি চাই।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে শ্রীমতীকে কাছে আকর্ষণ করে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দেখছি, মিত্রা আমাকে একবর্ণ মিথ্যা বলে নি, তোমার সম্বন্ধেও বলে নি—তার নিজের সম্বন্ধেও বলে নি।

শ্রীমতী কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, এর পরে কোন প্রসঙ্গ এসে পড়তে পারে এই ভয়ে। কিন্তু ডাক্তারবাবু নিজের কথা মোটেই তুললেন না। শ্রীমতী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, আমাদের চারিদিকে একটা বিষাক্ত হাওয়া বইছে, তা আমি জানি মা। কিন্তু বিষের ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে মুখোস এঁটে এগিয়ে গিয়ে সেই বিষের উৎসকে ধ্বংস করে ফেলাই কি আমাদের উচিত নয় শ্রীমতী ?

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলল, মিত্রা বিষাক্ত সাপ—

বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বলেন, সাপ কিন্তু মানুষ নয় মা, এ দুইয়ে অনেক প্রভেদ।

শ্রীমতী ক্লান্তকণ্ঠে বলল, আমি তর্ক করতে চাই না কাকাবাবু। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু তাতে দুঃখটাই আরও বেড়েছে।

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, তুমি কিন্তু দুঃখটাকেই প্রকারান্তরে লালন করতে চাইছ। শোন মা, যে অবস্থার মধ্যে পড়ে তুমি চলে এসেছ তা আমার অজানা নয় এবং এই চলে আসার সেদিনে যেমন প্রয়োজন ছিল আজ আবার তোমার ফিরে যাবারও তেমনি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

একটু থেমে খানিক কি চিন্তা করে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, মাত্র কয়েক মাস বয়েসের সময় অতনু তার মাকে হারিয়েছে। মানুষ হয়েছে সে পুরুষের কাছে এক ভিন্ন পরিবেশে। ওর প্রকৃতির মধ্যে হয়ত সেইজন্যই কোমলতার এত বেশী অভাব। তার উপর ওর বাপ এবং ঠাকুরদার মতবিরোধকে উপলক্ষ্য করে বাপের স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হ'ল।

শ্রীমতী একটু হেসে বলল, পুরুষ মানুষের কাছে এমন বহু ছেলেই মানুষ হয়ে থাকে কাকাবাবু। তাই বলে তাকে—

কথাটা তাকে সমাপ্ত করতে না দিয়ে ডাক্তারবাবু পুনশ্চ বলতে থাকেন, তুমি যা বলবে তা আমি জানি মা, কিন্তু অতনুব ঠাকুরদা তাকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা ওকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা না করে বরং একজন আত্মসর্ব্বস্ব মানুষ করেই গড়ে তুলেছিল। তাই স্ত্রী হয়েও তুমি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছ। ডানকান-আগরওয়ালার মত লোকও তাব বিশ্বস্ত বন্ধু হতে পেরেছিল একদিন, আর মিত্রা তার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করবার সুযোগ পেয়েছিল।

শ্রীমতী এতক্ষণে একটুখানি হেসে জবাব দিল, অথচ সেই মিত্রাই এই অল্প সময়ের মধ্যে বদলে গেছে, এই কথাটা আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে বলছেন?

ডাক্তারবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তাই বলছি মা। মিত্রার যে চোখে আমি একদিন আগুন জ্বলতে দেখে ভয় পেয়েছিলাম সে দৃষ্টি আজ আর তার নেই। এখন তা স্নেহ আর মমতায় টলমল করছে।

শ্রীমতীর মুখে একটু বাঁকা হাসি দেখা দিল। সে নীরস কণ্ঠে বলল, এই সুলক্ষণ দেখে আপনি খুশী হতে পারলেও আমি পারছি না কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বললেন, অবস্থাটা আমি হয়ত তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারি নি মা। কিন্তু আমার অক্ষমতার জন্য তুমি আর একজনার উপর অবিচার ক'র না।

ডাক্তারবাবুর কথার ধরনে শ্রীমতী না হেসে থাকতে পারল না। সে বলল, আমাকে একটা সত্য কথা বলবেন কাকাবাবু—

তোমার কাকাবাবু এতক্ষণ ধরে তোমাকে মিথ্যে বলেছে, এইটেই কি শেষ পর্য্যন্ত তুমি বলতে চাও শ্রীমতী? ডাক্তারবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন।

শ্রীমতী লজ্জিত হয়ে বলল, ছি কাকাবাবু! আপনি আমাকে কি মনে করেন? আমি শুধু বলতে চাই যে, কিসের জন্য এই পরিবারের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দব সঙ্গে আপনি নিজেকে এভাবে জড়িয়ে ফেলছেন? যাক না সে উচ্ছন্নে—ডুবে যাক তার কারখানা। আপনার কিসের দায়—কিসের দায়িত্ব।

ডাক্তারবাবু সহসা হা-হা করে হেসে উঠলেন।

শ্রীমতী বলল, হয়ত হাসিব কথাই বলেছি, তাই হাসছেন। আমারও মাঝে মাঝে কেমন একটা সন্দেহ হয়। সম্ভবতঃ আপনার কিছুই না জেনে আমরা নানা কথা বলে থাকি। কোথায় যেন একটা গভীর রহস্য বয়ে গেছে যেখানে আজও পৌঁছতে পারি নি।

ডাক্তাববাবু আব একবাব হেসে উঠে বললেন, রহস্য মনে করলেই রহস্য, নইলে জলেব মত সোজা। দুই আর দুই চারের মত।

শ্রীমতী মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু আমি যোগ করতে বসলেই যোগফলটা অনেক বড় হয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু রহস্য ক্'বে জবাব দিলেন, ওটা অঙ্ক না জানার ফল। কিন্তু এতক্ষণ এত কথার মধ্যেও আমার আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি মা। মুখ্যতঃ তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যই আমি এসেছি। আর আগামী পরশুই আমি যেতে চাই।

শ্রীমতী অবিচলিত কণ্ঠে বলল, আমার কিন্তু যাওয়া হবে না কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু একটু যেন উত্তেজিত হয়েই জবাব দিলেন, হবে না মানে? একশ' বার হবে। তোমার কোন ওজর-আপত্তি আমি শুনব না।

শ্রীমতী হেসে ফেলে বলল, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনি শ্রীমতীর কাকাবাবু হলেও ও-বাড়ীর কেউ নন। তা ছাড়া আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমাকে ও বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে না।

ডাক্তারবাবু হতাশ হয়ে বললেন, তুমি বড় তর্ক করতে ভালবাস শ্রীমতী। এই কথাই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস কবতে বল যে, তুমি তোমার স্বামীকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে ?

শ্রীমতী চুপ করে থাকে।

ডাক্তারবাবু বলেন, কিন্তু আজ বাদে কাল যখন তোমার কোলে সন্তান আসবে তাকে তুমি কিসের জোরে ধরে রাখবে—

শ্রীমতী একটুখানি ইতস্ততঃ করে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল, দরকার হলে ফিরিয়ে দিতে হবে কাকাবাবু। জোর করে ধরে রাখতে যাব না।

ডাক্তারবাবু বার বার মাথা নেড়ে স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন, তখন কি পাববে মা ?

শ্রীমতী ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, পাববার চেষ্টা করব কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেও প্রকাশ্যে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, মনে মনে তুমি যখন স্থির করে ফেলেছ, তখন আর জোর করে কি করব মা, কিন্তু তোমার কাকাবাবু যদি তাঁর নিজের বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যেতে চায় তা হলেও কি তুমি আপত্তি করবে ?

শ্রীমতী হাসিমুখে জবাব দিল, না—

খুশী হলাম। ডাক্তারবাবু স্মিত হেসে বললেন, তা হলে আমার ভাঙা ঘরেই চল। মা লক্ষ্মীর পায়ের ছোঁয়া লেগে আমার ভাঙা ঘরই হয়ত একদিন রাজপ্রাসাদ হয়ে উঠবে। তবে একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না মা। একজন সাধারণ স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে যে কোন মেয়েই পারে। ওতে কোন কৃতিত্ব নেই। অতনুবাবু সাধারণ নয় স্বীকার করি, কিন্তু বার আনা

এগিয়ে গিয়েও তুমি যে কেন না বুঝে পিছু হঠতে সুরু করলে এইটেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

শ্রীমতী মৃত্যুকণ্ঠে বলল, পিছু যখন একবার হটেছি তখন নতুন করে আবার সুরু করবার আমার ইচ্ছেও নেই, উৎসাহও নেই কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, বার আনা ত তোমার নামে জমা হয়ে আছে মা—বাকী শুধু চার আনা। আমার কথা যে কত সত্য তা আজ অতনুবাবুকে দেখলে তুমিও স্বীকার করবে।

একটা জবাব দেবাব জন্যই শ্রীমতী মুখ তুলেছিল। অকস্মাৎ প্রণব এসে উপস্থিত হতে তাকে থামতে হ'ল।

ডাক্তারবাবু প্রণবের কাছে নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে বললেন, একটি ঘণ্টা এই ঝগড়াটে মেয়েটার কাছে ফেলে রেখে কোন্ রাজ্য জয় করে এলে নব?

প্রণব তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, কি তুমি রাজ্য জয়ের কথা বলছ নালু মুন্সী? আমার আজকের আবিষ্কার কি তার চেয়ে কিছু কম। প্রথমতঃ, আমাব বাল্যবন্ধু, দ্বিতীয়তঃ কতবড় এক জমিদার, তৃতীয়তঃ সম্মানিত কুটুম—কত যুগ অজ্ঞাতবাসের পব আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ যে আমার কি আনন্দ সে তুমি বুঝবে না কল্যাণ মুন্সী—

প্রণব হুচোট খেয়ে থামলেন।

শ্রীমতী অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠল। তার চোখ দুটি বিস্ময়ে, আনন্দে যেন ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাইছে। মনে মনে সে বারকয়েক আবৃত্তি কবল, কল্যাণ মুন্সী···কল্যাণ মুন্সী···

সহসা শ্রীমতী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ডাক্তারবাবু উঠে এসে সস্নেহে তাকে কাছে টেনে নিলেন।

শ্রীমতী তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আর প্রণবের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে এক ঝলক স্বর্গীয় হাসি।

শ্রীমতীর মুখে হাসি চোখে জল। সে ভিজে গলায় বলল, এতদিন আপনি পরিচয় দেন নি কেন ?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, সে অনেক কথা, মা। কিন্তু একজন বাইরের লোককে যে সম্মান আর ভালবাসা তুমি দেখিয়েছ তাতেই তোমার আসল পরিচয় আমি পেয়েছি। তুমি যে আমার বুকের কতখানি ভরিয়ে রেখেছ তা শুধু জানি আমি আর আমাব অন্তর্যামী।

শ্রীমতী লজ্জিত হেসে বলল, একটু আগেও আপনাকে আমি কত শক্ত কথা বলেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা কববেন।

ডাক্তাববাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, কঠিন হলেও কথাগুলি সত্যি। সত্যকথা বলার জন্য ক্ষমা চাইতে হয় না, পাগল মেয়ে।

ছেলেমানুষের মত চঞ্চল কণ্ঠে শ্রীমতী বলল, আপনার কুঁড়েঘর সত্যিসত্যিই তা হলে বাজপ্রাসাদ হয়ে গেল! আমার কাছে কিন্তু আপনার কুঁড়েঘরও স্বর্গ মনে হ'ত শুধু আপনাকে সব সময় কাছে পেলে।

ডাক্তাববাবু নীরব।

শ্রীমতী বলতে থাকে, আর আপনাকে নিয়ে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই—কোন দিক দিয়ে কোন বাধাই আর পথ আটকে দাঁড়াতে পারবে না।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, বাধা পেলেই বা তা মানছে কে—

শ্রীমতী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, আমরা তা হলে পরশুই যাচ্ছি ত ?

ডাক্তারবাবু বলেন, যেতেই হবে মা। নইলে শেষ পর্য্যন্ত সবদিক সামলান যাবে না। সূর্য্যবাবু হয়ত নতুন করে জট পাকিয়ে তুলবেন। তার চেয়ে আমরা ফিরে গিয়ে দু'জনে মিলে আর একবার বুঝিয়ে বলে দেখি। যদি মেনে নেয়, ভাল—নইলে যা ঘটবার তাই ঘটবে—

শ্রীমতী বলল, আমার মতে যার যতটুকু প্রাপ্য তা পাওয়াই উচিত।

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, অনেক সময় লঘু পাপে গুরু দণ্ডও পেতে হয় মা। আমি শুধু সেই পথটাই বন্ধ করে দিতে চাই। তা সে যে কেউই হোক।

শ্রীমতী বলল, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আমি আর কতটুকু বুঝি—কথাটা শেষ না করেই সে খানিকটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে অন্য কথায় এল, কিন্তু আমি যে বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের মুস্কিল, মা—

শ্রীমতী ইতস্ততঃ করে বলল, আপনাকে ত আর কাকাবাবু বলে ডাকা উচিত হবে না—

আমার অপরাধ মা? ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করেন।

যতদিন জানতাম না সে এক কথা, শ্রীমতী বলল, কিন্তু জেনে-শুনে···কথাটা শেষ না করেই শ্রীমতী থামল।

ডাক্তারবাবু বললেন, লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিচ্ছ নাকি মা? কোথায় পরিচয় দিলাম বলে পুরস্কৃত করবে না যা নিজের ইচ্ছায় দিয়েছিলে সেটুকুও কেড়ে নিতে চাও?

শ্রীমতী লাজনম্র কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, এ বাড়ীতে আপনি কাকাবাবুই থাকুন ও-বাড়ীতে আপনাকে আমি বাবা বলেই ডাকব। শ্রীমতী মাথা নীচু করল।

ডাক্তারবাবুর চোখ দুটি সহসা বাষ্পাকুল হয়ে উঠল একটা অদ্ভুত সুখানুভূতিতে। তিনি শ্রীমতীর মাথায় হাত রেখে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, একেবারে কংক্রিটের দেওয়াল তুলে দিতে চাও মা।···

প্রণব নিঃশব্দে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। শ্রীমতী উঠে দাঁড়াল। প্রণব বলল, না হে কল্যাণ মুন্সী, অন্দরমহল তোমার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হতে পারছেন না। আর অন্দরমহলেরও

দোষ নেই। আমার কাছে তুমি নালু মুন্সী হলেও তিনি তাঁর এতবড় কুটুমকে এত সহজে ছাড়তে চাইবেন না, এ আমি জানতাম। মোট কথা পরশু তোমাদের যাওয়া নাকি হতেই পারে না।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে টিপে টিপে হাসতে থাকলেও শ্রীমতী চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, আমি মাকে বুঝিয়ে বললে তিনি আর বাধা দেবেন না। ওঁর পরশুদিন না গেলেই চলবে না বাবা।

ডাক্তারবাবু শ্রীমতীর কথায় সায় দিয়ে বললেন, শ্রীমা ঠিক কথাই বলেছে, নব। অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ যখন শেষ হয়েই গেল তখন মাঝে মাঝে আসব ভাই। এ যাত্রা তোমরা আমাকে রেহাই দাও।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে চলে গেল। দুই বাল্যবন্ধুর আলোচনার মধ্যে সে আর বেশীক্ষণ থাকা সঙ্গত মনে করল না।

শ্রীমতী প্রস্থান করতেই ডাক্তারবাবু অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হলেন, তোমার মেয়েটার খুব বুদ্ধি হে নব। আর বড় ভাল মেয়ে।

প্রণব কৃতার্থের হাসি হেসে চুপ করে রইলেন।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, এই মেয়েটার জন্যই আমায় সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হ'ল। আমার উপোসী মনটাকে শ্রীমতী আবার জাগিয়ে তুলেছে। ফাঁদে পড়ে আত্মপ্রকাশ করেছি, বুঝলে হে প্রণব, আত্মপ্রকাশ না করে আমার উপায় ছিল না।

তিনি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

প্রণব গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমাদের বড়লোক জাতটাকে এইজন্যেই আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। বাপের সঙ্গে মতান্তর হতে তিনি ছেলেকে দিলেন দূর করে, ছেলে রাগে, দুঃখে, অভিমানে বাপকে ছেড়ে চলে গেল। এ পর্য্যন্ত না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলোর কোন সহজ অর্থ আমি খুঁজে পাই না। ছেলের পাশে পাশে রয়েছ অথচ পরিচয় গোপন করে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বললেন, এখানেও সেই একই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল প্রণব। অর্থাৎ মতের অমিল।

বাবা আমাকে সবদিক দিয়ে জব্দ করবার একেবারে পাকা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। অতনুকে তিনি শৈশব থেকেই এমন ভাবে শিক্ষা দিতে সুরু করলেন যাতে ভবিষ্যতেও আমি যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি।

প্রণবের কণ্ঠে বিস্ময়, ভারী আশ্চর্য্য কথা ত!

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতেই উত্তর দিলেন, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই প্রণব। এমন ঘটনার অভাব নেই, প্রতিদিনই ঘটছে। হয়ত ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরে। তাই হতাশ না হয়ে সময় এবং সুযোগ মত অতনুর পাশে এসে দাঁড়ালাম। ব্যবস্থাটা অবশ্য আমাদের অ্যাটর্নী নলিনীবাবুই করে দিলেন। অত্যন্ত সজ্জন লোক তিনি। তাঁর সাহায্য না পেলে আমাকে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'ত। বিশেষ করে, বাবার শেষ উইল নিয়ে, বাবা মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে আমাদের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রী করে নগদে রেখে যান। আর এই বিরাট টাকার অঙ্ক থেকে সামান্য কয়েক হাজার অতনুকে দিয়ে বাকীটা আমাকে দিয়ে যান।

প্রণব বললেন, কিন্তু তোমার সন্ধান ত তিনি জানতেন না নালু মুন্সী—

ডাক্তারবাবু বললেন, তার ব্যবস্থাও উইলে তিনি করে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর বার বছরের মধ্যে আমার সন্ধান না পাওয়া গেলে তবেই অতনু এই টাকার অধিকারী হবে।

একটু থেমে ডাক্তারবাবু পুনরায় সুরু করলেন, বাবার মৃত্যুর পরেই আমি অতনুর কাছে কাছে থেকে ওর চরিত্রের দুর্ব্বল অংশের সন্ধান নিয়ে চাকা ঘোরাতে আরম্ভ করি। এমনি দিনে হঠাৎ খবর পেলাম, শ্রীমান্ বিবাহ করেছেন—এবং তা আবার আমারই বাল্যবন্ধু প্রণব মাষ্টারের মেয়েকে। বড় আনন্দ হ'ল খবরটা পেয়ে। আমার কাজ আরও সহজ হবে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। কিন্তু বাবার শিক্ষার প্রভাব অতনু কাটিয়ে উঠতে পারল না। সে ভালবাসা চায়, কিন্তু শ্রদ্ধা দিতে জানে না। শ্রীমতী

চেষ্টা করেও ঠিক কায়দা করতে না পেরে একদিন চরম আঘাত হেনে চলে এল। এমনি আঘাত পাবার তার প্রয়োজন ছিল প্রণব। অতনুর অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। তাই আমাকেই ছুটে আসতে হ'ল আমার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, আর আমিও এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়ে কায়েম হয়ে বসব। তিনি পুনরায় হেসে উঠলেন।

প্রণব বার বার মাথা নেড়ে বললেন, বুঝলাম না কল্যাণ মুন্সী, প্রথম থেকে তোমার পরিচয় দিলে কি এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ত।

ডাক্তারবাবু বললেন, কি হতে পারত আর কি পাবত না তা বলা শক্ত, তবে একবাব ব্যর্থ হলে আমি বাপ হিসেবে আর এগোতে পাবতাম না। আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যই আমাকে মানে মানে সরে যেতে হ'ত।

প্রণব বলতে থাকেন, কথাটা ঠিক বলেছ নালু মুন্সী। খাসা পন্থাটি বার কবেছিলে তুমি। জলেও নেমেছ—মাছও ডাঙায় তুলেছ অথচ কাপড় ভেজাও নি।

ডাক্তারবাবুব মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল।

৩২

আজ সকাল থেকেই মিত্রা ছটফট কবে বেড়াচ্ছে, যে খবরটা সে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে তা অভাবিত না হলেও নিজেকে সে কিছুটা অসহায় মনে করল, তার সব চেষ্টাই কি শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হবে? ডাক্তারবাবু এখানে নেই অতনুকেও সব কথা অকপটে বলা চলে না, হয়ত হিতে বিপরীত হবে।

সময় কাটিতে চাইছে না। মিত্রা তার নিয়মিত কাজগুলি করতেও আজ বারে বারে ভুল করছে। তাব এই অন্যমনস্কতা অতনুর দৃষ্টি এড়াল না। সে অনুযোগ দিয়ে বলল, আমায় সকাল বেলায় ওষুধ দিতে ভুলে গেছ মিত্রা। তোমার কি আজ শরীর ভাল নেই?

মিত্রা ম্লান হেসে বলল, আমি যদি ভুলেই গিয়ে থাকি—আপনি ডেকে একবার মনে করিয়ে দিলেন না কেন ?

মিত্রার উত্তর করবার ধরনে অতনু রীতিমত বিস্মিত হ'ল, তথাপি এই নিয়ে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। চুপ করে রইল। কিন্তু মিত্রার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হ'ল না। কতকটা অনুতপ্ত হয়েই সে বলল, আপনি বুঝি রাগ করলেন অতনুবাবু ?

অতনু শান্ত গলায় বলল, রাগ করব কেন মিত্রা ? ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তার জের টানতে গেলেই অশান্তি বাড়ে, আমি নিজেকে দিয়েই তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তাই আর সহজে রাগ করি না।

মিত্রা এ কথার কোন জবাব দিল না।

অতনু অন্য প্রসঙ্গে এল, বলল, ডাক্তারবাবুব আর কোন খবর পেয়েছ ?

মিত্রা একটু রহস্য করে বলল, আপনার বুঝি অন্য ডাক্তারেব চিকিৎসা পছন্দ হচ্ছে না ?

অতনু জবাব দেয়, বিলক্ষণ—ভদ্রলোককে বহুদিন দেখি না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, তিনি আসবেন কবে ?

মিত্রা বলল, এত খবর রাখেন আব এ সংবাদটা রাখেন না ?

অতনু বলল, জানলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না মিত্রা।

মিত্রা জবাব দিল, আমারও জানা নেই।

অতনু খানিক চুপ করে থেকে অন্য কথা তুলল, তোমাদের শিলাদিত্যবাবু নাকি খুব সোরগোল করছেন ? তিনি এগোলেন কতখানি ?

মিত্রা বিস্মিতকণ্ঠে বলল, খববটা আপনাকে কে দিলে শুনতে পাই কি ?

অতনুর মুখে বিচিত্র একটুকরা হাসি দেখা গেল, সে বলল আমার বুকের উপর দাঁড়িয়ে ওরা নাচবে আর আমি তা জানব না, এ তুমি কেমন করে আশা কর মিত্রা ? সব খবরই আমার

কাছে আসে, কিন্তু তোমাদের মত দিশেহারা হয়ে পড়ি না। আমি নিজেও খেলতে ভালবাসি, অপরকেও খেলিয়ে আনন্দ পাই।

মিত্রা গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু খেলাটা সব সময় খেলা থাকে না অতনুবাবু—

থামলে কেন মিত্রা—অতনু সহজকণ্ঠে বলল, অনেক সময় মারাত্মক হয়ে উঠে, এই কথা তুমি বলবে ত?

মিত্রা চুপ করে থাকে। অতনু বলতে থাকে, কথাটা ইদানীং আমিও বুঝতে শিখেছি। কিন্তু অভ্যাস ছাড়তে পারি না—তাই শিলাদিত্যকে জেনেশুনে আমি বাড়তে দিয়েছিলাম। আজ সে ফণা তুলেছে মরণ-ছোবল মারবার জন্য। ওর ঐ উদ্যত ফণা আমি মাটির সঙ্গে পিষে ফেলতে পারতাম, যদি তোমরা সকলে মিলে আমাকে দুর্ব্বল করে না ফেলতে। আমি বোধ হয় কোনদিন আর অতীত জীবনে ফিরে যেতে পারব না। আবার হয়ত নতুন করে আমাকে আরম্ভ করতে হবে।

অতনু মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

মিত্রা ম্লান দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে বলে, এসব আপনি কি বলছেন অতনুবাবু?

অতনু বলে, ঠিক কথাই বলছি, তাই ঐ মরণ-ছোবল বুক পেতে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি মিত্রা। মরে আবার নতুন করে আমি জন্ম নেব। ওকি, চমকে উঠলে কেন? আরে না না, ভয় পেয়ে চমকে উঠবার মত কোন কথা আমি বলি নি। কিন্তু এ সব কথা থাক।

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে বলে, থাকবে কেন অতনুবাবু। আপনি বলুন, আমি শুনব।

অতনু বলল, সেইজন্যেই ডাক্তারবাবুর খোঁজ করছিলাম। অনেক দুর্ব্যবহার আমি তাঁর সঙ্গেও করেছি। কে বলতে পারে আগামীকাল হয়ত এ বাড়ী থেকে আমাকেও চলে যেতে হবে

পারে। তাই হিসেব করতে বসেছি। কিন্তু মন ব'লছে যে, দেনা আর পাওনাটা বড় অসমান হয়ে পড়েছে, তাই—

মিত্রা স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকল, অতনুবাবু।···

অতনু হাসিমুখে বলল, অসঙ্কোচে বলতে পার মিত্রা, দেখছ না, আমি আর সহজে কারুর উপর রাগ করি না!

মিত্রা উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, ওরা যদি সত্যি সত্যিই আপনার এতবড় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলে?

অতনু নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, তা হলে আমি ঘরে বসে পরমানন্দে বীণা বাজাব মিত্রা, অতনু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

এ হাসি মিত্রা সহ্য করতে পারে না, কেমন যেন অপরাধীর মত মুখ করে চলে যাবার জন্য উদ্যত হ'ল।

অতনু পিছনে ডাকল, যেও না মিত্রা—

মিত্রা ফিরে দাঁড়াতেই অতনু পুনরায় বলল, তোমার সেই খরবুদ্ধি আর প্রচণ্ড সাহস কোথায় গেল মিত্রা? তুমি কেন নিজেকে দোষী মনে কবছ? দোষ যদি কোথাও তোমার থেকে থাকে তার চেয়ে ঢের বেশী দোষ আমি করেছি।

মিত্রা জবাব দেয় না।

অতনু বলতে থাকে, জীবনের আরম্ভ থেকে এত বেশী খোসামোদ আর স্তুতি পেয়ে এসেছি যে, আসল নকল চিনতেও ভুলে গেলাম। সেইজন্যেই কেউ আমার কাছে তার প্রাপ্য পায় নি, দু'হাত ভরে নিয়েছি—দেবার কথা একবারও মনেও আসে নি। নিতে গেলে দিতে হয়, এই কথাটাই কেউ কোন দিন আমাকে বুঝিয়ে বলে নি।

মিত্রা এতক্ষণে কথা বলল, আপনি কি কোনদিন বোঝবার চেষ্টা করেছেন?

অতনু বলল, করেছি বলেই ডাক্তারবাবুকে এতদিন ধরে সহ্য করতে পেরেছি। তুমিও আমার কাছে—

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল, আমার কথা থাক।

অতনু বলল, থাকবে কেন? সত্যিই ত তোমাকেও আমি সহ্য করে আসছি।

মিত্রা বলল, শুধু নিজের স্ত্রীকেই আপনি সহ্য করতে পারলেন না।

অতনু কথাটা একপ্রকাবে মেনে নিয়েই বলল, কিন্তু অস্বীকার করতেও তাকে পাবছি না মিত্রা, বরং তাব কথা ভেবে আজ আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। একে তুমি কি বলবে?

মিত্রা ধীরে ধীবে বলে, সম্ভবতঃ এ আপনাব সাময়িক দুর্ব্বলতা।

অতনু জবাব দিল, হয়ত তাই, কিন্তু এই দুর্ব্বলতার মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লুকিয়ে আছে তার সন্ধান আমি পেয়ে গেছি। বুঝতে পাবছি যে, মানুষের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা না থাকলে সে সুন্দর হযে উঠতে পারে না—পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পাবে না।

মিত্রা চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে অতনুব পানে তাকাল।

অতনু বলতে থাকে, কথা ক'টি নানাভাবে শ্রীমতী আমাকে বহুবাব শুনিয়েছে, আরও বলেছে, ভালবাসাব সঙ্গে খানিকটা শ্রদ্ধার খাদ না মেশালে তাব পরমাযু স্বল্পস্থায়ী হয়। আমার ভালবাসায় নাকি বেগ আছে—প্রশান্তি নেই। তাই জলকে তা শুধু ঘোলা করতেই পেরেছে, নির্ম্মল কবতে নয়।

অতনু একটু থেমে পুনবায় বলতে লাগল, অহঙ্কারে কথাগুলি তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা কবি নি, বরং হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছি মাষ্টাবের মেয়েব মাষ্টারী করবার দুঃসাহস দেখে, তারপরে আঘাত কবেছি বর্ব্বরের মত। আঘাতকে মাথা পেতে নিলেও শ্রীমতীর চোখেমুখে ঘৃণা-মেশান অনুকম্পার যে ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, সেদিনে তার যথার্থ অর্থ না বুঝলেও আজ আমাকে অনেক কথাই মনে করিয়ে দেয়।

অতনুর মুখে শ্রীমতীর কথাগুলিব পুনরুক্তিতে মিত্রা অকারণে ব্যথা পায়, কিন্তু প্রকাশ্যে সে কোন কথা বলে না।

অতনু বলতে থাকে, আজ আমি তোমাকেও বুঝতে পারি—

শ্রীমতীকেও বুঝি, কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কাছে গভীর সমুদ্র। তাঁকে আমি কোনদিনই বুঝলাম না।

সহসা অতনু চুপ করল, চোখ বুজে সে যেন তার অন্তরের মধ্যেই ডুবে গেল। একটা শান্ত সমাহিত ভাব। যাঁর মাথার উপর এতবড় বিপদের ধারাল খাঁড়া ঝুলছে, তাঁর এমন শান্ত নির্লিপ্ত ভাব কতকটা অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য। মিত্রা কোমল দৃষ্টিতে তার মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কথা বলে বিরক্ত করল না।

খানিক পরে অতনু ক্লান্ত দুটি চোখ মেলে তাকাল। হাসি-মুখে বলল, এখনও তুমি যাও নি মিত্রা?

মিত্রা আর দ্বিতীয় কথা না বলে অত্যন্ত দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার যে আজ কি হয়েছে—কিছুতেই সে অতনুর কাছে সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারছে না।

আশ্চর্য্য! এই কি সেই অতনু? একসঙ্গে অনেক দিনের অনেক কথাই তার মনে পড়ল। হাসিও পায় দুঃখও হয়।

আকস্মিক ভাবে মিত্রার দৃষ্টি স্থানভ্রষ্ট হয়ে তার নিজের উপর পড়ল। মানুষের চরিত্র বড় অদ্ভুত! আশ্চর্য্য হবার কোথাও কিছুই নেই, নইলে অতনুব সর্ব্বনাশ করতে এসে সে তার নিজের এতবড় ক্ষতি করে বসল কিসের লোভে—কিসের লোভে সেই অতনুর মঙ্গলের জন্য সে পাগলের মত পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে?···

মানুষ একটা গতিশীল চক্রযান। প্রয়োজনে তার গতির পরিবর্ত্তন ঘটে. শুধু ষ্টিয়ারিং কাটাবার অপেক্ষা। সোজা থেকে বাঁকা আর বাঁকা থেকে সোজা···

মিত্রা আর ভাবতে পারে না।···

৩৩

অতনু আজ প্রচুর ঘুমাচ্ছে, নির্ব্বিকার নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ডাকতে এসে বারকয়েক ফিরে গেছে মিত্রা। ওর নিরুপদ্রব বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাল না, কিন্তু নিজে সে একমুহূর্ত্তের জন্য

চুপ করে থাকতে পারছে না। চতুর্দ্দিক থেকে একটা গাঢ় অন্ধকার তাকে যেন চেপে ধরে আছে। এই দুর্ভাবনা থেকে সে অব্যাহতি চায়, মুক্তি চায়। সে তার মনের স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে, গুমরে গুমরে কাঁদছে তার আত্মা।

ইতিমধ্যে মিত্রা শিলাদিত্যের কাছে ছুটে গিয়েছিল তাকে নিবৃত্ত করবার জন্য। তাকে উপেক্ষার হাসি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে শিলাদিত্য। তার নাকি করবার কিছুই নেই, সে চলতে জানে—থামতে জানে না।

মিত্রা বলেছে, এতবড় প্রতিষ্ঠানের এতগুলি কর্ম্মচারী যে তাদের ছেলে পিলে নিয়ে না খেয়ে মরবে শিলাদিত্যবাবু।

শিলাদিত্য জবাবে জানিয়েছে যে, ওরা নাকি সব মরেই আছে, সে শুধু ওদের শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়ে পারলৌকিক ক্রিয়ার সহায়তা করতে উদ্যত হয়েছে।

মিত্রার আপাদমস্তক জ্বলে উঠলেও সে আর দ্বিতীয় কথা না বলে প্রস্থানে উদ্যত হতে শিলাদিত্য পুনশ্চ বলেছে, আর একটা খবর জেনে যান মিত্রা দেবী—

মিত্রা ঘুরে দাঁড়াল।

শিলাদিত্য বিশ্রীভাবে হেসে বলেছে, আপনাদের ডাক্তারের ফিরে আসবার অপেক্ষায় আমরা বসে থাকব না। কিন্তু মিত্রা দেবীর পতন দেখে সত্যিই বড় দুঃখ পেয়েছি।

মিত্রা বলেছিল, ভারী আশ্চর্য্যের কথা সূর্য্যবাবু—ওকি চমকে উঠলেন কেন! আমি কিন্তু আপনার উত্থান দেখে খুশী হয়েছি।

একটু থেমে পুনরায় বলেছিল, আমি যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে আর একবার আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করে গেলাম···

দৃঢ় পায়ে মিত্রা সেখান থেকে চলে এসেছে। মনে মনে সে তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করেই স্থান ত্যাগ করেছে।

ডাক্তারবাবু আজই শ্রীমতীকে নিয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু তাঁর ফিরে আসবার অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকলে মিত্রার চলবে না। নিজের বুদ্ধি এবং শক্তি আর কেষ্টর সহায়তায় সে ঈর্ষা বিশ্বাসের অগ্রসর হবার সবক'টি পথেই প্রচুর বিষাক্ত কাঁটা ছড়িয়ে দিল। একটু ভুল করলেই নিশ্চিত মৃত্যু···

সন্ধ্যা হতে বেশী দেরি নেই। মিত্রা তার দুই করতলের মধ্যে মস্তক স্থাপন করে গভীর চিন্তায় মগ্ন।··

···ইতিমধ্যে কেষ্ট এসে খবর দিয়ে গেল যে, সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাদের হিসেব আগাগোড়া মিলে যাচ্ছে।·

কেষ্ট চলে যেতেই মিত্রা পুনরায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল। অতনুর কারখানার ভালমন্দ সব দায়িত্ব ডাক্তারবাবু তার উপব দিয়ে গেছেন, আর সেও এই দায়িত্ব প্রতিপালন করতে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তখন কিছু মনে না হলেও এখন মনে হচ্ছে, ডাক্তারবাবুর এই ধরনের অনুরোধ করাটাও যেমন স্বাভাবিক নয়, তার পক্ষেও কোনপ্রকার কথা দেওয়া অর্থহীন। অথচ অনুরোধটাও মিথ্যে না, আর সে নিজে যে প্রতিকূল অবস্থাব সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে চলেছে এ কথাও সত্য।·

পাশের ঘব থেকে অতনুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মিত্রা ···মিত্রা।···

মিত্রার চিন্তার ঘোর কেটে গেল, সে দ্রুতপদে অতনুর ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল এবং অতনুর বিভ্রান্ত মুখের পানে দৃষ্টি পড়তে মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মুখে তার এক ফোঁটা রক্ত নেই, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে, সে বারে বারে শুধু একটি প্রশ্নই করতে থাকে, কি হয়েছে আপনার অতনুবাবু?

অতনু মিত্রার হাত ধরে টেনে জানালার কাছে নিয়ে গেল। দূরে তার কারখানার পানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, শেষ পর্য্যন্ত ওরা কারখানাটাকে ধ্বংস করাই ঠিক করল মিত্রা?···

ধ্বংস—মিত্রা যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল।

অতনু স্তিমিত গলায় বলতে থাকে, হ্যাঁ, ধ্বংস—দেখছ না ওখানকার আকাশটা কেমন লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতটা আমি ভাবতে পারি নি। অভিযোগ ক'রবার ওদের কিছু নেই এমন কথা আমি বলি না! বলবার হয়ত উভয় পক্ষেরই অনেক কিছু আছে মিত্রা, কিন্তু তবুও আমার জিজ্ঞেস ক'রতে ইচ্ছে হয় যে, এইটেই কি যথার্থ বাঁচাব পথ ?

অতনু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, তার চোখের সম্মুখে তখন হয়ত আর একদিনের আর একটি সন্ধ্যা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। শ্রীমতীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সন্ধ্যাটি। শালবনের ফাঁকে ফাঁকে তখন ফাগের সমারোহ···অতনু নিজেকে ভুলে গেল, মনে তার রং ধরল তারপর

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে ডাকল, অতনুবাবু—

অতনু বর্ত্তমানে ফিরে এল। একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, এরই নাম বোধ হয় বিধিলিপি মিত্রা, চেষ্টা করেও তাই অভীষ্টে পৌঁছাতে পারছি না, আমার অহঙ্কার আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্রই আমি একা।

মিত্রা আবার ডাকল। অতনু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল তুমি ভাবছ, আমি বুঝি ভেঙে পড়েছি, মিত্রা ? না না, ভেঙে পড়ব কেন—আজ বরং আমার আনন্দের দিন, নিজেকে আমি ফিরে পেয়েছি। আবার নতুন করে চলার পথ ঐ আগুনের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। আমার অতীতের যা কিছু ভুল, যা কিছু গ্লানি সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক, আবার নতুন করে চলার পথ সুগম হয়ে উঠুক।

অতনু উদ্‌ভ্রান্তের মত হা হা করে হেসে উঠল।

মিত্রা ভয় পেয়ে গেল, এ হাসির ধরন আলাদা—এর চেহারা আলাদা।

অতনু পুনর্বার কথা কয়ে উঠল, ঐ লাল রঙই একদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল মিত্রা, আমার মনে রঙ ধরিয়েছিল। মনের রঙ

শ্রীমতীর সিঁথিতে লেপে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনের রঙটা ছিল কাঁচা তাই সামান্য জল লাগতেই তা ধুয়ে গেল···

অতনু পুনরায় হেসে উঠল, এ হাসি সর্ব্বহারার উন্মাদ হাসি। মিত্রা স্থান-কাল-পাত্র ভুলে তাকে বেষ্টন করে ধরে বারে বারে শুধু বলতে থাকে, অতনুবাবু, চেয়ে দেখুন ত আমার দিকে। কি হ'ল আপনার? আমি বলছি, কিছু যায় নি আপনার—আপনার সব আছে···সব···

নিজেকে বেষ্টনমুক্ত করে বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় অতনু বলতে থাকে, কি আমার আছে আর কি আমার খোয়া গেছে, সে কি আর আমি জানি না? কিন্তু তুমি কেন অত ভয় পেয়েছ মিত্রা, আমি ত পাই নি? আমার কাছে আজকের সন্ধ্যাটি একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা। মন বলছে, এখান থেকেই আমাকে সুরু করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কারখানারও—নিজের জীবনেরও। আমার অহঙ্কারের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভটা জ্বলে উঠতে পথ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

অতনু আবার হেসে উঠল, হাসিটা যেন তার থামতেই চায় না।

মিত্রা ঠিক বুঝতে পারছে না এই মুহূর্ত্তে কি সে করবে। কি করা তার কর্ত্তব্য। অতনুর বর্ত্তমান অবস্থাকে সে ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থা বলে ভাবতে পারছে না। মুখে সে যত কথাই বলুক, ঐ আগুনের শিখা যে তারও সর্ব্বাঙ্গ বেড়ে ধরেছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মিত্রা নিজেও কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে—উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। সে বারে বারে শুধু ঘর-বার করছে···

সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। মিত্রা ছুটে এগিয়ে গেল। কেষ্ট আবার ফিরে এসেছে। চোখেমুখে তার বিজয়-উল্লাস। মিত্রাকে সম্মুখে পেয়ে অনেকক্ষণ সে কথাই বলতে পারল না।

মিত্রা আকুল আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, কি খবর কেষ্ট—অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন?

কেষ্ট দম নিয়ে বলল, জান দিদিমণি, সে এক ভীষণ ব্যাপার হয়েছে। কারখানার মজুররা ক্ষেপে গিয়ে ঐ শিলাদিত্য মশাইকে আগুনে ফেলে দিয়েছে—

মিত্রা আর্ত্ত চীৎকার করে উঠল, কেষ্ট—

কেষ্ট নির্ব্বিকার ভাবে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনাকে আমি মিথ্যে বলছি না দিদিমণি। ওরা দুটো বেশী পয়সা চেয়েছিল। কারখানাটা নষ্ট করতে চায় নি, কিন্তু শিলাদিত্যবাবু যে শুনলেন না, চুপি চুপি কারখানায় আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

মিত্রা ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তারপর?

কেষ্ট বলে, ধরা পড়ে গেলেন। তারপরেই তাকে ঐ আগুনের মধ্যে একটু থেমে সে পুনরায় বলতে থাকে, ডাক্তারবাবু বৌদি বাণীকে নিয়ে আসছিলেন—কারখানার আগুন দেখে ওখানেই নেমেছেন। সামান্যই ক্ষতি হয়েছে। আগুন প্রায় নিভে গেছে, এখুনি তাঁরা এসে পড়বেন। আমাকে তিনি খবরটা দিতে বললেন।

মিত্রা হঠাৎ যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠেছে, সে চঞ্চল কণ্ঠে বলল, এতক্ষণ এ কথা আমাকে বল নি কেন কেষ্ট? তুমি খবরটা তোমার দাদাবাবুকে দাও গিয়ে—আমি ততক্ষণে তাঁদের এগিয়ে আনতে যাই।

মিত্রা কেষ্টর বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে দ্রুত চলে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়াল—মনে হ'ল, অতনু তাকে যেন পিছন থেকে ব্যাকুলভাবে বারে বারে ডাকছে, মিত্রা·· মিত্রা·· কিন্তু এ বাড়ীতে তার স্থান কোথায়···অধিকার কতটুকু—মিত্রার পায়ের গতি আরও দ্রুত হয়ে উঠল, ফিরে যাবার সহজ রাস্তা যখন তার জন্য নেই তখন দূরে সরে না গিয়ে উপায় কি···চলতে চলতে মিত্রা একবার অঞ্চলপ্রান্তে তার চোখ দুটো ঘষে নিল··